কালিদাসের গল্প

কালিদাসের গল্প

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক এম্, এ
বিরচিত

প্রবাসী প্রেস
১২০।২ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা
১৩৩৮

প্রবাসী প্রেসে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মূল্য ৩৲ মাত্র

উৎসর্গ

স্বর্গগত পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর—

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

এই ক্ষুদ্র

গ্রন্থখানি

উৎসর্গীকৃত হইল।

—গ্রন্থকার

ভূমিকা

কোন একজন আধুনিক বাঙ্গালী কবি তাঁর কাব্যে লিখেছেন—"আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে!" এই সঙ্গে কবির জানানো উচিত ছিল যে, তাঁর কালে তো জন্ম নেওয়া হয়েইচে। সাহিত্যের একটা প্রধান কাজই হচ্চে এক শতাব্দীকে আর এক শতাব্দীতে রওনা ক'রে দেওয়া। কালিদাসের কাল দূর তারার আলোর মতো অতীত যুগ থেকে নিঃসৃত হ'য়ে বর্ত্তমান কালে এসে পৌঁচচ্চে। একটুখানি বাধা আছে, সংস্কৃত ভাষার দূরবীন দিয়ে দেখতে হয়। এই বাধা কোনো কালে ঘুচবে না। সে কালের সমস্ত রস ও রূপ নিয়ে তাকে স্পষ্ট ক'রে দেখতে হ'লে দৃষ্টিকে সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই নিবিষ্ট ক'রতে হবে। সকলের পক্ষে এটা সুলভ হয় না। তাই অভাবপক্ষে বাংলা চষমা কাজে লাগাতে হবে। "কালিদাসের গল্প" বইটিতে সেই কাজ করা হোলো। তাতে ছবির সীমান্ত-রেখাটি দেখা দিয়েচে—রংগুলি বাদ প'ড়লো। যাই হোক্ পরিচয়ের সূচনা হোলো, সে কম কথা নয়! অনেকে বাংলা ছন্দের ছাঁচে কালিদাসের কাব্য ঢালাই ক'রে তা'র সমগ্র মূর্ত্তি দেখাবার চেষ্টা করেন। এ কাজে সিদ্ধিলাভ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সংস্কৃত কাব্যের প্রতিরূপ ছন্দোযোগে বাংলা কাব্যে উদ্ধার ক'রতে

পারে এমন মায়ালেখনী কার আছে! এ স্থলে সবিনয়ে গদ্য আশ্রয় করাই ভালো। "কালিদাসের গল্প" বইটিতে লেখক তার চেয়েও আরো বেশি বিনয় প্রকাশ ক'রেচেন, তিনি কেবল বিষয়টিমাত্র সাজিয়ে দিয়েচেন। আমরা বলি যথালাভ। সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং কেন তা'র চেয়ে অনেক বেশি ত্যাগ করতে হলেও দোষের হয় না।

শান্তিনিকেতন
১৩৩৮।১৪ই ভাদ্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিবেদন

মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদে 'কালিদাসের গল্প' সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইল। দশ বারো বৎসর পূর্ব্বে যখন এম্, এ পড়িতাম তখন 'রঘুবংশ' পড়িয়া 'ছেলেদের রঘুবংশ' নামক একখানি পুস্তক রচনা করি। নানা কারণ বশতঃ সেখানি তখন ছাপান হয় নাই, তারপর তিন বৎসর পূর্ব্বে আবার যখন সেটি ছাপাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম সেই সময় মহাকবির সমস্ত কাব্য নাটক গল্পাকারে লিখিবার ইচ্ছা হয়।

মহাকবি যে সাহিত্য আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ হয় না। কালিদাস সাহিত্যের যে কি মাদকতা শক্তি আছে সে কেবল কালিদাস পাঠকই জানেন। যিনি ভাল করিয়া সংস্কৃত ভাষা শেখেন নাই তাঁহার পক্ষে সে 'রস ও রূপের' খনির আস্বাদ পাওয়া কেবল যে দুঃসাধ্য তাহা নহে, আমার ত মনে হয় অসাধ্য। তাঁহার সে বিরাট সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্ সর্ব্বাধারে বজায় রাখিয়া বাংলার ভাই-ভগ্নীদিগকে দেখান এক দুরূহ ব্যাপার। সে কাজে হাত দিবার মত সাহস ও শক্তি আমার নাই। আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তি তাহার অতি সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ শক্তি লইয়া যে মহাকবির কাব্যনাটকের কেবল মাত্র গল্পাংশ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, ইহাতেই মহাকবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয় 'প্রাংশু-লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহু' বামনের ন্যায় আমি হয় ত উপহাসেরই পাত্র হইব। তবে এই পুস্তকের ভূমিকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যখন বলিয়াছেন ইহাই 'যথা লাভ', তখন সাধারণেও ইহা পড়িয়া অন্ততঃ যদি বলেন 'যথা লাভ' তাহা হইলেই আমার সকল পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কেবল গল্পাংশ লিখিয়াছি বলিয়া অনেক সুন্দর সুন্দর অংশও বাদ দিতে হইয়াছে, 'কুমার-সম্ভবের' দুই তিনটি সর্গও বাদ গিয়াছে, নাটকগুলির স্থানে স্থানে কতক অদল বদলও করিতে হইয়াছে, সেগুলি না করিলেই নয়। দু'এক

জায়গায় নিজের কথাও এক আধটা দিতে হইয়াছে। তবে যতদুর পারিয়াছি মহাকবির কথাই বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহার সে উপমাহীন উপমাগুলিরও কতক কতক দেখাইয়াছি। কেবল তাঁহার ভাবটি লইয়া নিজের ভাষায় বইখানি লিখি নাই।

পুস্তকখানির কয়েকটি গল্প সংশোধন করিয়া দিয়া ডাঃ শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর এম্, এ, পি, এইচ্ ডি মহাশয় আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। বিখ্যাত শিল্পী শ্রীভবানী চরণ লাহা মহাশয় আমার অনুরোধে অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দুষ্যন্ত-শকুন্তলার একখানি সুন্দর চিত্র আঁকিয়া উপহার দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকেও আমার ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমার সহপাঠি বন্ধু শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় যে এইরূপ ছাপা, ছবি, কাগজ, বাঁধাই প্রভৃতির প্রস্তাব করিয়া পুস্তকখানিকে এমন সালঙ্কারে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন সেজন্য আমি তাঁহার নিকটও কৃতজ্ঞ রহিলাম।

'মল্লিকস্ লজ'
কলিকাতা
জন্মাষ্টমী ১৮ই ভাদ্র ১৩৩৮

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

কালিদাসের যুগের দু-একটি কথা

মহাকবি কালিদাসের নাম শোনেন নাই এমন লোক আমাদের দেশে খুবই কম আছেন। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, আমরা কালিদাস সম্বন্ধে কেবল 'কালিদাস', 'বিক্রমাদিত্য,' 'শকুন্তলা ও 'মেঘদূত' এই দুই চারিটা কথা ছাড়া আর কিছুই জানি না। মহাকবি যে শকুন্তলা মেঘদূত ছাড়া আরও অনেক কাব্যনাটক লিখিয়া গিয়াছেন, সে খবর আমাদের কয়জনই বা জানেন? অবশ্য কালিদাসের নাম করিবার সময়ে বা তাঁহার সম্বন্ধে তর্ক করিবার সময়ে কালিদাসকে আমরা খুবই বড় করিয়া দেখাই।

আমাদের দেশে যেমন কালিদাস, বিলাতে তেমনই সেক্সপীয়র। সেক্সপীয়রের বইগুলি লোকে কত ভাবে, কত রকম করিয়া ছাপাইয়াছে—ছেলেদের জন্য এক রকম, বুড়োদের জন্য এক রকম, সাহিত্যিকদের জন্য এক রকম। সমালোচনাও যে কত বাহির হইয়াছে তার ঠিক নাই। কেবল যে কাব্যের সমালোচনা তাহা নয়, তাঁহার সময়কার সভ্যতা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম, নীতি, দর্শন, জ্ঞান, বিজ্ঞান সব কিছু লইয়াই যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। এর জন্য সমিতি, প্রতিষ্ঠানও যে কত আছে তারও সংখ্যা করা যায় না। আর আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ কবির সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, এবং জানিবার চেষ্টাও বড় একটা করি না।

দুঃখ আমাদের এইখানেই শেষ নয়। মহাকবি যে কত শত বৎসর পূর্ব্বে কোন্ দেশে কোন্ ভাগ্যবানের ঘরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার একটা সঠিক বিবরণ ত দূরের কথা, সামান্য আভাসও পাওয়া যায় না, যাহা কিছু সবই অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। অবশ্য, দোষটা যে সবই আমাদের তাহা নয়।

মহাকবি নিজের সম্বন্ধে নিজে কিছুই লিখিয়া যান নাই, তাঁহার সমসাময়িক কোন লোকও কিছুই লেখেন নাই, এমন কি, তাঁহার কাব্যের প্রধান টীকাকার মল্লিনাথও এ-বিষয়ে একেবারে নীরব।

তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তেমন কোনও কথা জানা যায় না বটে, তবে তিনি যে-যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে-যুগের অনেক খবর তাঁহার লেখা হইতে আমরা পাই।

তাঁহার সমস্ত কাব্যনাটকগুলি পড়িবার সুযোগ ও সৌভাগ্য যাঁহারই হইয়াছে, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, সে সময়কার লোকেদের শিল্পকলার উপর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। কি চিত্রবিদ্যা, কি গীতবাদ্য, কি ভাস্কর্য্য বা কারুকার্য্য, সকল বিষয়েই তাঁহাদের অপরিসীম অনুরাগ ছিল।

তখনকার দিনে রাজাদের প্রাসাদে প্রায়ই একটি করিয়া 'চিত্রশালা' থাকিত, এই সব চিত্রশালায় চিত্রকরেরা আসিয়া রাজারাণীদের আদেশমত চিত্র আঁকিয়া দিতেন (মালবিকা—১ম অঙ্ক)। কোনও কোনও প্রাসাদে আমরা যাহাকে "আর্ট গ্যালারী" বলি, সেই ধরণের নানা রকমের চিত্র সংগ্রহ থাকিত। কেবল যে চিত্রকরেরাই চিত্র আঁকিতেন তা নয়, অনেক সময়ে রাজারা নিজেরাই চিত্রবিদ্যার আলোচনা করিতেন। অনেকে চিত্র আঁকিয়া বেশ উন্নতিও করিয়াছিলেন। 'শকুন্তলার' রাজা দুষ্মন্ত, 'বিক্রমোর্ব্বশীর' পুরূরবা, 'রঘুবংশের' রাজা অগ্নিবর্ণের চিত্র আঁকিবার বিবরণ পাই। 'মেঘদূতের' যক্ষও মাঝে মাঝে ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিতেন।

সে-কালের মেয়েরাও এ-বিষয়ে পশ্চাৎপদ ছিলেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেউ কেউ ছবি আঁকিতে পারিতেন। 'মেঘদূতের' যক্ষপত্নী প্রবাসী স্বামীর চিত্র আঁকিতেন (উ-মে—২৪)। 'কুমারসম্ভবের' পার্ব্বতী যে ছেলেবেলায় অন্যান্য বিদ্যার মত চিত্রবিদ্যাও শিখিয়াছিলেন, সে-খবর আমরা তাঁহার সখীর মুখ হইতেই পাই (কুমার—৫।৫৮)।

ভাস্কর্য্য অর্থাৎ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ কার্য্যেও তখনকার লোকেরা যথেষ্টই উন্নতি করিয়াছিলেন। মহাকবির লেখার অনেক জায়গায় দেখা যায় রাজপথ বা উদ্যানে নারীর অর্দ্ধনগ্ন মূর্ত্তি সেই স্থানের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, 'রঘুবংশে'র একস্থানে মল্লিনাথ বলিয়াছেন যে, এই মূর্ত্তিগুলি ছিল দারুময়ী অর্থাৎ কাঠের। মল্লিনাথ বলিয়াছেন বটে, তবে মহাকবি এমন কোনও কথাই বলেন নাই যাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এই মূর্ত্তিগুলি কাঠের কিম্বা প্রস্তরের। উৎসবের দিনে সোনার তোরণে ও চীন দেশের রেশমের পতাকায় নগর সাজাইবার বিবরণ হইতে তখনকার দিনের শিল্পকার্য্যেরও অনেক পরিচয় পাওয়া যায় (কুমার—৭।৩)।

সেকালে হস্তীদন্তের দ্রব্যাদিরও খুব আদর ছিল। কোন কোন রাজা স্বর্ণসিংহাসনের পরিবর্ত্তে হস্তীদন্তের সিংহাসনে বসিতেন (রঘু—১৭।২১)। বস্ত্রের উপরও তখনকার লোকেরা অতি সূক্ষ্ম কাজ করিতে পারিতেন (রঘু—১৭।২৫)।

গীতবাদ্যেও তাঁহাদের খুব অনুরাগ ছিল। রাজারাণীদের কেহ কেহ একসঙ্গে গান বাজনা করিতেন (রঘু—৮।৬৭)। রাণীদের নিজেদের সঙ্গীতশালা থাকিত,

তাঁহারা সেখানে ইচ্ছামত গান বাজনা করিতেন (শকু—৫ম অঙ্ক)। বেতন ভোগী গায়ক, বাদক, নর্ত্তকী সবই ছিল সে সময়, ছিল না কেবল এখনকার থিয়েটারের মত নর্ত্তকীর দল। রাজার সভায় নর্ত্তকীরা দল বাঁধিয়া নৃত্য করিতেছে, এরূপ ব্যাপারের উল্লেখ তাঁহার কোনো কাব্য-নাটকেই পাওয়া যায় না। বাদ্যযন্ত্রেরও অনেক রকম নাম পাওয়া যায়। ঢাক, ঢোল, শিঙা ত ছিলই (কুমার—১১৷৩৬)। মৃদঙ্গ অর্থাৎ তবলা, সেতার, বাঁশী সবই ছিল। গান বাজনা শিখাইবার সুবিধার জন্য কোনো কোনো রাজা নিজের ব্যয়ে 'সঙ্গীত-বিদ্যালয়'ও করিয়া দিতেন (মালবিকা—১ম অঙ্ক)।

সে-যুগের বিদ্যাচর্চ্চার কথা বলাই বাহুল্যমাত্র। কারণ, যে সময়ের সামান্য চেটী, প্রহরিণী ও পরিচারিকারা লিখিতে পড়িতে জানিতেন, কুমারীরাও সুললিত পদ্যে প্রেমপত্র লিখিতে পারিতেন, রাণীদের পত্র লিখন ও পঠন করিবার জন্য 'লিপিকরী' পাওয়া যাইত, যে সময়ের মেয়েরাও শিক্ষার জন্য উচ্চ উপাধি (পণ্ডিতা কৌশিকী) প্রাপ্ত হইতেন, মহিলা কবির লেখা নাটকের অভিনয় পুরুষেরাও আগ্রহসহকারে দেখিতেন, সে যুগে বিদ্যাশিক্ষা যে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

বিজ্ঞান ও জ্যোতিষেও সে-সময়ে লোকের জ্ঞান ছিল অসীম। এখনকার মত তখনকার লোকে কলের জল পাইতেন না বটে, তবে তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ জল পরিশুদ্ধ (filter) করিয়া খাইতেন। 'কতক' পুষ্পের দ্বারা তাঁহারা জল শোধন করিতেন (মালবিকা—২য় অঙ্ক), তবে কোন্ পুষ্পকে যে তখনকার লোকেরা 'কতক' পুষ্প বলিতেন, বলিতে পারি না। এখনকার মত যন্ত্রপাতি তখন ছিল না, তবু তখনকার লোকেরা বিদেশ হইতে আমদানী না করিয়াই এমন এক রকম যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেন, যার দ্বারা জল উর্দ্ধে উঠিয়া ফোয়ারার মত নীচে পড়িত (রঘু—১১৷৪৯)। তখনকার দিনে ইলেক্ট্রিক লাইট ছিল না, তবে তাঁহারা এত তেজস্কর আলোকের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন যে, সে আলোর সাহায্যে শহরের অনেকখানি স্থান আলোকিত করিতে পারা যাইত। সাধারণত তাঁহারা এক বিরাটকায় শিবের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সেই প্রতিমূর্ত্তির কপালের উপর চন্দ্রের আকারে আলো জ্বালাইতেন, সেই আলোর তেজে অন্ধকার রাত্রিও জ্যোৎস্নাময় মনে হইত (রঘু—৬৷৩৪)। সেই সময়ে কেহ কেহ আবার হীরক প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তরের সুন্দর নকল করিতেও পারিতেন (বিক্রম—২য় অঙ্ক)।

চন্দ্রের যে নিজের আলোক মোটেই নাই, সূর্য্যের আলোক চাঁদের উপর পড়ে বলিয়াই

আমরা চাঁদের জ্যোৎস্না উপভোগ করি, এ-কথা তাঁহারাও জানিতেন (রঘু—৩।২২)। চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল স্ফীত হয়, নদীর বুকে জোয়ার ভাটা খেলে এ খবর তাঁহারাও রাখিতেন (রঘু—৩।১৭)। শরৎকালের নীল আকাশে আমরা যে 'ছায়াপথ' দেখিতে পাই (ইংরেজীতে যাহাকে 'Milky Way' বলে), সেই 'ছায়াপথ' কথাটি এখনকার যুগের নয় (রঘু—১৩।২)। সে-যুগের লোকেরাও জানিতেন, যে অমাবস্যার পর চাঁদ সূর্য্যের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যায় (রঘু—৭।৩৩), আর বসন্তের পর সূর্য্য উত্তর দিকে ও বর্ষার পর দক্ষিণ দিকে চলিতে থাকে। 'পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে বলিয়াই চন্দ্রকে মলিন দেখায়' অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণ হয়, সে রহস্যও তখন অজানা ছিল না (রঘু—১৪।৪০)।

তখনকার দিনে কেউ কেউ 'নালীক' বা বন্দুকের ব্যবহারও জানিতেন (নলোদয়—১।৩৪)। মহাকবি বলিতেছেন, 'শত্রুর প্রতি মহারাজ নল অত্যন্ত দীপ্তিবিশিষ্ট নালীক ছুঁড়িতেন'। তিনি এমন ভাবে বলিয়াছেন যেন নালীকের ব্যবহার সে সময়ে খুব একটা বাহাদুরীর কাজ ছিল।

মহাকবির কাব্যে আমরা 'জামিত্র' কথাটিও পাই (কুমার—৭।১)। য়ুরোপীয় কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে এই 'জামিত্র' শব্দটি Geometry-র অপভ্রংশ, গ্রীক্‌দের নিকট হইতে ধার করা।

জাহাজ নির্ম্মাণে তখনকার লোকেরা খুব পারদর্শী ছিলেন। জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র-পথে বাণিজ্য করিতে যাইবার অনেক কথাই মহাকবির কাব্যের মধ্যে আমরা পাই। বাণিজ্যপোত ত ছিলই, এমন কি বড় বড় যুদ্ধ-তরণীও যে তাঁহারা নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। বাংলা দেশই এ-বিষয়ে খুব উন্নতি করিয়াছিল। বাঙ্গালীরা গঙ্গার বক্ষে নৌবহর লইয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিতেন (রঘু ৪।৩৬)। পারস্যদেশে (তখনকার দিনে সিন্ধুনদীর ওপার হইতে আরম্ভ করিয়া বেলুচিস্থান ও তাহার আরও উত্তর-পশ্চিম স্থানকে পারস্য দেশ বলা হইত) যাইতে হইলে জল ও স্থল উভয় পথই ব্যবহার হইত; যে-সব জাহাজ আরবসাগর অতিক্রম করিত তাহারা মজবুত নিশ্চয়ই ছিল।

তখনকার দিনে রাজারাই হইতেন বিচারপতি। কখন কখন তাঁহার অনুপস্থিতিতে বা তাঁহার অনুমতি লইয়া মন্ত্রীও বিচার করিতেন। রাজাদের একাধিক মন্ত্রী থাকিত, সৈন্যদের উপর সেনাপতি থাকিত। নগরের শান্তিরক্ষার জন্য থাকিত নগরাধ্যক্ষ; দূরের দেশ শাসন করিবার জন্য থাকিত 'রাষ্ট্রীয় মুখ'; রাজ্যের সীমা নিরাপদ রাখিবার জন্য থাকিত 'অন্তপাল' (মালবিকা—১ম অঙ্ক)। তা ছাড়া আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা

তাঁহার অধীনে থাকিত, তাহাদিগকে 'সামন্ত-রাজা' বলা হইত। যে রাজা অন্য সকল রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিতেন তাঁহাকে বলা হইত 'সম্রাট' (রঘু—৪।৮৮)। তখনকার দিনে সব রাজপুত্রেরাই যে খুব পিতৃভক্ত হইতেন, তা' নয়, পিতা বর্ত্তমানে অসদুপায়ে সিংহাসন করতলগত করাও একান্ত বিরল ছিল না (রঘু—৮।২)।

রাজকার্য্য সকাল হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত করা হইত (মালবিকা—২য় অঙ্ক) এখনকার মত দশটা পাঁচটা আপিস করিবার রীতি ছিল না। রাজারা প্রায় সকল বিষয়েই নিজেদের একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা যে তীর ছুঁড়িতেন, তাহাতে নিজেদের নাম লিখাইয়া রাখিতেন, তখনকার দিনে যোদ্ধাদের ইহাই ছিল রীতি বা ফ্যাসান (বিক্রম—৫ম অঙ্ক)। তাঁহারা যে রথে চড়িতেন অনেক সময় তাহারও একটি করিয়া নাম রাখিতেন। কেউ নিজের রথের নাম রাখিয়াছিলেন 'সোমদত্ত' (বিক্রম—১ম অঙ্ক), কেউ 'বিজিত্বর' (কুমার—১৪।২)। রথের পতাকারও তখনকার দিনে বিশেষত্ব থাকিত। কাহারও পতাকায় অঙ্কিত থাকিত 'হরিণ', কাহারও 'মৎস্য' (রঘু—৭।৪০) ইত্যাদি। অনেকে সখ করিয়া বিভিন্ন প্রাসাদের বিভিন্ন নাম রাখিতেন। কাহারও প্রাসাদের নাম ছিল 'দেবচ্ছন্ন', কাহারও নাম ছিল 'মেঘচ্ছন্দ', কাহারও বা 'বৈজয়ন্ত', কাহারও বা নাম ছিল 'মণিহর্ম্ম্য'। যক্ষপতি কুবেরের বাগানের নাম ছিল 'বৈভ্রাজ' (উ. মে—১০)।

য়ুরোপের যোদ্ধারা পূর্ব্বে যুদ্ধ করিতেন লোহার বর্ম্ম পরিয়া, আর আমাদের দেশের অনেক যোদ্ধারা যুদ্ধ করিতেন তুলার বর্ম্ম (কুমার—১৫।৫) পরিয়া। অবশ্য, লৌহের বর্ম্মও আমাদের দেশে অজানা ছিল না, অশ্বের গাত্রে ধাতুময় বর্ম্ম পরানরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

শিকার করিতে যাইবার সময় শিকারীরা অনেক সময় 'সবুজ রংয়ের' বর্ম্ম পরিতেন (রঘু—৯।৫১), হয়ত এতে শিকারীর জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিবার সুবিধা হইত। তখনকার দিনে আঙ্গুরের মদ ত খুব প্রিয় ছিলই (রঘু—৪।৬৫), তা ছাড়া নারিকেল হইতেও তাঁহারা মদ তৈয়ারী করিতে জানিতেন (রঘু—৪।৪২)। ইক্ষুরসের পুরান মদও তাঁহারা খাইতে ভাল বাসিতেন (রঘু—১৬।৫২)। বেশী নেশা হইলে তাঁহারা মিছরির সরবৎ পান করিয়া শরীর শীতল করিতেন (মালবিকা—৩য় অঙ্ক)। অনেক বড়লোকের আবাসে 'পানশালা' থাকিত (কুমার-৬।৪২), এবং শুঁড়ির দোকানেরও বড় একটা অভাব ছিল না (শকু—৫।৪২)।

সে সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। কাশ্মীরের কুঙ্কুম বা জাফরাণ (রঘু-৪।৬৭), কাম্বোজের আখরোট (রঘু-৪।৬৯), চীনদেশের রেশম

(কুমার—৭।৩), মলয় পর্ব্বতের মরীচ (রঘু-৪।৪৬), মহীশূরের চন্দন কাঠ (রঘু-৪।৪৮), দক্ষিণ সমুদ্রের মুক্তা, পারস্যদেশের ঘোড়া (রঘু-৫।৭৩), তখনকার দিনে খুব বিখ্যাত ছিল। এই সমস্ত দ্রব্যাদির আমদানী রপ্তানি ত হইতই, তা ছাড়া নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ ও নানা রকমের বস্ত্রেরও রীতিমত কেনাবেচা হইত। ভারতের বাহিরেও বণিকেরা সমুদ্রপথে যাতায়াত করিতেন তাহারও প্রমাণ মল্লিনাথ দিয়াছেন (নৌভিঃ সমুদ্রবাহিনীভিঃ রঘু—১৪।৩০) ।

তখনকার দিনে অন্ততঃ ক্ষত্রিয়দের মেয়েদের মধ্যে অল্পবয়সে বিবাহ প্রচলিত ছিল না, বিবাহ একটু বেশী বয়সেই হইত। গন্ধর্ব্ব বিবাহ, স্বয়ংবর বিবাহ তখনও একেবারে লোপ পায় নাই, অসবর্ণ বিবাহও প্রচলিত ছিল। (মাল—১ম অঙ্ক ও শকু—১ম অঙ্ক)। পণপ্রথা না থাকিলেও মেয়ের বাপ নিজের সামর্থ্য অনুসারে যৌতুকাদি দিতে ইতস্ততঃ করিতেন না, তবে কোথায়ও কোথায়ও আবার বরকে পণ দিয়া বধূ ঘরে আনিতে হইত ('দুহিতৃশুল্কং' রঘু—১১।৩৮)। কোথাও আবার কনে দেখিবার পূর্ব্বে কনের চিত্র চাহিয়া পাঠানও রীতি ছিল (রঘু ছিল ১৮।৫৩)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সে-যুগের বেশীর ভাগ মেয়েরাই লেখাপড়া শিখিতেন, নৃত্যগীতাদিও জানিতেন, ছবি আঁকিতে পারিতেন, নাটক লিখিতেন, লেখাপড়ার জন্য উপাধি পাইতেন, সাধারণের ব্যবহারের উদ্যানে পুরুষের সমক্ষেও বেড়াইতে বাহির হইতেন, কেহ কেহ আবার একটু-আধটু মদ খাইয়া নেশা করিতে ভালবাসিতেন। তপস্যাতেও সে সময়ের মেয়েদের অধিকার ছিল, পর্দ্দারও তেমন বালাই ছিল না। কাজেই সমাজে তাঁহারা যে তখন হীন বা পঙ্গু হইয়া পড়েন নাই এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহারা রকমারি অলঙ্কার ত পরিতেনই, তা ছাড়া বিলাসেরও অন্যান্য অনেক জিনিষই ব্যবহার করিতেন। লোধ্র পুষ্পের রেণু মুখে মাখিলে এখনকার 'পাউডারে'র কাজ হইত। ধূপের ধূমে তাঁহারা কেশপাশ সুগন্ধি করিয়া লইতেন, আর দেহ সুগন্ধি করিতেন অগুরু, কালীয়ক কিংবা মৃগনাভি মাখিয়া। বড়ঘরের মেয়েরা পাখী পুষিতেন, ময়ূর নাচাইতেন, পাদুকা ব্যবহার করিতেন, যবন দেশীয় দাসীবাঁদীও রাখিতেন। সতীদাহ প্রথাটা (রঘু—১৭।৬) তখনও ছিল, তবে আমাদের একশো দেড়শো বছর আগেকার বাংলা দেশের মত তখন সে প্রথা অত ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে নাই।

মৃতের দেহ পোড়ানই হইত, তবু দু'এক জায়গায় কবর দিবার ব্যবস্থারও উল্লেখ পাওয়া যায় (রঘু—৮।২৫, ও ১২।৩০)। সে সময় চোর, ডাকাত, গাঁটকাটাও যেমন ছিল, তেমনি পুলিশের মারপিট, জুলুমও কম ছিল না। তবে মারপিট জুলুমটা

সন্দেহ বা প্রমাণ পাইলেই তাঁহারা করিতেন। তখনকার দিনেও বাগানের গাছে বা ক্ষেতে জল দিবার জন্য অনেকেই বড় বড় খাল কাটাইয়া দিতেন। সময় ও দিক দেখিবার জন্য কোন কোন রাজারা 'দিগবলোকন' বা মান-মন্দির নির্ম্মাণ করাইতেন, বড় বড় নদী পার হইবার জন্য হাতীর পিঠে তক্তা বাঁধিয়া 'পুল' তৈয়ারীও করিতেন (রঘু—৪।৩৮)। এখনকার মত 'প্রণাম নমস্কার' অভিবাদনের অঙ্গ ছিল বটে, তবে 'করমর্দ্দন' প্রথা ও একেবারে বিরল ছিল না (বিক্রম—১ম অঙ্ক)।

দর্শন বা ধর্ম্মশাস্ত্র এখনও যেমন তখনও তেমন ছিল, সেই 'জন্মান্তরবাদ', 'কর্ম্মফল', 'মোক্ষ' (রঘু—১৩।৫৮) প্রভৃতি হিন্দু দর্শনের মূল তথ্য বা সত্যগুলি মহাকবির আবির্ভাবের শত শত বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের দেশের ঋষিরা আবিষ্কার করিয়া ছিলেন। তবে দেবপূজা বা পূজা-পদ্ধতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে। আমাদের দেশে এখন আর অগ্নিপূজা হয় না, তখন কিন্তু অগ্নিদেবের পূজা না হইলে চলিত না। ক্ষত্রিয় রাজাদের ও মুনি ঋষিদের এক একটি স্বতন্ত্র অগ্নিগৃহ থাকিত। সূর্য্যদেবের মন্দির ও সূর্য্যপূজার বৃত্তান্তও অনেক পাওয়া যায় (বিক্রম—১ম অঙ্ক)। বৈদিক যুগের অনেক দেবতারা যাঁহাদের আজকাল আর পূজা হইতে বড়-একটা দেখা যায় না, তাঁহারা মহাকবির সময়েও রীতিমত পূজা পাইতেন। দেবরাজ ইন্দ্রের মন্দির ছিল, সেখানে তাঁহার নিয়মিত ভাবে পূজা হইত (বিক্রম—৩য় অঙ্ক)। চন্দ্রদেব ও শচীদেবীর জায়গায় জায়গায় পূজার ব্যবস্থা ছিল। অনেক মন্দিরে দেব-দাসীদের নৃত্যেরও ব্যবস্থা থাকিত। যাগ যজ্ঞে পশু বলিও অবাধে চলিত। তবে গো-ব্রাহ্মণের সে সময়ে সম্মানের অন্ত ছিল না। অজ্ঞানকৃতকর্ম্মের জন্যও ব্রাহ্মণের অভিশাপ, ও গো-মাতার দীর্ঘশ্বাস যে জীবনে সদ্য সদ্য কত পরিবর্ত্তন আনিতে পারে তাহাও মহাকবি নিজের লেখায় দেখাইয়া দিয়াছেন। তবে ব্রাহ্মণেরা সে সময়ে ধর্ম্ম লইয়াই থাকিতেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই তপস্যালব্ধ শক্তি দেখা যাইত বলিয়াই লোকে তাঁহাদিগকে না মানিয়া থাকিতে পারিত না।

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

সূচীপত্র

কালিদাসের গল্প

কুমারসম্ভব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত। পৃথিবীতে হিমালয়ের মত উচ্চ পর্ব্বত আর নাই, সেইজন্য লোকে হিমালয়কে পর্ব্বতের রাজা বলে। একবার, সে কতকাল পূর্ব্বে কেহই বলিতে পারে না, পৃথুরাজা এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞে পৃথিবী হইয়াছিলেন গাভী, আর মেরু-পর্ব্বত দোগ্ধা হইয়া যখন পৃথিবীর মহামূল্য রত্নাদি দোহন করিয়াছিলেন, তখন অন্য সকল পর্ব্বতের অনুরোধে এই হিমালয়ই হইয়াছিলেন বৎস। হিমালয়ে নানা রকমের রত্ন পাওয়া যায় বলিয়া লোকে হিমালয়ের দারুণ শীতকেও উপেক্ষা করে। গুণ যেখানে অসংখ্য, সেখানে এক আধটা দোষ থাকিলেও, লোকে সেটা লক্ষ্য করে না, চন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নায় যখন সারা জগৎ ভরিয়া যায়, তখন কি কাহারও তাহার কলঙ্কের কথা মনে পড়ে? এই হিমালয়ের গুহায় যে কত মুনি ঋষি সিদ্ধি লাভের আশায় তপস্যা করিয়া থাকেন তার সংখ্যা নাই। তাঁহারা যখন তপস্যা করেন, পাছে রৌদ্রে তাঁহাদের কষ্ট হয়, এইজন্যই যেন মেঘ তাঁহাদের মাথার উপর চন্দ্রাতপের মত থাকিয়া রৌদ্র নিবারণ করে।

এই পর্ব্বতের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার নামও হিমালয়। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল মেনা। মেনা ও হিমালয়ের প্রথমে মৈনাক নামে এক পুত্র হইয়াছিল; তারপর যে শুভদিনে, দক্ষযজ্ঞে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া সতী তাঁহাদের ঘরে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, সে দিন যেন সারা পৃথিবীময় একটা সুখশান্তির বাতাস বহিল, স্বর্গ হইতে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। হিমালয় কন্যার নাম রাখিলেন

ধূলাকাদার বেদি তৈয়ারী করিয়া পার্ব্বতীর সখীদের সহিত ক্রীড়া

পার্ব্বতী। দিনে দিনে শশিকলার ন্যায় পার্ব্বতী বড় হইতে লাগিলেন। তিনি সখীদের সহিত কখনও মন্দাকিনীর তীরে ধূলাকাদার বেদি নির্ম্মাণ করিয়া, কখনও বা গোলক, কখনও বা পুতুল লইয়া খেলা করিতেন।

পার্ব্বতীকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য পিতা হিমালয়কে বিশেষ যত্ন করিতে হয় নাই; শরৎকাল আসিলে রাজহংসের দল যেমন আপনিই গঙ্গার জলে সাঁতার কাটিতে আসে, তেমনি পার্ব্বতীর পূর্ব্ব-জন্মে অর্জ্জিত সমস্ত বিদ্যা অতি অল্পকালের মধ্যে আপনারাই আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল।

বয়সের সহিত পার্ব্বতীর রূপও যেন উছলিয়া উঠিতে লাগিল; তাঁহার সে কমনীয় মুখখানি দেখিলে মনে হইত, যেন, বিশ্ববিধাতা ত্রিজগতের মধ্যে যা-কিছু উত্তম, যা-কিছু সুন্দর সমস্ত একত্র করিয়া ঠিক যেখানে যেটি মানায়, সেখানে সেটির সন্নিবেশ করিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

একদিন পার্ব্বতী পিতার নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ সেখানে আসিলেন। তিনি আসিয়া হিমালয়কে বলিলেন, 'মহাদেবের সহিত এই কন্যার বিবাহ হইবে।' দেবতারাও যাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করেন তিনিই হইবেন কন্যার স্বামী—একথা ভাবিতেও হিমালয়ের আনন্দ হইল। তাঁহার অবশ্য মনে হইয়াছিল, যে, তখনই মহাদেবের নিকট গিয়া তাঁহাকে কন্যাদান করিবার প্রার্থনা করেন। কিন্তু কি জানি যদি সে ধ্যানরত তপস্বী তাঁহার প্রার্থনা পূরণ না করেন, সেই ভয়ে তিনি সহসা মহাদেবের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইতে পারিলেন না।

মহাদেব সেই সময় হিমালয়েরই এক স্থানে গঙ্গার তীরে দেবদারু বৃক্ষের তলায় বসিয়া আত্মসংযম করিয়া তপস্যা করিতেন; স্বয়ং যিনি তপস্যার ফলদাতা—তিনিই আজ তপস্বী। 'সহস্র ব্রহ্মাণ্ড যাঁহারে ধেয়ায়, কি-বা ধ্যান তাঁর কে আর জানে!'

হিমালয় একদিন কন্যাকে সঙ্গে করিয়া মহাদেবের নিকট গিয়া তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি দিয়া পূজা করিলেন, এবং পার্ব্বতীকে প্রত্যহ

মহাদেবের পূজা করিতে বলিয়া দিলেন। পার্ব্বতী প্রতিদিন সখীদের সহিত মহাদেবের পূজার ফুল তুলিতেন, বেদি পরিষ্কার করিতেন, নিত্যকর্ম্মের জন্য কুশ ও জল তুলিয়া রাখিতেন। মহাদেবের মনে বিকার ছিল না, তাই তিনি পার্ব্বতীর মত সুন্দরী তরুণীকে আপনার সেবা-শুশ্রূষায় রত দেখিয়াও নিবারণ করিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বর্গের সিংহাসন লইয়া দেবতা ও অসুরদের মধ্যে চিরবিরোধ। অসুরদের মধ্যে যে যখন শক্তিশালী হইয়া উঠিত, কিম্বা ব্রহ্মা-মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতাদেরকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়া বরলাভ করিত, সেই একবার দেবরাজের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইয়া নিজের শক্তির পরীক্ষা করিয়া লইত। কয়েকবার তাহারা স্বর্গের সিংহাসনও অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু স্বর্গে তাহাদের প্রভুত্ব বড় বেশীদিন টি*কিত না, দেবতারা ছলে বলে কৌশলে অসুরদের হারাইয়া স্বর্গ হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেন।

একবার তারক নামে এক অসুর ব্রহ্মাকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়া মহাশক্তি লাভ করিয়াছিল। তারপর সে ধূমকেতুর মত ত্রিভুবনে মহা অনর্থ ঘটাইতে লাগিল; সে যে কেবল দেবতাদেরই যুদ্ধে হারাইয়া দিয়া স্বর্গের রাজা হইয়া বসিল তাহা নহে, দেবতাদের উপর এমন অত্যাচার আরম্ভ করিল, যে, তাহার বর্ণনা করা যায় না। দেবতারা অবশ্য, অনেক-বার তাহার সঙ্গে যুদ্ধও করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মার বরে শক্তি ছিল তাহার অসীম, তাহার সঙ্গে পারে কে? সে প্রতিবারই যুদ্ধে দেবতাদের হারাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারের মাত্রাও বাড়াইয়া দিত।

পার্ব্বতী যে সময় পিতার আদেশে মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন সেই সময় দেবতারা সকলে মিলিয়া আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া একদিন ব্রহ্মার নিকটে তারকের অত্যাচারের কাহিনী বলিবার জন্য গিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার অনেক স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন; তারপর পিতামহ সন্তুষ্ট হইয়া যখন তাঁহাদের এমন-ভাবে সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকট আসিবার কারণ জানিতে চাহিলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে দেবতাদের পক্ষ হইতে বৃহস্পতি বলিলেন, "ভগবন্, দেবতাদের এখন মহা বিপদ; তারক নামে এক অসুর আপনার বরে শক্তিশালী হইয়া আমাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছে;

তাহার অত্যাচারে আমাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই; সূর্য্যকে তাহার খেয়াল অনুযায়ী আলো দিতে হয়, চন্দ্র বেচারার ছুটী নাই, প্রতিরাত্রে তাহাকে পূর্ণিমার ন্যায় ষোল কলায় উঠিতে হয়; পাছে ফুলের ক্ষতি হয় তাই তাহার উদ্যানে বায়ুরও জোরে বহিবার উপায় নাই; ছয় ঋতুকে সে বাগানের মালী করিয়া রাখিয়াছে; তাহার নিকট বরুণেরও নিস্তার নাই, সমুদ্রে যত রকমের মহামূল্য রত্ন পাওয়া যায়, নিত্যই তাহাকে উপহার দিতে হয়; রাত্রে তাহার ঘরে প্রদীপ জ্বলে না, বাসুকীকে সারারাত্রি জাগিয়া মস্তকের মহামণির প্রভায় তাহার শয়নকক্ষ আলোকিত করিয়া রাখিতে হয়; অমন সুন্দর নন্দন-কানন, তাহাতে আর একটীও ভাল গাছ নাই, সে সমস্তই কাটিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে; এতেও তাহার আশ মেটে নাই, দেবতাদের সুন্দরী মেয়ে দেখিলেই তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়; মন্দাকিনীতে সোনার পদ্মও একটীও নাই, সে সমস্তই আপনার পুষ্করিণীতে রোপণ করিয়াছে; তাহার ভয়ে দেবতারা আর গৃহের বাহির হইতে পারে না, পৃথিবীতে যাওয়া আসাও একরকম বন্ধই হইয়া গিয়াছে; আমরা অশেষ চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে পরাস্ত করিতে পারি নাই; আপনি দয়া করিয়া একজন দেবসেনাপতি সৃষ্টি করুন, যাঁহার সাহায্যে আমরা তারককে পরাজিত করিয়া আবার আমাদের নষ্ট জয়শ্রী পুনঃ প্রাপ্ত হই!"

বৃহস্পতি যাহা বলিলেন, সমস্ত শুনিয়া পিতামহ ব্রহ্মা দেবতাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে; তোমরা যে দেবসেনাপতির কথা বলিতেছ, তাঁহাকে ত' আমি নিজে সৃষ্টি করিতে পারি না; তারক আজ আমারই বরে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, কাজেই আমি নিজে তাহাকে কেমন করিয়া বিনাশ করি? একটা বিষবৃক্ষকেও যদি নিজের হাতে রোপণ করা যায়, শেষে স্বহস্তেই তাহা কাটিয়া ফেলা যায় কি? এক সময়, সে এমন ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিল, যে, সে ইচ্ছা করিলেই জগৎসংসার দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারিত, আমি কেবল বর দিয়া কোনও গতিকে তাহা নিবারণ করিয়াছি। সে একজন মহাযোদ্ধা; মহাযোগী মহেশ্বরের পুত্র ছাড়া

আর কাহারও সাধ্য নাই তাহাকে পরাজিত করিতে পারে। উমার সৌন্দর্য্যে যদি মহাদেবের মন কোনও রকমে আকৃষ্ট হয়, আর তিনি যদি তাঁহাকে বিবাহ করেন তবে তাঁহাদের যিনি পুত্র হইবেন, তিনিই হইবেন তোমাদের যোগ্য সেনাপতি।"

লোক-পিতামহ ব্রহ্মার কথা শুনিয়া দেবতারা সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলেন। তখন কি উপায়ে পার্ব্বতীর প্রতি মহাদেবের মন আকৃষ্ট করিতে পারা যায়, ইহাই হইল দেবরাজের প্রধান ভাবনা। তিনি জানিতেন যে, এ সব কাজে যদি কেহ সফল হইতে পারে ত' সে এক মদন ছাড়া আর কেহ নয়; তাই তিনি তখনই মদনকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন।

মদন সভায় প্রবেশ করিবামাত্রই দেবরাজ অমনি সাদরে তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া আপনার পাশে বসিতে বলিলেন। একেবারে প্রভুর পাশে বসিতে পাইয়া কাম যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন; তিনি মহা উৎসাহে বলিতে লাগিলেন, "আদেশ করুন দেবরাজ, আমাকে এখন কি করিতে হইবে। কেহ কি আপনার পদাকাঙ্ক্ষী হইয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাকে কি একবার আমার এই পুষ্পবাণের শক্তিটা দেখাইতে হইবে? না, কেহ কি মুক্তি কামনা করিয়া আপনাকে জ্বালাতন করিতেছে, তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে হইবে? কোনও কামিনী কি আপনার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছে? একবার আদেশ দিন, তাহাকে একেবারে আপনার চরণের দাসী করিয়া দেই; বলুন দেবরাজ, ত্রিজগতের মধ্যে কোন কাজ আমার অসাধ্য? আপনার বজ্র এখন বিশ্রাম করুক, শত্রুজয়ের ভার আমার উপর দিন, দেখুন আমি কি না করিতে পারি: দৈত্য, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ ত্রিজগতে কে এমন আছে যাহাকে আমি জয় করিতে পারি না? দৈত্য দানব ত' ছার, তাহাদের হারান অতি তুচ্ছ কথা; যদি আদেশ করেন এই সামান্য ফুলের বাণে মহাযোগী মহেশ্বরেরও ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারি, অন্যের কথা আর কি বলিব?"

মদনের সদম্ভ উক্তি, বিশেষতঃ শেষের কথাগুলি, শুনিয়া দেবরাজের কৌতূহলের সীমা রহিল না; তিনি বলিলেন, "বন্ধু, যা

বলিলে, এ তোমার উপযুক্ত কথাই বটে ; বজ্র আর তুমি এই দুইজনই আমার প্রধান সহায়, বজ্র প্রয়োগ আবার সব জায়গায় চলে না, তখন তুমি ছাড়া আর আমার গতি নাই। কাজটা শক্ত, সেই জন্যই তোমার উপর এ কাজের ভার দিতে চাই। বাসুকীর শক্তি আছে বলিয়াই ত' ভগবান্ পৃথিবী ধারণ করিবার ভার বাসুকীকে দিয়াছেন, নহিলে, জগতে কি আর সর্প ছিল না ? তুমি যে এইমাত্র বলিলে যে ইচ্ছা করিলে তুমি মহাযোগী মহেশ্বরেরও ধ্যান ভঙ্গ করিতে পার—ঠিক সেই কাজটাই করিবার জন্য আজ তোমায় আমরা সবাই এখানে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি ; আমরা এমন একজন সেনাপতি চাই, যিনি অসুর-রাজ তারককে যুদ্ধে হারাইতে পারিবেন। স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে পার্ব্বতীর গর্ভে যদি মহাদেবের পুত্র হয়, তবে সেই পুত্রই হইবেন আমাদের সেনাপতি। কাজেই উমার সহিত যে-কোনও উপায়ে শঙ্করের বিবাহ দেওয়া চাই, আর এই কাজের জন্যই তোমায় আমাদের এত অনুরোধ। তোমার পক্ষে একটা খুব সুবিধার কথা এই যে, এখন শঙ্কর হিমালয়েই তপস্যা করেন, আর উমা তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত আছেন, প্রতিদিনই দুইজনার সাক্ষাৎ হয়, তোমায় বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। আমরা এই যত দেবতারা এখানে রহিয়াছি, সবাই মিলিয়া অনুরোধ করিতেছি, তুমি আমাদের এই কাজটী করিয়া দাও। দেখ, যে কাজ অন্যে পারে না সে কাজ যে পারে সংসারে সে-ই ত' যশস্বী হয়। আর ইহাতে ত্রিভুবনের সকলেরই যথেষ্ট উপকার হইবে। তোমার ত' পুষ্পবাণ, ইহাতে হিংসারও কিছু নাই। বসন্তও তোমার সহায় হইবে।"

মদন তখন 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রভুর আদেশ গ্রহণ করিলেন, দেবরাজও তাঁহার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া তাঁহাকে আরও উৎসাহিত করিয়া দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রতি ও বসন্তকে সঙ্গে লইয়া মদন মহাদেব যেখানে তপস্যা করিতেন, সেই তপোবনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রতি ও বসন্ত মদনের সঙ্গে চলিলেন বটে, তবে তাঁহাদের এ কাজটা কেমন ভাল বলিয়া মনে হইল না, একটা ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁহাদের বুক কাঁপিয়া উঠিল। কিয়ৎকালের মধ্যেই তাঁহারা মহাদেবের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সহসা বসন্তের আবির্ভাবে তপোবন যেন এক নূতন শ্রী ধারণ করিল। অশোক, পলাশ প্রভৃতি যে সকল বৃক্ষে পুষ্প ছিল না, সে সকল বৃক্ষের প্রতি শাখা পুষ্পে পুষ্পে ভরিয়া গেল; দক্ষিণ বাতাস পাইয়া কোকিল-কোকিলা কূজন করিয়া উঠিল; আম্রের শাখায় নূতন মুকুল দেখিয়া মধুকরের দল গুন্ গুন্ করিতে করিতে মধুপান করিতে ছুটিল। তারপর যখন রতি ও মদন আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, তখন আশ্রমের প্রত্যেক পশু, পক্ষী, নর, কিন্নর যেন কিসের একটা সজীবতা অনুভব করিল, চারিদিকে সকলেই সজীব চঞ্চল হইয়া উঠিল, আশ্রমে সর্ব্বদা যে স্নিগ্ধ শান্তি বিরাজ করিত, সে পরিপূর্ণ শান্তি আর রহিল না, ক্রমে সকল প্রাণীই যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতে লাগিল—মহাদেবের প্রমথরাও বাদ গেল না; অপ্সরা, কিন্নরীদিগের বসন্তের গীত শঙ্করের কর্ণেও প্রবেশ করিল, কিন্তু সে যোগীশ্বরের চিত্তে কোনও বিকার আসিল না, তিনি যেমন সমাধিতে মগ্ন ছিলেন, তেমনিই রহিয়া গেলেন।

বসন্তের এমন অসময়ে সহসা আগমন, আর চারিদিকে পশু-পক্ষীর সচঞ্চল ভাব নন্দীর ভাল লাগিল না, তিনি তখনই সুবর্ণের বেত্রদণ্ড হেলাইয়া, মুখের উপর তর্জ্জনী রাখিয়া সকলকে চুপ করিয়া থাকিতে আদেশ দিলেন, নন্দীর ভ্রূকুটীতে প্রত্যেক প্রাণী যে যেখানে ছিল, সে সেখানেই নীরব, পটে আঁকা ছবির মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, তপোবন আবার শান্তভাব ধারণ করিল।

নন্দী যাহাতে দেখিতে না পান, এমন ভাবে মদন ও রতি একেবারে মহাদেব যেখানে ধ্যান করিতেন, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, সম্মুখে দেবদারু বৃক্ষের তলে ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর সমাধিমগ্ন মহাদেব—দুই জানুর উপর দুই পা, ক্রোড়ের মধ্যে দুই হাত রাখিয়া ধ্যানস্তিমিতলোচন হইয়া বসিয়া আছেন, উন্নত সুন্দর তনু—তাহার মধ্য হইতে তেজঃ যেন চারিদিকে ফুটিয়া বাহির হইতেছে, দেখিলে মনে হয় যেন বায়ুহীন স্থানের নিষ্কম্প প্রদীপ। তাঁহার সে প্রভাবপূর্ণ, জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিলে পরাজিত করিবার চেষ্টা করা ত' দূরের কথা, পরাজয় করিবার কল্পনাও করিতে পারা যায় না। দূর হইতে মদন সে তেজঃপূর্ণ সুন্দর আকৃতি দেখিয়াই তাঁহার দিকে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, কি যেন কিসের একটা আকর্ষণ তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, তিনি মোহাবিষ্টের মত কেবল চাহিয়াই রহিলেন, তাঁহার হাত হইতে তীর ও ধনু কখন যে ভূমির উপর পড়িয়া গেল, তিনি জানিতেও পারিলেন না।

সেদিন মহাদেবের আশ্রমে অনেক ফুল ফুটিয়াছিল বলিয়া পার্ব্বতীর সখীরা তাঁহাকে সেই ফুল দিয়া সুন্দরভাবে সাজাইয়া দিয়াছিলেন; একে ত' তাঁহার স্বাভাবিক রূপের তুলনা হয় না, তাহার উপর আবার পুষ্পের আভরণ তাঁহাকে যেন চলমান পুষ্পিতা লতার মত মনে হইতেছিল। তিনি প্রতিদিনের মত সেদিনও শিবপূজার জন্য নৈবেদ্য লইয়া মহাদেবের নিকটে আসিলেন। সম্মুখে পার্ব্বতীকে দেখিয়া মদনের সে মোহাবেশ কাটিয়া গেল, তিনি মনে যেন নূতন বল পাইলেন; পার্ব্বতীর ভুবনমোহন রূপের সাহায্যে তিনি যে শঙ্করকে নিশ্চয় পরাজয় করিতে পারিবেন সে বিষয়ে তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না। তিনি ভূমির উপর হইতে আপনার তীর ও ধনুক পুনরায় হাতে তুলিয়া লইয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহাদেবের তখন সমাধি শেষ হইয়া আসিয়াছিল, তিনি যে অন্তরের দৃষ্টির সাহায্যে পরমাত্মার ধ্যান করিতেছিলেন, সে দৃষ্টি আবার তপোবনে ফিরাইয়া আনিতেছিলেন, এমন সময় নন্দী আসিয়া প্রভুকে

উমার আগমন সংবাদ জানাইলেন। হরের অনুমতি পাইয়া গৌরী ও তাঁহার দুইজন সখী মহাদেবের সম্মুখে আসিয়া তাঁহারা সযত্নে যে ফুল তুলিয়া আনিয়াছিলেন, সেগুলি তাঁহার শ্রীচরণে অঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিলেন। মহাদেব অন্যদিন বড় একটা কথা কহিতেন না, সেদিন উমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, 'অন্যনারীপরাঙ্মুখ স্বামী লাভ কর।'

উমা সেদিন মন্দাকিনী-নদী হইতে পদ্মবীজ সংগ্রহ করিয়া একটী সুন্দর মালা গাঁথিয়া আনিয়াছিলেন, এখন সেই মালাগাছটী দুই-হাতে ধরিয়া মহাদেবের গলায় পরাইয়া দিবার জন্য তাঁহার অতিনিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, রতিপতিও সুযোগ বুঝিয়া আপনার পুষ্পধনুতে সম্মোহন নামক বাণ সংযোগ করিয়া দেবাদিদেবকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। মহাদেব সন্তুষ্টচিত্তে, মালাগাছটী পরিবার জন্য পার্ব্বতীর দিকে গলা বাড়াইয়া দিতেই উমার কমনীয় মুখের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল; চন্দ্রের উদয়ে সাগর যেমন উদ্বেলিত হইয়া উঠে, পার্ব্বতীর সে অপরূপ লাবণ্যময়ী মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া মহাদেবের ধৈর্য্য লোপ পাইল, তিনি ক্ষণেকের তরে উমার বিম্বফলের ন্যায় অধরোষ্ঠের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। উমার হৃদয়ও স্থির রহিল না, মহাদেবের সে চাহনী তিনি কখনও দেখেন নাই, পুলকে তাঁহার সারাদেহ কদম্বপুষ্পের মত রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, তিনি তাঁহার সুন্দর গ্রীবা বিচিত্র ভঙ্গীতে বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিমেষের মধ্যেই মহাদেব বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মনে বিকার আসিয়াছে, অস্থির মন জোর করিয়া সংযত করিয়া সে বিকারের কারণ জানিবার জন্য চারিদিকে চাহিতেই সম্মুখে দেখিলেন বামপদ ভূমির উপর রাখিয়া ধনুকে তীর যোজনা করিয়া মদন তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। মদনের স্পর্দ্ধা দে. .া ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, ভীষণ ভ্রূকুটী করিয়া মদনের দিকে চাহিতেই সহসা তাঁহার তৃতীয় নয়ন হইতে কালানল বাহির হইতে লাগিল। মহাদেবের ক্রোধ দেখিয়া স্বর্গের দেবতারা মহাশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহারা 'প্রভু, ক্রোধ সংবরণ করুন, ক্রোধ সংবরণ করুন' এই কথা শেষ করিতে না করিতেই, ভবের নেত্রজাত বহ্নি মদনকে

মদন মহাদেবকে লক্ষ্য করিতেছেন।

ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। তপস্যার মহা বিঘ্ন কামকে বিনাশ করিয়া মহাদেব উঠিয়া পড়িলেন, স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যও যেন তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না; তিনি আপনার ভূতগণকে লইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। মহাদেব তাঁহাকে সখীদের সমক্ষে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন দেখিয়া পার্ব্বতী দুঃখে লজ্জায় ভয়ে ম্রিয়মানা হইয়া শূন্য হৃদয়ে গৃহের দিকে চলিলেন. চলিবেন কি, মহাদেবের ক্রোধ দেখিয়া ভয়ে তিনি চোখ চাহিতেই পারিতেছিলেন না, সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার কাঁপিতেছিল। হিমালয় সমস্তই জানিতেন, তিনি তখনই ছুটিয়া আসিয়া কন্যাকে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

মহাদেবের ললাটের চক্ষু হইতে মদনকে ভস্ম করিবার জন্য যখন কালানল বাহির হইয়াছিল, রতি তখন ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন, তারপর তাঁহার সংজ্ঞা যখন ফিরিয়া আসিল, তিনি মদনের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার কপাল পুড়িয়াছে তাঁহার স্বামী আর ইহলোকে নাই। রতির শোকের সীমা রহিল না। বিবাহিত জীবনের সমস্ত ঘটনা একে একে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। তিনি শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া স্বামীর জন্য শোক করিয়া তাঁহারই চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার তাঁহার ইচ্ছা হইল। সেই সময় দৈববাণী হইল, 'মদন আবার বাঁচিয়া উঠিবেন, তিনি নিজেরই কর্ম্মফলে প্রাণ হারাইয়াছেন। যখন মহাদেবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ হইবে, মহাদেবেরই বরে তিনি আবার জীবিত হইবেন, শোক করিও না।' দেবতার বাণী ও পতির প্রিয়বন্ধু বসন্তের সকাতর অনুরোধে রতি গৃহে গমন করিলেন বটে, কিন্তু জীবনের উপর তাঁহার আর কোনও মমতা রহিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পিতার গৃহে যাইয়াও পার্ব্বতী হৃদয়ে শান্তি পাইলেন না। ব্যর্থতায় তাঁহার মন ভরিয়া গিয়াছিল ; দেবর্ষি নারদের আদেশ, পিতার মনোবাঞ্ছা, আপনার অভিলাষ—সমস্তই মিথ্যা হইল। নিষ্ফল তাঁহার রূপ, নিষ্ফল তাঁহার যৌবন, নিষ্ফল তাঁহার সাধনা। পার্ব্বতী ভাবিলেন নিশ্চয়ই তাঁহার সাধনা কামনার উপযুক্ত হয় নাই, আরও কঠোর সাধনা করিতে পারিলে সিদ্ধি আসিবেই। এই ভাবিয়া পার্ব্বতী মুনি-ঋষিরা যেরূপ ভাবে তপস্যা করেন, ঠিক সেইরূপ ভাবে তপস্যা করিবার উদ্যোগ করিলেন। মেনা কন্যার সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন, 'আমাদের গৃহেই যে সব জাগ্রত দেবতারা আছেন, তাঁহাদের নিকট তুমি যা-কিছু প্রার্থনা কর, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিবেন, সে জন্য আবার তপস্যা কিসের ? তোমার শরীরও তেমন নয়, ও-সব সহ্য হইবে না।' পার্ব্বতীর কিন্তু সঙ্কল্প স্থির, বিনা সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে তিনি রাজী নন। মেনা কন্যার সহিত পারিয়া উঠিলেন না, হার মানিলেন। পার্ব্বতী তখন আপনার এক সখীকে দিয়া পিতা হিমালয়ের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, যে পর্যান্ত না সিদ্ধি লাভ হয়, তিনি অরণ্যে গিয়া তপস্যা করিবেন। কন্যার তপস্যার আগ্রহ দেখিয়া হিমালয় সুখী হইলেন, আপনার সম্মতি ও আশীর্ব্বাদ কন্যাকে জানাইয়া পত্নীকে আশ্বাস দিলেন।

পিতার স্নেহপূর্ণ গৃহ ছাড়িয়া পার্ব্বতী হিমালয়ের গৌরীশৃঙ্গে গিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। বহুমূল্য বেশভূষায় যাঁহার কমনীয় দেহ শোভিত থাকিত, এখন তাঁহার পরিধান হইল বল্কল, যাঁহার মস্তকের সুচিক্কন কেশরাশি স্বর্গের শ্রেষ্ঠা রূপসীদেরও ঈর্ষ্যার সামগ্রী ছিল, তাপসের ন্যায় জটা হইল তাঁহার শিরোভূষণ, যিনি কুসুমকোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও আরাম পাইতেন না, ভূমি হইল তাঁহার শয্যা। কিন্তু এসব কষ্ট পার্ব্বতীর কষ্ট বলিয়াই মনে হইল না, তিনি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে তাঁহার

ক্ষুদ্র আশ্রমের বৃক্ষে জল দিতেন, হরিণ-শিশুদিগকে আপন হাতে খাওয়াইতেন। তিনি যখন স্নান করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়া সুমধুর কণ্ঠে ত্রিপুরারির স্তব পাঠ করিতেন, অনেক বৃদ্ধ মুনি-ঋষিও মুগ্ধ হইয়া সেই স্তব শুনিতে আসিতেন। কিন্তু এত করিয়াও পার্ব্বতীর সিদ্ধি লাভ হইল না, তাই তিনি আরও দুষ্কর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। দারুণ গ্রীষ্মের সময় তিনি চারিদিকে অগ্নি জ্বালিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া সূর্য্যের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন; বৃষ্টির দিনে আর আশ্রমে প্রবেশ করিতেন না, মাথার উপর ঝড়বৃষ্টি বহিয়া যাইত; শীতকালে বেশীর ভাগ সময় তিনি জলের মধ্যেই কাটাইতেন; আহার ছিল চন্দ্রের কিরণ আর অযাচিত জল। পার্ব্বতীর এরূপ কঠোর তপস্যা দেখিয়া মুনিবৃদ্ধেরা তাঁহার নাম রাখিলেন 'অপর্ণা'।

একদিন পার্ব্বতী তপোবনে রহিয়াছেন এমন সময় এক ব্রহ্মচারী তাঁহার নিকট আসিলেন; পরিধানে তাঁর মৃগচর্ম্ম, মস্তকে জটা, শরীর হইতে দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে, দেখিলেই মনে হয় যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মচর্য্য রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। পার্ব্বতী অর্ঘ্যাদি প্রদান করিয়া ব্রহ্মচারীর রীতিমত অভ্যর্থনা করিলেন। ব্রহ্মচারী পার্ব্বতীর অভ্যর্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার ও তাঁহার তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "তুমি যে এক মাত্র ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়াছ, ইহাতে ধর্ম্মেরই গৌরব বাড়িয়াছে। দেখ, সাধুরা বলিয়া থাকেন যে দুইজনে যদি সাতটী কথা হয় কিম্বা কোথাও সাত পা এক সঙ্গে যায়, তাহা হইলে তারা দুইজনে দুইজনের বন্ধু হয়। তোমায় আমায় সাতটীর চেয়েও অনেক বেশী কথা হইল; তুমি আমার এখন বন্ধু হইলে, বল দেখি, আমার জানিতে অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে, তোমার এ কঠোর তপস্যা কেন? স্বয়ং প্রজাপতির বংশে তোমার জন্ম, তোমার রূপ দেখিলে মনে হয় যেন ত্রিজগতে যা-কিছু সুন্দর সমস্তই একত্র করিয়া তোমার সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে; তোমার বয়সও নবীন, পিতার ঐশ্বর্য্যেরও তুলনা নাই—তপস্যার কোন ফলটাই বা তুমি পাও নাই? তোমায় দেখিয়াও ত মনে হয় না যে, কোনও শোক কি দুঃখ তোমায় ব্যথা দিয়াছে,

তবে কেন তুমি, এ নবীন যৌবনে সমস্ত আভরণ ফেলিয়া দিয়া যা বৃদ্ধকে শোভা পায় সেই বৃক্ষের বল্কল পরিয়া আছ? পূর্ণিমার রাতে আকাশ যখন চাঁদের জ্যোৎস্নায় আর তারার মালায় ছাইয়া থাকে, সে মধুর যামিনী কি আর অরুণের জন্যে সৃষ্ট হয়? তোমার কামনাই বা কি এমন থাকিতে পারে তাহাও ত বুঝি না, স্বর্গের কামনা তোমার নিশ্চয়ই নাই, কেন-না তোমার পিত্রালয়ই ত দেবভূমি। ঐশ্বর্য্যের কামনা?—তাও ত হইতে পারে না, পিতার যা ঐশ্বর্য্য তাহারই ত সীমা নাই, তবে কি তুমি স্বামীর কামনায় এ ক্লেশ সহ্য করিতেছ? তোমার মত সুন্দরী ত ত্রিভুবনে একটীও দেখি নাই, এমন স্ত্রী-রত্ন তুমি, তোমায় আবার স্বামীর জন্য তপস্যা করিতে হয়? লোকেই ত রত্ন খুঁজিয়া বেড়ায় জানি, রত্ন আবার কবে কাহার খোঁজ করে? আহা, যে যুবার প্রতি তোমার মন আসক্ত সে কি নিষ্ঠুর? যাই হউক, পার্ব্বতী অনেক ক্লেশ তুমি সহ্য করিয়াছ, কত কাল আর তুমি এ কষ্ট সহ্য করিবে? আমি বরং ব্রহ্মচর্য্য সাধনা করিয়া কিছু সিদ্ধি লাভ করিয়াছি, তুমি কোনও বর যদি চাও আমি সে সাধনার বলে, তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারি। বল কি চাও, তোমার মনের ইচ্ছাটী কি?"

পার্ব্বতী ব্রহ্মচারীর সকল কথাই শুনিতে ছিলেন, কিসের কামনায় যে তিনি এ দুঃসাধ্য তপস্যায় রত হইয়াছেন, তাহা তিনি নিজে আর কি বলিবেন, সখীকে ইঙ্গিত করিলেন, সখী তখন একে একে সকল কথাই ব্রহ্মচারীকে বলিয়া গেলেন, শেষে বলিলেন, "মহাদেবের বিরহ আর ইনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না, পূর্ব্বে যখন পিত্রালয়ে থাকিতেন, নির্জ্জনে মহাদেবের চিত্র আঁকিয়া মনকে শান্তি দিতেন, এখন নিরুপায় হইয়া তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন যাহাতে মহাদেবকেই পান।" সখীর কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার সখী যাহা বলিলেন তাহা সত্য কিনা। পার্ব্বতী স্পষ্ট অথচ বেশ সংযত ভাবে বলিলেন যে তাঁহার সখীর কোনও কথাই অতিরিক্ত নয়।

পার্ব্বতীর কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! মহাদেবকে তুমি স্বামীরূপে চাও? তাঁহাকে যে আমি খুব জানি, যতসব অশুভ কাজে

তাপসী পার্ব্বতী ও ছদ্মবেশী মহাদেব

তাঁহার হাত। অমন লোককে আবার বিবাহ করে? তুমি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ, শিবকে যদি বিবাহ কর, তাহা হইলে আর ঘর বাড়ীতে থাকিতে পাইবে না, থাকিতে হইবে শ্মশানে, শ্মশান-ভস্ম তোমার গায়ে মাখামাখি হইবে, এখন গজে চড়িয়া বেড়াও, তখন বৃষ হইবে তোমার বাহন; যাঁহার জাতজন্মের ঠিক নাই, পারিধানের একটা কাপড় জোটে না, দিগম্বর হইয়া বেড়ান, তাঁহার মতন লোককে আবার বিবাহ করিবার সাধ হয়, আরে ছ্যাঃ।"

ব্রহ্মচারীর প্রগল্‌ভ বাক্য শুনিয়া পার্ব্বতী অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইলেন, আরক্তমুখে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি তাঁহাকে পরমার্থত জানেন না, তাই তাঁহার নিন্দা করিতেছেন। মহতের চরিত্র সকলে বোঝে না; তিনি ত্যাগী, তিনি নিষ্কাম, তাঁর ভোগে স্পৃহা নাই বলিয়াই তিনি শ্মশানে থাকেন, চিতা-ভস্ম গায়ে মাখেন; সেইজন্যই তিনি বিশ্বেশ্বর হইলেও দিগম্বর, শ্মশানবাসী হইলেও ত্রিলোকের অভিভাবক, রুদ্র হইলেও তিনি শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়। যিনি বিশ্বরূপ, যাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই, শেষ নাই তাঁহার নিকট চন্দনে আর চিতাভস্মে কোনও প্রভেদ নাই, কারণ দুয়েরই উদ্ভব তিনি। বৃষ তাঁহার বাহন বটে, কিন্তু পথে সাক্ষাৎ হইলে ঐরাবতবাহন ইন্দ্রদেব গজরাজের পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া এই বৃষারোহীরই পদরজঃ মস্তকে ধারণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করেন। আপনি ঠিকই বলিয়াছেন, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যাঁহাকে পিতা বলেন, তাঁহার জনক যে কে সে আর আপনি আমি কি জানিব। তিনি যাহাই হউন, আমি তাঁহাকে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, তিনিই আমার সাধনা, তিনিই আমার কামনা, আপনি আর বেশী কথা কহিবেন না, শিবের নিন্দা করা আর শিব-নিন্দা শোনা দুই-ই সমান।" এই বলিয়া পার্ব্বতী তখনই উঠিয়া পড়িলেন, তাঁহার ভয় হইতে লাগিল আবার বুঝি চপল ব্রাহ্মণ শিবের নিন্দা করে। উঠিবার সময় তাঁহার বক্ষ হইতে বসন খসিয়া পড়িল, আর ঠিক সেই সময় ব্রহ্মচারী তাঁহাকে দুইহাতে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। পার্ব্বতী ভর্ৎসনা করিবার জন্য মুখ তুলিয়া দেখেন—এ কি! এ যে স্বয়ং মহাদেব—তাঁহার চিরপ্রার্থিত মহাদেব ছদ্মবেশে তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিতে আসিয়াছেন, তিনি না

পারেন যাইতে, না পারেন থাকিতে। মহাদেব তাঁহাকে ছাড়িয়া হাসিমুখে বলিলেন, "তোমার তপস্যায় আমি তোমারই হইয়াছি।" পার্ব্বতীর তপস্যার ক্লেশ আর মনে রহিল না, তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে গৃহে গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়া পার্ব্বতী পিতামাতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বড় আশা ছিল, পিতা এইবার উদ্যোগী হইয়া মহাদেবের সহিত তাঁহার বিবাহের বন্দোবস্ত করিবেন। কিন্তু উমার বিবাহ দিবার জন্য হিমালয়ের কোনও আগ্রহ দেখা গেল না, যতই দিন যাইতে লাগিল পার্ব্বতীর অস্থিরতা ততই বাড়িতে লাগিল; তিনি একদিন গোপনে এক সখীকে দিয়া মহাদেবের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন—'তিনি যেন অচিরে হিমালয়ের নিকট পার্ব্বতীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন।' মহাদেব সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ অঙ্গিরা প্রভৃতি সপ্ত ঋষিকে স্মরণ করিলেন; মহাদেবের স্মরণমাত্রেই ঋষিরা সাতজন অরুন্ধতীকে সঙ্গে লইয়া আকাশ হইতে হিমালয়ে মহাদেবের নিকট নামিয়া আসিয়া মহেশ্বরের বিধিমত পূজা করিলেন। তাঁহাদের সকলের পক্ষ হইতে অঙ্গিরা বলিলেন, "আপনা হইতেই চারি বেদের উদ্ভব হইয়াছে, সুতরাং যাঁহাদের হৃদয়ে আপনি রহিয়াছেন তাঁহারা বহুভাগ্যবান, কিন্তু আবার যাঁহাদিগকে: আপনি মনে স্মরণ করেন, তাঁহাদের মত ভাগ্যবান ত্রিজগতে আর কেহ নাই, আপনি আমাদিগকে স্মরণ করিয়া আমাদের জন্ম সার্থক করিয়াছেন, এখন আদেশ করুন কি করিতে হইবে?" তখন মহাদেব বলিলেন, "দেবতারা এখন তারকের অত্যাচারে জর্জ্জরিত;—তাঁহারা শত্রু বিনাশ করিবার জন্য আমার পুত্র প্রার্থনা করেন; আমি তাঁহাদের প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য হিমালয়ের কন্যা উমাকে বিবাহ করিতে চাই, আপনারা হিমালয়ের নিকট যাইয়া সে সম্বন্ধ ঠিক করিয়া দিন। হিমালয়কে যে কি বলিতে হইবে সে আর আপনাদিগকে কি শিখাইব, বিশেষতঃ যখন আর্য্যা অরুন্ধতী সঙ্গে রহিয়াছেন, তখন আমার কোনও কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, মেয়েরাই এসব বিষয়ে বেশ পটু। ওষধিপ্রস্থ নামক নগরে হিমালয় থাকেন, আপনারা সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া মহাকোশী প্রপাতে আমার দেখা পাইবেন।" ঋষিরা মহাদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া হিমালয়ের

বাসস্থান ওষধিপ্রস্থ নগরে গেলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে আর কখনও সে নগরে আসেন নাই, সেখানকার সমৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য হইলেন। যক্ষরাজ কুবেরের রাজধানী অমন যে অলকা সেও শোভাসমৃদ্ধিতে এর কাছে হার মানিয়া যায়, মনে হয় যেন স্বর্গের অধিবাসীরাই এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপনা করিয়া রহিয়াছেন। নগরের মধ্যে: হিমালয়ের বাসভবন চিনিয়া লইতে ঋষিদের দেরী হইল না, তাঁহারা দ্বারে প্রবেশ করিলেন। হিমালয় আসিয়া ঋষিদিগকে রীতিমত সম্মান করিয়া একেবারে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে বেতের আসনে বসাইলেন; হিমালয়ের পত্নী মেনা ও কন্যা পার্ব্বতীও আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। তারপর কুশলসংবাদ আদানপ্রদানের পর অঙ্গিরা ঋষিদের পক্ষ হইতে বলিলেন, "ভূতনাথ শম্ভু আপনার কন্যাকে প্রার্থনা করিয়া আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।" তিনি আরও বলিলেন, "যাঁহাকে সমস্ত দেবতারা প্রণাম করেন, তিনি কাহাকেও প্রণাম করেন না, যাঁহাকে সকলেই স্তব করেন, তিনি কাহারও স্তব করেন না, তাঁহাকে কন্যাদান করিয়া সেই বিশ্বগুরুরও গুরু হউন।" মহাদেবকে কন্যাদান করা সৌভাগ্য মনে করিয়াও হিমালয় একবার পত্নীর দিকে চাহিয়া তাঁহার মনোভাব জানিতে চাহিলেন, মেনাও ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, এবিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। হিমালয় তখনই কন্যার হাত ধরিয়া ঋষিদের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "মহাদেবের বধূ আপনাদের সকলকে প্রণাম করিতেছে, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন।" ঋষিরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিলেন, অরুন্ধতী লজ্জাশীলা উমাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাঁহার ভাবী পতির অনেক গুণ বর্ণনা করিলেন। শুনিতে শুনিতে উমার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

এদিকে হিমালয় কন্যার বিবাহ যত শীঘ্র হয় ততই ভাল মনে করিয়া ঋষিদিগকে তখনই বিবাহের শুভদিন ঠিক করিয়া ফেলিতে বলিলেন। তাঁহারা তিনদিন পরে শুভলগ্ন দেখিয়া সেই দিনে বিবাহ হইবে বলিয়া মহাদেবকে মহাকোশী প্রপাতে গিয়া সমস্ত সংবাদ দিয়া আসিলেন। পার্ব্বতীর সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা মহাদেবের এত বেশী

হইয়াছিল যে, তিনি এ তিন দিন কেমন করিয়া কাটাইবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

মহা উৎসাহে হিমালয় কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ওষধিপ্রস্থ নগরের পথের উপর মধ্যে মধ্যে সোনার তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া সেই সমস্ত তোরণের উপর হিমালয় রেশমের পতাকার ব্যবস্থা করিলেন। রাজপথ পুষ্পে পুষ্পে ভরিয়া গেল, হিমালয়ের বাসভবনের সাজ-সজ্জার তুলনা রহিল না।

বিবাহের দিন সকাল বেলা পতি-পুত্রবতী নারীরা পার্ব্বতীকে স্নানের ঘরে লইয়া গিয়া তেল মাখাইলেন, তারপর গায়ের সে তেল উঠাইবার জন্য লোধ্রপুষ্পের রেণু বেশ করিয়া মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিলেন। তখনকার দিনে সাবান ছিল না, তাই এই ব্যবস্থা। বাহিরে তূর্য্য-ধ্বনি হইতে লাগিল। স্নান সারা হইলে সকলে তাঁহাকে আর একটী গৃহে লইয়া গিয়া সাজাইবার জন্য কৌতুক-বেদির উপর বসাইলেন। তাঁহার যা স্বাভাবিক রূপ, তাহার নিকট কি আর কৃত্রিম আভরণ? তবু বিবাহে সাজাইতে হয় বলিয়াই মেয়েরা পার্ব্বতীকে সাজাইতে লাগিলেন। কেহ ধূপের ধূমে তাঁহার সুচিক্কণ কেশপাশ শুষ্ক করিয়া পুষ্প ও দূর্ব্বা দিয়া বেণী বাঁধিয়া দিলেন, কেহবা তাঁহার গায়ে অগুরু মাখাইয়া দিলেন, আবার কেহবা মুখের উপর তিলক দিয়া সাজাইয়া দিলেন। তারপর তাঁহার পায়ে আলতা ও চোখে কাজল দিয়া তাঁহার সখীরা রত্নাভরণে তাঁহার সুন্দর তনু সাজাইয়া দর্পণ আনিয়া যখন তাঁহাকে কেমন সাজান হইয়াছে দেখিতে বলিলেন, পার্ব্বতী তখন আপনার রূপ দেখিয়া আপনিই মোহিত হইলেন, তাঁহার মনে হইল কতক্ষণে তাঁহার চিরপ্রার্থিত মহাদেব আসিয়া তাঁহার সে রূপ দেখিয়া তাঁহাকে ধন্য করিবেন। তারপর মেনা বিবাহের কতকগুলি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিতে আসিলেন। নয়ন তাঁহার অশ্রুপূর্ণ, মনেরও ঠিক নাই, কি করিতে কি করিয়া ফেলেন, আবার উমার ধাত্রী সব ঠিক করিয়া দেয়। নূতন চেলী পরাইয়া মেনা কন্যাকে প্রথমে ঠাকুর ঘরে লইয়া গিয়া গৃহদেবতাকে প্রণাম করাইয়া উপস্থিত বয়োবৃদ্ধাগণের চরণধূলি লওয়াইলেন।

বাহিরে হিমালয় আপনার ঐশ্বর্য্য ও পদমর্য্যাদার অনুরূপ সমস্ত আয়োজন করিয়া বন্ধুদের লইয়া বর আসিবার প্রতীক্ষায় রহিলেন। কুবের-শৈলে ছিলেন মহাদেব, তাঁহার সখা সখী কেহ ছিল না, তাই মাতৃকারা আসিলেন তাঁহাকে বর সাজাইতে। মহাদেব তাঁহাদের সে রত্নাভরণ কেবল তাঁহাদের মান রাখিবার জন্য স্পর্শই করিলেন, পরিতে চাহিলেন না; তাঁহার সেই ব্যাঘ্র-চর্ম্ম, চিতাভস্ম, অক্ষকুণ্ডল, সবই রহিল, মাতৃকারা কেবল সেইগুলি দিয়াই সুন্দররূপে মহাদেবের অঙ্গ ভূষিত করিয়া দিলেন। বিশ্বেশ্বরের গৃহে দর্পণ ছিল না, সুমার্জ্জিত খড়্গে মহাদেব আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া বৃষের পৃষ্ঠে ব্যাঘ্র-চর্ম্মের উপর বসিয়া শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিলেন। সূর্য্য তাঁহার মস্তকে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত নূতন ছত্র ধরিয়া রহিলেন, আর দুই পাশে থাকিয়া গঙ্গা-যমুনা বরকে চামর করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা একে একে আসিয়া মহাদেবের সহিত দেখা করিয়া বরযাত্র হইয়া তাঁহার সহিত চলিলেন। পথে যাইবার সময় প্রমথরা খুব বাজনা বাজাইতে লাগিল। বর ওষধিপ্রস্থনগরের উপকণ্ঠে আসিয়াছেন, সংবাদ পাইয়া হিমালয় আপনার বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া আসিয়া বর ও বরযাত্রীদিগকে রীতিমত অভ্যর্থনা করিয়া সহরে প্রবেশ করাইলেন।

সহরের মধ্যে বর আসিয়াছে শুনিয়া পুরবাসীরা বর দেখিতে পথে ছুটিয়া আসিল; মেয়েরা বাড়ীর বারান্দায়, কেউ-বা ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া বর দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। একে দেবতাদের এরূপ একত্র সমাবেশ প্রায় দেখা যায় না, তায় আবার বরের বিশ্ববিমোহনরূপ, সে এক অভাবনীয় ব্যাপার!

বর ক্রমে হিমালয়ের প্রাসাদে পৌঁছিলেন, স্বয়ং বিষ্ণু আসিয়া অত্যন্ত সমাদর করিয়া বরের হাত ধরিয়া বৃষের পৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে হিমালয় চিরপ্রথামত বরের জন্য অর্ঘ্য, রত্ন, মধুযুক্ত গব্য ও পট্টবস্ত্র যথাবিধানে বরকে উপহার দিলেন। এবার ভূতনাথকে ব্যাঘ্রচর্ম্ম ছাড়িয়া চেলীর জোড় পরিতেই হইল। তখন কনেকে সভায় আনিয়া দুইজনের 'শুভদৃষ্টি' করান হইল। হিমালয় মহাদেবের হস্তে

কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তারপর পুরোহিত বর-কন্যাকে তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়া উমাকে অগ্নিতে খৈ অর্পণ করিতে বলিলেন, আর বলিলেন, "বৎসে, এই অগ্নি তোমার বিবাহের সাক্ষী, তুমি তোমার স্বামী শিবের সহিত ধর্ম্মচর্য্যা করিবে।" তারপর বরকে বলিলেন, 'উমাকে ধ্রুব-নক্ষত্র দর্শন করাও।' মহাদেব বধূর মুখ তুলিয়া ধরিলেন, উমা লজ্জায় অভিভূতা হইয়া কোনও গতিকে 'দেখিয়াছি' বলিয়া পরিত্রাণ পাইলেন। বিবাহ হইয়া গেলে পর, বরকন্যা ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ হিমালয়ের সুপ্রশস্ত অঙ্গনে বসিয়া নাট্যাভিনয় দেখিতে লাগিলেন, অপ্সরাগণের কৃত সেই নাটকের অভিনয় দেখিয়া সকলেই খুব সন্তুষ্ট হইলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া হিমালয়ের আদেশে বরকন্যাকে বাসরঘরে লইয়া যাওয়া হইল, তখন ইন্দ্রাদি দেবতারা সকলে মিলিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া মহাদেবের নিকট হইতে মদনের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন, মহাদেবেরও মন তখন প্রসন্ন ছিল, তিনি 'তথাস্তু' বলিয়া বাসরঘরে শয়ন করিতে গেলেন; কিন্তু প্রমথগণের বিকট অঙ্গভঙ্গীতে সকলে সারারাত্রি কেবল হাস্য করিয়াই কাটাইলেন, কেহই আর ঘুমাইতে পারিলেন না।
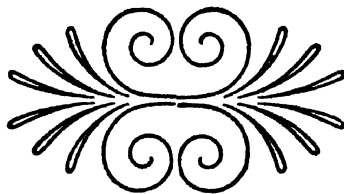
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অতি সুখেই হরপার্ব্বতীর দিন কাটিতে লাগিল। প্রায় একমাসকাল হিমালয়ের বাড়ীতে থাকিয়া মহাদেব পার্ব্বতীকে লইয়া কৈলাসে আসিলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া তাঁহারা আবার বাহির হইলেন, কখন মলয় পর্ব্বতের উপত্যকায়, কখন নন্দনকাননের সুরম্য কুঞ্জে, কখনও-বা গন্ধমাদন শৈলে ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা আবার কৈলাসে ফিরিয়া আসিলেন, তারপর যে দিন এক শুভ মুহূর্ত্তে কার্ত্তিকের জন্ম হইল সেদিন কৈলাসের প্রমথরা যে উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন, নন্দীভৃঙ্গীদের মধ্যে সেদিন চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কৈলাসের সমস্ত স্ফটিকময় গৃহ ও স্বর্ণের তোরণ তাহারা পারিজাত বৃক্ষের পুষ্পে সজ্জিত করিল। দেবতাদের আদেশে সুমধুর পটহধ্বনিতে কার্ত্তিকের জন্ম-সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইল। গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরদিগের সুন্দরী নারীরা মঙ্গলগীত গাহিতে গাহিতে কৈলাসে পার্ব্বতীর নিকট উৎসবে যোগদান করিতে আসিলেন। অপ্সরারা মহাদেবের ভবনে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল, স্বর্গ হইতে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

এদিকে তারকাসুরের অত্যাচারে দেবতাদের আর দুর্দ্দশার সীমা নাই, কখন যে কার ভাগ্যে কি সর্ব্বনাশ ঘটে এই ভয়েতেই দেবতারা অস্থির। তারপর তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, কার্ত্তিক একজন অদ্বিতীয় যোদ্ধা হইয়া উঠিয়াছেন তখন সকলে মিলিয়া চাতকপাখী যেমন মেঘের নিকট জল প্রার্থনা করে, তাঁহারা তেমনি দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট হইতে কার্ত্তিককে অসুর মারিতে লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে আসিলেন। মহাদেবের গৃহের দ্বারে প্রহরী ছিলেন নন্দী, তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর দেখাইয়া মহাদেবকে তাঁহার আগমন সংবাদ জানাইয়া আসিলেন। মহাদেবের আজ্ঞা পাইয়া দেবতারা কৈলাসপতির গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন রত্নময় সভার মধ্যে নন্দী ভৃঙ্গী প্রমথগণ পরিবেষ্টিত মহাদেব পার্ব্বতীকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন,

হস্তে প্রকাণ্ড শূল। নিকটে তাঁহার প্রিয়পুত্র কার্ত্তিক একাগ্রচিত্তে অস্ত্র-শস্ত্র শিক্ষা করিতেছেন। মহাপুরুষের সে তেজোব্যঞ্জকরূপ দেখিয়া ইন্দ্র যেন মুগ্ধ হইয়া গেলেন, সেইদিন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, গৌতম ঋষির শাপে যে তাঁহার শরীরে এক সহস্র চক্ষু হইয়াছিল, তাহা শাপ নয় যেন বর, সহস্র চক্ষু পাওয়া আজ তাঁহার সার্থক হইল। নন্দী তখন প্রভুর সম্মুখে আসিয়া জোড়হস্তে দেবরাজের প্রতি কৃপা করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করাতে মহাদেব মধুর হাস্যে দেবতাদিগকে অনুগৃহীত করিলেন। দেবতারা একে একে মহাদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে তাঁহারই নিকটে স্বর্ণের আসনে বসিবার পর মহাদেব তাঁহাদের আসিবার কারণ জানিতে চাহিলেন। ইন্দ্র বলিলেন, "প্রভু, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান্ কিছুই আপনার অগোচর নয়, তারকাসুরের অত্যাচারও আমরা পূর্ব্বেই আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিয়াছি, এখন আমাদের প্রার্থনা এই যে, আপনি কৃপা করিয়া আপনার প্রিয়পুত্র কার্ত্তিককে আমাদের সেনাপতি হইবার আদেশ দিন। তাঁহার সাহায্যে আমরা তারকাসুরকে মারিয়া স্বর্গরাজ্যের উদ্ধার করি।" দেবরাজের কথা শুনিয়া মহাদেব বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য। তাহার জন্য আবার ভাবনা কিসের? দেবতাদের রক্ষার জন্যই কার্ত্তিকের জন্ম, দেবতাদের অনুরোধেই ত আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়াও পার্ব্বতীকে বিবাহ করিয়াছি, আপনারা এখনই কার্ত্তিককে আপনাদের সেনাপতি-পদে বরণ করিয়া লইয়া যান।"

পিতার আদেশ পাইয়া কার্ত্তিক দেবতাদের সহিত যাইবার জন্য পোষাক-পরিচ্ছদ বদলাইয়া আসিয়া জনক-জননীর চরণধূলি লইলেন; মহাদেব, "শত্রুবিনাশ কর" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া পুত্রের মস্তকে চুম্বন করিলেন। পুত্র যুদ্ধে যাইবে শুনিয়া পার্ব্বতীর মনে অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল, তিনি কার্ত্তিককে কোলে তুলিয়া লইয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন, "শত্রুনাশ করিয়া আমার বীরজননী নাম সার্থক কর।" তখন ইন্দ্র প্রভৃতি অপরাপর দেবতারা হরপার্ব্বতীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া মহা উল্লাসে কার্ত্তিককে লইয়া স্বদেশের উদ্ধার করিতে চলিলেন।

কৈলাস হইতে স্বর্গ বেশী দূর নয়, তাঁহারা সকলে অবিলম্বে স্বর্গরাজ্যের রাজধানী অমরাবতীর সিংহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তখন স্বর্গপুরে কে যে প্রথমে প্রবেশ করিবে ইহাই হইল সমস্যা; অসুরের ভয়ে দেবতাদের মধ্যে এমন কাহারও সাহস হইল না যে, আগুয়ান হইয়া অমরাবতীর ফটক পার হয়। তবু মুখে, ও উহাকে এ ইহাকে, বলে, 'আপনি আগাইয়া যান' 'আমি যাইতেছি' 'কেন আপনি আগে চলুন না' 'আমি পরে যাইতেছি'—কিন্তু সাহস সকলেরই সমান, কেহ আর এগোয় না। কার্ত্তিক এতক্ষণ চারিদিকের সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন; তিনি কখনও কৈলাসের বাহিরে আসেন নাই, যা দেখেন মনে হয় অপূর্ব্ব। দেবতাদের গোলমাল শুনিয়া কার্ত্তিক মুখ ফিরাইয়া দেখেন, দেবতারা উৎসুক নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। তিনি তাঁহাদের মুখে ভয়ের লক্ষণ সুস্পষ্ট দেখিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, এবং সহাস্য বদনে সকলকে অভয় দিয়া নিজে অগ্রসর হইয়া স্বর্গপুরের দ্বারে প্রবেশ করিলেন। কার্ত্তিকের বীরত্ব দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি তৎক্ষণাৎ আপনার উত্তরীয়খানি খুলিয়া কার্ত্তিককে পরাইয়া দিলেন, কার্ত্তিকও দেবসমাজের সভ্যতা অনুসারে নিজের উত্তরীয় দেবরাজের গাত্রে অর্পণ করিলেন। তখন আর কাহারও ভয় রহিল না। কার্ত্তিকের সহিত স্বর্গের প্রবেশদ্বার পার হইয়াই সকলে একেবারে মন্দাকিনীর তীরে আসিয়া পড়িলেন। দেবতারা বহুকাল মন্দাকিনীর সে পবিত্র জলরাশি দেখিতে পান নাই, তাই সকলে মন্দাকিনীর তীরে আসিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া সহরের দিকে চলিলেন। যতই যান অমরাবতীর কেবল ভগ্নশ্রীই তাঁহাদের চোখে পড়ে। যে নন্দন-কাননের শোভা ত্রিজগতে অতুলনীয় ছিল তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া দেবতাদের চক্ষে জল আসিল। কোথায় বা সে পারিজাত, কোথায় বা সে কল্পবৃক্ষ, কে যেন ইচ্ছা করিয়াই উৎকৃষ্ট বৃক্ষগুলি সব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। অমরাবতীর সে সুন্দর স্ফটিকের অট্টালিকা যাহার দিকে চাহিলে নয়ন নিষ্পলক হইয়া যাইত, যাহার গবাক্ষে দাঁড়াইয়া একসময়ে কত সুন্দরী নারী পথের শোভা দেখিত, হস্তীর দন্তাঘাতে সে সকল আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ইন্দ্র ক্রমে কার্ত্তিককে আপনার

'বৈজয়ন্ত প্রাসাদে' লইয়া গেলেন। বৈজয়ন্ত প্রাসাদের ভিত্তি ছিল স্বর্ণের, তারকের মদমত্ত হস্তী দন্তাঘাতে সে সুন্দর ভিত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। রত্নময় জানালা কপাট সমস্তই ভগ্ন। ইন্দ্র পথ দেখাইয়া প্রাসাদের ভিতরে যেখানে মহামুনি কশ্যপ ও তাঁহার পত্নী অদিতি বসিয়াছিলেন ও নারদাদি দেবর্ষিরা স্তব পাঠ করিতেছিলেন, সেখানে কার্ত্তিককে লইয়া গেলেন। কার্ত্তিক তাঁহাদের চরণধূলি গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীকে প্রণাম করিলেন; তাঁহারাও সকলে মিলিয়া কার্ত্তিকের জয় কামনা করিয়া আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর দেবতারা সকলে মিলিয়া কার্ত্তিককে আপনাদের সেনাপতিপদে বরণ করিলেন, চারিদিকে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল।
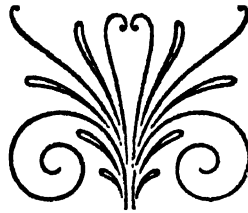
সপ্তম পরিচ্ছেদ

বৈজয়ন্ত প্রাসাদে দেবতারা তারকাসুরের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তারক স্বর্গরাজ্য জয় করিয়া ইন্দ্রের রাজধানী অমরাবতী লুটপাট করিয়া অমরাবতীরই কিছুদূরে সুমেরু পর্ব্বতের নীচে আপনার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল। অমরাবতী পতিপুত্রবিহীনা নারীর ন্যায় হতশ্রী হইয়া পড়িয়াই ছিল, তারকের আর এদিকে কোনও নজর ছিল না, সেইজন্য দেবতাদের যুদ্ধের আয়োজন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। কার্ত্তিক নিজে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া 'বিজিত্বর' নামক রথে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইলেন, তাঁহার পশ্চাতে ইন্দ্র ঐরাবতে, অগ্নি মেষে, যম মহিষে, বরুণ মকরে, বায়ু মৃগে, কুবের ভৃত্যের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া বিপুল উৎসাহে তারকের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিলেন। আরও যত দেবতা ছিলেন, সকলেই আপন আপন বাহনের পৃষ্ঠে বসিয়া মহাকোলাহল করিতে করিতে প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী জন্মভূমির উদ্ধার কামনায় কার্ত্তিকের অনুগামী হইলেন। পদাতিকের কোলাহলে, হস্তী ও অশ্বসৈন্যের চীৎকারে, রণভেরীর বিকটধ্বনিতে সুমেরু পর্ব্বতের প্রত্যেক গুহা যেন মুখরিত হইয়া উঠিল, বায়ু সে প্রতিধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে বহন করিয়া লইয়া চলিল। দেবতারা তারকের রাজধানী আক্রমণ করিবার জন্য "মার মার" শব্দে দ্রুতবেগে সুমেরু পর্ব্বত হইতে নীচে নামিতে লাগিলেন। পর্ব্বতের নীচে উপত্যকায় আসিয়া কার্ত্তিক সকলকে স্থির হইতে আদেশ দিলেন, তারপর তিনি আপনার মনোমত সৈন্যসমাবেশ করিয়া লইয়া অসুরদের আক্রমণ প্রতীক্ষায় রহিলেন।

দেবতাদের এ রণোদ্যমের কথা লোকপরম্পরায় পূর্ব্বেই দৈত্যপুরে পৌঁছিয়াছিল। অসুরেরা যখন শুনিল যোগীশ্রেষ্ঠ মহাদেবের পুত্র কার্ত্তিক দেবতাদের সেনাপতি হইয়া এবার তাহাদেরই দেশ আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, তাহারা যে শুধুই চিন্তিত হইয়া পড়িল, তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বেশ ভয় পাইল। দেবতাদের উৎসাহের সীমা

নাই, অথচ তাহাদের রাজা যে এখনও কি করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন, ইহাই হইল তাহাদের আলোচনার বিষয়। তখন অসুরেরা পরামর্শ করিয়া তাহাদের রাজা তারকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেবতাদের রণসজ্জার কথা তাঁহাকে জানাইল। তাহাদের মুখে দেবতারা বিদ্রোহী হইয়াছে শুনিয়া তারক উপহাস করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাই ত, আমি ত মোটে স্বর্গ, মর্ত্ত্য আর পাতাল এই তিনটী লোক জয় করিয়াছি, আমার সাধ্য কি যে সে দুগ্ধপোষ্য শিশু কার্ত্তিককে যুদ্ধে হারাই! ভয়ের কথাই ত!" উপহাস করিয়াই তারক এই কথা বলিতেছিলেন, কিন্তু বলিতে বলিতেই তাঁহার ক্রোধ হইল, দেবতাদের স্পর্দ্ধা ত' কম নয়! এই ইন্দ্র তাঁহার নিকট কতবার পরাজিত হইয়াছে তার ঠিক নাই, এবার কার্ত্তিককে আনিয়াছে যুদ্ধ করিতে: ক্রোধে অধরোষ্ঠ কম্পিত করিয়া অসুর-রাজ তখনই সৈন্যগণকে সাজিতে আদেশ করিলেন। রাজার আদেশ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল না, যেখানে যত সৈনাধ্যক্ষ ছিল সকলেই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রাজপ্রাসাদের সুপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে আসিয়া রাজাজ্ঞার অপেক্ষা করিতে লাগিল। তারক আসিয়া সকলের অভিবাদন গ্রহণ করিয়া আপনি রথে উঠিয়া সকলকে তাঁহার সহিত সুমেরু পর্ব্বতের উপত্যকায় দেবতাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যাইতে আদেশ করিলেন। কার্ত্তিক যখন যুদ্ধে বাহির হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল, আর তারক যখন যুদ্ধে বাহির হইলেন, তখন তাঁহার মস্তকে আকাশ হইতে পড়িল রুধির ও অঙ্গার। সহসা বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইয়া তারকের জয়পতাকা ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল, শকুনি ও পেচকের দল অসুর সৈন্যদলের ঠিক উপরেই উড়িতে লাগিল, এইরূপ আরও অনেক কুলক্ষণ দেখা দিল। তারকও অবশ্য সে সকল দেখিলেন, কিন্তু মন তাঁহার তখন দর্পে ভরা ছিল, তিনি এ সকল কিছুই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তাঁহার পরামর্শদাতারাও দুই চারিজন একবার তাঁহাকে এত কুলক্ষণ দেখাইয়াও যুদ্ধযাত্রা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের কাহারও কথা শুনিলেন না; তখন আকাশ হইতে দৈববাণী হইল, "ওরে মূর্খ, মদগর্ব্বে তুই অন্ধ হইয়াছিস্, তোর কি এখনও

চৈতন্য হয় নাই, তুই দেবাদিদেব মহাদেবের পুত্র কার্ত্তিকের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইতেছিস্, হতভাগা, ক্ষান্ত হ', ক্ষান্ত হ'।"

দৈববাণী শুনিয়া নিরস্ত হওয়া দূরে থাকুক, তারকের ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। তিনি এমন এক হুঙ্কার ছাড়িলেন যে, সে হুঙ্কার শব্দে যেন ত্রিভুবন কাঁপিয়া উঠিল; তারপর যাহাতে সকলেই শুনিতে পায় এমন ভাবে চীৎকার করিয়া তারক বলিতে লাগিলেন, "ওরে মূর্খ, তোরা বুঝি আমার প্রতাপ ভুলিয়া গিয়াছিস্, তাই একটা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আনিয়া কুকুর শেয়ালের মত চেঁচামেচি করিতেছিস্। আগে তোদের মারি, তারপর এই শিবের ছেলেটাকে দেখিয়া লইব।" এই বলিয়া তারক আপনার সৈন্যদিগকে দেবসেনা আক্রমণ করিতে আদেশ দিয়া নিজে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে রথ ছুটাইয়া চলিলেন। অসুর-সৈন্য বিপুল উৎসাহে দেবসৈন্য আক্রমণ করিতে ছুটিল। সম্মুখে সাগরের ন্যায় অসীম অগণিত অসুরসৈন্য প্রচণ্ড বেগে আসিতেছে দেখিয়া দেবতাদের হৃৎকম্প উপস্থিত, তাঁহারা সভয়ে কার্ত্তিকের নিকট আসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। কি বীরত্বব্যঞ্জক সে মুখশ্রী! ভয়ের চিহ্ন তাহাতে লেশমাত্রও নাই। কার্ত্তিক আপনার সুদীর্ঘ বর্শা ঘুরাইয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, তাঁহার সে হুঙ্কারে দেবতাদের বুকে বল আসিল, তাঁহারা সকলে আবার যে-যাহার অস্ত্রশস্ত্র দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া কার্ত্তিকের আদেশে অসুর-সেনার দিকে ধাবিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই দেবাসুরে ভীষণ সংগ্রাম বাধিয়া গেল।

তখনকার দিনে যুদ্ধের অনেক নিয়ম ছিল, পদাতিক পদাতিকের সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত, রথী বিপক্ষদলের রথীর সহিত যুদ্ধ করিত। দেবাসুরের সংগ্রামেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। ক্রমে ক্রমে রণস্থল ভীষণ আকার ধারণ করিল, তখন আর এসব নিয়ম কেহই মানিতে চাহিল না; যে যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই বধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। যাহাদের গজসৈন্য পরিচালন করিবার ভার ছিল তাহারা বিপক্ষদলের পদাতিকসৈন্য মথিত করিয়া চলিল, পদাতিকেরাও সুবিধা বুঝিয়া রথীর রথে উঠিয়া তাহার প্রাণ বিনাশের

চেষ্টা করিল। ধনুর্দ্ধারী সৈন্যেরা যাহার উপর পারিল অগ্নিময় বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পূর্ব্বে য়ুরোপের যোদ্ধারা লোহার বর্ম্ম পরিয়া যুদ্ধ করিতেন, দেবতা ও অসুরসৈন্যেরা পরিতেন তূলার বর্ম্ম। তরবারির আঘাতে অনেকের সে তূলার বর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন হইয়া তাহা হইতে তূলা বাহির হইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রের উপর উড়িতে লাগিল, নীচে রক্তের স্রোত, কোথাও আহতের কাতরধ্বনি, রণোন্মত্ত সৈন্যের উন্মত্ত হুঙ্কার, রথচক্রের ভীষণ ঘর্ষণ শব্দ—সমস্ত মিলিয়া এমন এক বীভৎস ব্যাপারের সৃষ্টি হইল, যাহার বর্ণনা করা যায় না। দৃঢ়তা দুইপক্ষেরই সমান। দেবতারা কার্ত্তিককে সেনাপতি পাইয়া মরিয়া হইয়া লড়িতেছিলেন, তাঁহারা জানেন এযুদ্ধে যদি তাঁহাদের পরাজয় হয়, তাহা হইলে মাতৃভূমির উদ্ধারের আশা খুবই অল্প, অসুরেরাও জানে এ যুদ্ধে হারিলে ত্রিজগতের প্রভুত্ব তাহাদের লোপ পাইবে। সুবিস্তৃত অসুর-সাম্রাজ্যের চিহ্নমাত্রও থাকিবে না। তাহাদের অবস্থা তখন যে কি হইবে তাহা ভাবা যায় না। যুদ্ধেরও বিরাম নাই, কোথাও দুইজন পদাতিক হয় ত একই সঙ্গে উভয়ে উভয়ের উপর তরবারির আঘাত করিয়া মরিয়া স্বর্গে গেল—যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গে যায়, কিন্তু স্বর্গে গিয়াও কি নিস্তার আছে, সেখানে এক অপ্সরাকে লইয়া দুইজনে কাড়াকাড়ি, শেষে মারামারি, সেখানেও রক্তারক্তি।

যুদ্ধের অবস্থা সুবিধা নয় বুঝিতে পারিয়া তারক নিজে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন; তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া দেবতারাও সকলে মিলিয়া ইন্দ্রের কাছে আসিয়া তারকের আগমন ব্যর্থ করিয়া দিতে লাগিলেন। তারক তাঁহাদিগের সকলকেই পূর্ব্বে বহুবার যুদ্ধে হারাইয়া দিয়াছিলেন, কাহার যে কতদূর অস্ত্রশিক্ষা তাহা তাঁহার ভালরূপেই জানা ছিল, সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যেই চোখা চোখা বাণ মারিয়া তিনি দেবতাদিগকে এমন ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন যে, সকলে তারকের নিকট হইতে পলাইয়া কার্ত্তিকের শরণ লইয়া বাঁচিলেন। তারকও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদিগকে তাড়া করিয়া আসিতে আসিতে একেবারে কার্ত্তিকের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। কার্ত্তিককে দেখিয়া তারকের রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল, তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আরে, সাধু তপস্বীর পুত্র হইয়া

আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সাধ, স্পর্দ্ধা ত কম নয়, ভাল চাও ত পালায় নকর, কেন মিছে বলির পশুর মত আমার হাতে প্রাণ হারাইবে?” অসুরের কথায় কার্ত্তিক রাগে ফুলিতে লাগিলেন, তিনি বহু কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া কহিলেন, “দৈত্যপতি, তুমি দম্ভ করিয়া যা বলিলে তা কেবল তোমাকেই শোভা পায়—আমি তোমার বাহুবল পরীক্ষা করিতে আসিয়াছি, অস্ত্র গ্রহণ কর।” কার্ত্তিকের কথা শেষ হইতে না হইতেই তারক যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন, সমস্ত সংসার জয় করিয়া তাঁহার অত্যন্ত গর্ব্ব হইয়াছিল। তাই কার্ত্তিক যতই তাঁহার আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেন, ততই তাঁহার ক্রোধ বাড়িয়া যায়। তিনি তখন সহসা এক বায়ব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, তাহার প্রভাবে এমন ঝড় উঠিল যে দেবতাদের জয়পতাকা কোথায় উড়িয়া গেল, বৃহদাকার গজসৈন্য — তাহারাও স্থির থাকিতে পারিল না রথ-অশ্ব-পদাতিকসৈন্য কে যে কাহার ঘাড়ে পড়ে, তাহার ঠিক নাই, নিমিষের মধ্যেই দেবসৈন্যের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল, কার্ত্তিক তখন এমন এক মহাশক্তিশালী বাণ ছুঁড়িলেন যে, তৎক্ষণাৎ অমন প্রচণ্ড ঝটিকা একেবারে অন্তর্ধান, সকলে আবার সুস্থ হইল। অসুর তখন এক অগ্নিবাণ ছাড়িলেন, অগ্নিবাণ আকাশে উঠিয়া প্রথমে রাশি রাশি ধূম উদ্গীরণ করিল, তারপর সশব্দে ফাটিয়া গিয়া তরল অগ্নি দেবসৈন্যের উপর পড়িয়া এক বিরাট ধ্বংসলীলার সূত্রপাত করিল। কার্ত্তিকও যে নিশ্চেষ্ট ছিলেন তাহা নহে, তিনি যতদূর সম্ভব ক্ষিপ্রহস্তে বরুণ অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, আর অমনি মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িয়া সমস্ত আগুন নিভিয়া গেল। আপনার সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া তারক এক সুদীর্ঘ তরবারি হাতে লইয়া রথ হইতে নামিয়া কার্ত্তিককে কাটিয়া ফেলিবার জন্য দৌড়াইয়া আসিতে লাগিলেন, তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া কার্ত্তিক শরাসন ছাড়িয়া আপনার বর্শা হাতে লইয়া দৈত্যপতিকে আক্রমণ করিলেন। কার্ত্তিকের প্রচণ্ড আঘাত তারক নিবারণ করিতে পারিলেন না। এক বিকট আর্ত্তনাদে ত্রিজগৎ চমকাইয়া অসুর-রাজ ভূমিতে পড়িয়া গেলেন, তাঁহার সে সুবিশাল প্রাণহীন দেহ ক্ষুদ্র পর্ব্বতের মত পড়িয়া আছে দেখিয়া দেবতাদিগের

আর আনন্দের সীমা রহিল না, তাঁহারা জয়ধ্বনি করিতে করিতে কার্ত্তিকের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন ; স্বর্গরাজ্য আবার দেবতাদের হস্তে ফিরিয়া আসিল। অসুরের কবল হইতে স্বদেশের উদ্ধার সাধন করিয়া রণোন্মত্ত দেবসৈন্য তুমুল জয়ধ্বনি করিতে করিতে দিগন্ত কাঁপাইয়া অমরাবতীতে ফিরিয়া আসিল।

রঘুবংশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সে অনেক দিনের কথা, যখন বৈবস্বত মনুর বংশের দিলীপ নামে এক জন রাজা অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার আকৃতি যেমন সুন্দর—, স্বভাবটিও ছিল তেমনি মধুর। পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার মন গলিয়া যাইত। সূর্য্য যেমন পৃথিবীর জল লইয়া সেই জল আবার সহস্রগুণ বাড়াইয়া বৃষ্টিরূপে পৃথিবীকেই দান করেন, রাজা দিলীপও প্রজাদের নিকট হইতে কর লইয়া প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই সেই অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি ছিলেন প্রজাদের বাপ মা, তাহাদের পালন করা, বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া, বিনয় নম্রতা প্রভৃতি আচার ব্যবহার—এসব শেখান সমস্তই তিনি নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার সুশাসনের গুণে দেবতারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী, দুর্ভিক্ষ কিছুই ছিল না। প্রজাদের অভাব ছিল না, সুতরাং চুরি ডাকাতী এসব কথা লোকে পুস্তকের গল্পেই যা পড়িত, কার্য্যত দেখিতে পাইত না।

এত সুখের মধ্যে থাকিয়াও রাজা দিলীপ কিন্তু সুখী ছিলেন না। তাঁহার প্রধান অভাব ছিল ছেলে। অপুত্রক রাজা সর্ব্বদাই দুঃখ করিতেন, যে তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ভুবনবিখ্যাত সূর্য্যবংশ লোপ পাইবে, তাঁহাকে ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণকে বৎসরান্তে একবার জল দিবারও কেহই থাকিবে না। রাজার অনেকগুলি মহিষী ছিল বটে, কিন্তু তিনি পাটরাণী সুদক্ষিণাকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, দুঃখ করিয়া কি লাভ, বরং একবার কুলগুরু বশিষ্ঠের উপদেশ লওয়া যাক, যাগযজ্ঞ করিয়া অনেকেরই সন্তান হইয়াছে, ইহা ত জানা কথা। সমাজে তখন ব্রাহ্মণের যথেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা ছিল, অত বড় রাজা ইচ্ছা করিলেই গুরু পুরোহিতকে আপনার নিকট ডাকাইয়া আনিতে পারিতেন, কিন্তু রাজা তাহা করিলেন না, পাছে গুরুর

সাধনার ব্যাঘাত ঘটে। তিনি সুদক্ষিণাকে লইয়া রথে উঠিয়া বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

সহরের বাহিরে কি শোভা। কোথাও ময়ূর ময়ূরী নাচিতেছে, কোথাও বা নিরীহ হরিণহরিণী তাঁহাদের রথের দিকে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া আছে, মধ্যে মধ্যে সুবৃহৎ সরোবর সারসসারসীর মধুর কাকলীতে যেন মুখরিত। বনপুষ্পের সুমিষ্টগন্ধে, উন্মুক্ত প্রান্তরের নির্ম্মল বাতাসে, বনদেবীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে তাঁহারা মোহিত হইলেন। গ্রামের লোকেরা রাজা আসিতেছে খবর পাইয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া রাজারাণীকে দেখিতে লাগিলেন; বৃদ্ধ গয়লারা সদ্যপ্রস্তুত ঘৃত আনিয়া রাজাকে উপহার দিলেন, রাজাও তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যার সময় তাঁহারা বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানে তখন মুনিঋষিরা সমিৎ, কুশ ও ফল আহরণ করিয়া যে-যাহার কুটীরে ফিরিতেছিলেন। কি সুন্দর তাঁহাদের দেহ, শরীর হইতে যেন তেজঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আশ্রমের হরিণ-শিশুরা সন্ধ্যা হইয়াছে জানিয়া বন হইতে আশ্রমের অঙ্গনে ফিরিয়া আসিতেছিল। মুনিকন্যারা তখনও আশ্রমের বৃক্ষে জল দেওয়া শেষ করিতে পারেন নাই,—তাঁহারা একএকটী বৃক্ষের তলে জল দেন, আর সরিয়া আসেন, অমনি বনের পাখীরা আসিয়া সেই জল পান করে। এমনই সময়ে রাজা দিলীপ আশ্রমের অনতিদূরে রথ রাখিয়া আপনি নামিলেন ও রাণীকে হাত ধরিয়া নামাইলেন। রাজা-রাণীকে আসিতে দেখিয়া আশ্রমের মুনিঋষিরা তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বশিষ্ঠদেবের নিকট লইয়া গেলেন। রাজা দেখিলেন মহামুনি বশিষ্ঠ তখন সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া পত্নী অরুন্ধতীর সহিত বসিয়া আছেন। তিনি রাণীকে লইয়া তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিলেন। পৃথিবীর রাজা আজ তাঁর অতিথি এই মনে করিয়া বশিষ্ঠদেব ও তাঁহার পত্নী অরুন্ধতী অতিথির যথাযোগ্য সৎকার করিয়া বসাইলেন, আর তাঁহার নিজের ও প্রজাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বলিলেন, "মুনিবর, আপনি যাহার নিয়তই মঙ্গলকামনা করিতেছেন, তাহার কুশল ত হইবেই। আপনার আশীর্ব্বাদে আমার প্রজারা বেশ সুখে আছে,

তাহাদের অভাব নাই, দস্যুভয় নাই, দৈবদুর্ব্বিপাকও আজ পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই; কিন্তু প্রভু, হৃদয়ে আমার শান্তি নাই, আপনার এই পুত্রবধূ এ পর্য্যন্ত আমায় পুত্ররত্ন উপহার দেন নাই। বংশলোপ হইবার ভয়ে মন আমার সদাই শঙ্কিত। পূর্ব্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ করিবার সময় আমার কেবলই মনে হয় যেন আমার পিতৃপুরুষগণ আমার নিকট হইতে পিণ্ড গ্রহণ করিবার সময় এই শেষ পিণ্ড ভাবিয়া নিঃশ্বাস ফেলেন। সে দীর্ঘশ্বাস যেন আমি মানস চক্ষে দেখিতে পাই। আপনিই এর বিধান করুন, ইক্ষ্বাকুবংশের ইষ্টানিষ্টের সমস্ত ভার ত, আপনার উপরই।"

বশিষ্ঠমুনি রাজার সব কথা শুনিয়া ধ্যানে বসিলেন। তখনকার সে শান্ত, ধ্যানমূর্ত্তি দেখিলে কার না মনে ভক্তির সঞ্চার হয়! মহর্ষি যোগবলে দিলীপের নিঃসন্তান হইবার কারণ জানিতে পারিয়া রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ! একবার দেবরাজ ইন্দ্রের নিমন্ত্রণে আপনি স্বর্গে গিয়াছিলেন, আসিবার সময়ে পথে কামধেনু সুরভি দাঁড়াইয়াছিলেন, আপনি তখন অত্যন্ত অন্যমনস্ক ছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াও দেখেন নাই, তাই গোমাতা নিজেকে অপমানিতা মনে করিয়া আপনাকে শাপ দেন, 'অপুত্রক হও'। সেইজন্যই আজ পর্য্যন্ত আপনি পুত্রমুখ দেখিতে পান নাই। তবে যদি আপনি সুরভিকে সেবায় সন্তুষ্ট করিতে পারেন, নিশ্চয়ই আপনার পুত্র হইবে। কিন্তু একটা কথা, সুরভি ত এখন এখানে নাই। তিনি পাতালে বরুণরাজের যজ্ঞে দুধ যোগাইতে গিয়াছেন, তাঁহাকে ত পাওয়া যাইবে না। যাই হ'ক আপনি সস্ত্রীক তাঁর কন্যা নন্দিনীরই সেবা করুন, তিনিও কামধেনু, আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ করিবেন।"

বশিষ্ঠদেবের কথা শেষ হইতে না হইতেই নন্দিনী সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মনে হইল যেন মূর্ত্তিমতী সিদ্ধি স্বয়ং রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিলেন। মহর্ষি বলিলেন, "মহারাজ, নন্দিনীর নাম করিতেই নন্দিনী উপস্থিত! এ অতি শুভলক্ষণ, আপনারা অচিরে এঁর সেবা আরম্ভ করিয়া দিন। আশীর্ব্বাদ করি যেন শীঘ্রই পুত্রমুখ দেখিয়া সুখী হ'ন।"

রাজা দিলীপ সন্তুষ্টচিত্তে গুরুর আদেশ গ্রহণ করিয়া রাণী সুদক্ষিণাকে লইয়া আশ্রমেই রহিয়া গেলেন। বশিষ্ঠ মুনি ইচ্ছা করিলেই রাজার

উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিলেন না, মুনি ঋষিদের ন্যায় রাজাকেও ফলমূল খাইতে দিলেন। তাঁহাদের শয়নের স্থান হইল, ব্রহ্মচারীদের ন্যায় পর্ণকুটীরে ভূমির উপর কুশের শয্যায়। পুত্রমুখ দেখিবার আশায় রাজা সমস্ত ক্লেশ সহ্য করিয়া রহিলেন।

গো-সেবাই তখন রাজার কাজ হইল। অতিপ্রত্যুষে মহামুনির শিষ্যরা যখন সুর করিয়া বেদমন্ত্র পাঠ করিতেন, সেই সুমধুর সঙ্গীতে রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হইত। তারপর সুদক্ষিণা ভক্তিভরে পুষ্পচন্দন দিয়া পূজা করিয়া নন্দিনীকে ছাড়িয়া দিতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে রাজা দিলীপ যাইতেন। যেখানে ভাল ঘাস দেখিতেন, স্বহস্তে সেই ঘাস নন্দিনীকে খাইতে দিতেন, নন্দিনী বসিলে তবে রাজা বসিতেন, চলিলে রাজাও চলিতেন। গরুর গায়ে মশা কি মাছি বসিবার জো ছিল না, বসিলেই অমনি রাজা তাড়াইয়া দিতেন, গায়ে হাত বুলাইতেন।

রাজা আজ রাখাল, তথাপি রাজচিহ্ন যেন তাঁহার সকল অঙ্গে প্রকাশ পাইতেছে ; রাজার রাজবেশ নাই, তবু মনে হয়, ইনি রাজা। বৃক্ষের উপর পাখী গান গায় মনে হয় যেন স্তুতিপাঠকেরা রাজার যশোগান গাহিতেছে ; বনের ফুল বাতাসের সঙ্গে উড়িয়া আসিয়া রাজার দেহের উপর পড়ে, বোধ হয় যেন, খৈবৃষ্টি করিয়া পুরকন্যারা রাজাকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। রাজার মহিমায় বনের পশুরাও যেন হিংসা ভুলিল, 'মরা মালঞ্চে ফুল ফুটিল'! সন্ধ্যার সময় গোচারণ শেষ করিয়া রাজা গৃহে ফিরিতেন, রাণী সুদক্ষিণা রাজার প্রতীক্ষায় বনের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া পথপানে চাহিয়া থাকিতেন, আর যেই দেখিতেন রাজা আসিতেছেন অমনি হাস্যমুখে রাজা ও নন্দিনীকে গৃহে লইয়া আসিতেন।

এইরূপে দিন যায়, তারপর একদিন, নন্দিনী প্রতিদিনের ন্যায় হিমালয়ের উপত্যকায় বিচরণ করিতেছিলেন, আর রাজা একমনে হিমালয়ের মুক্ত সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা গাভীর কাতরধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি পিছনে চাহিয়া দেখেন, সর্ব্বনাশ! প্রকাণ্ড একটা সিংহ নন্দিনীর উপর বসিয়া রহিয়াছে। রাজা তৎক্ষণাৎ বাম হস্তে

ধনুক উঠাইয়া তীর লইবার জন্য দক্ষিণ হস্ত তূণীরে প্রবেশ করাইলেন, গ্রহের ফের— হাত তাঁহার বাহির হইল না, তূণীরেই আটকাইয়া রহিল। রাজা প্রমাদ গণিলেন, এরূপ বিপদ ত' তাঁহার কখনও হয় নাই, রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল, মন্ত্রের প্রভাবে রুদ্ধ-বীর্য্য সর্পের ন্যায় তিনি কেবল গজরাইতেই লাগিলেন, কিছু করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। রাজার অবস্থা দেখিয়া সিংহ মানুষের ভাষায় বলিতে লাগিল, "মহারাজ! বৃথা চেষ্টা, হাত আপনার খুলিবে না। আমি দেবাদিদেব মহাদেবের সিংহ, আমার নাম কুম্ভোদর; আপনার সম্মুখে যে দেবদারু বৃক্ষ দেখিতেছেন, এটী পার্ব্বতীর অতি প্রিয়; তিনি তাঁহার প্রিয়পুত্র কার্ত্তিককে যেরূপ যত্ন করিয়া স্তনদুগ্ধ পান করাইতেন, ঠিক সেইরূপ যত্নেই প্রত্যহ এই বৃক্ষতলে স্বহস্তে জল সেচন করিয়া থাকেন। একবার একটা বন্য হস্তী, এই বৃক্ষের অনেক ক্ষতি করিয়াছিল, সেই হইতে পার্ব্বতীর আদেশে আমি এর রক্ষক হইয়াছি। প্রভুর কৃপায় প্রতিদিনই অন্ততঃ একটী জন্তু আমার আহারের জন্য আসিয়া থাকে, আজ এমন হৃষ্টপুষ্ট গাভীটী পাইয়াছি, ক্ষুধাও যথেষ্ট হইয়াছে, ভোজটা মন্দ হইবে না; আপনি এখন আশ্রমে ফিরিয়া যান, শক্তিতে না কুলাইলে আপনার আর দোষ কি?"

রাজা যখন শুনিলেন মহাদেবের সিংহ, দেবতার প্রভাবে তিনি আজ শক্তিহীন, তখন আপনার প্রতি ধিক্কারের ভাব তাঁহার কাটিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "পশুরাজ, গাভী আপনার করায়ত্ত, আমারও উদ্ধার করিবার শক্তি নাই, তথাপি আমার অনুরোধ দরিদ্র ব্রাহ্মণের গাভীটী ছাড়িয়া দিন, ইহার পরিবর্ত্তে আমার দেহ ভক্ষণ করুন, আপনার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে।"

নররাজের কথা শুনিয়া পশুরাজ উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার কথা শুনিয়া হাসি পায়, জগতের আপনি একচ্ছত্র সম্রাট, এমন নবীন বয়স, রূপেরও আপনার তুলনা নাই, সামান্য একটা গাভীর জন্য সমস্ত হারাইতে চান, আপনার বিচারবুদ্ধির ত প্রশংসা করা যায় না। এ আপনার পুরোহিতের গরু, এইত আপনার ভাবনা? তা

আপনি ত অনায়াসে এরকম কোটী কোটী গরু ব্রাহ্মণকে দিতে পারেন।"

রাজা বলিলেন, "তা অবশ্য পারি। কিন্তু আমরা ক্ষত্রিয়, বিপদ হইতে সকলকে রক্ষা করাই আমাদের ধর্ম্ম, আজ যদি আমি কুলগুরুর গাভীটী সামান্য একটা সিংহের কবল হইতে উদ্ধার করিতে না পারি, তবে আর লোকসমাজে কি করিয়া মুখ দেখাইব। আপনিই বলুন, আপনিও ত পরের দাস, আপনি যদি এই বৃক্ষটীকে রক্ষা করিতে না পারেন, অথচ শরীরও আপনার ক্ষতবিক্ষত হয় নাই,এরূপ অবস্থায় প্রভুর সম্মুখে আপনি দাঁড়াইতে পারেন? তার অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে ভাল নয় কি? আর দ্বিধা করিবেন না, আমার দেহ ভক্ষণ করুন আর গরুটী ছাড়িয়া দিন।" এই বলিয়া রাজা সিংহের নিকট লুটাইয়া পড়িলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাঁহার উপর ত' কৈ সিংহ পড়িল না, বরং স্বর্গ হইতে বিদ্যাধরীরা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। রাজা শুনিলেন, কে যেন মধুর স্বরে তাঁহাকে বলিতেছেন, "বৎস! উঠ, উঠ, চাহিয়া দেখ, আমি কে।" রাজা উঠিয়া দেখেন, কোথায় বা সিংহ, কোথায় বা নন্দিনীর কাতর আঁখি। নন্দিনী প্রফুল্লনয়নে রাজার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহারাজ! এতক্ষণ যাহা দেখিলেন, সবই আমার মায়া, আপনাকে কেবল পরীক্ষা করিতেছিলাম। আপনার গুরুভক্তি ও আমার উপর মমতা দেখিয়া আমি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি, আপনি আমার নিকট হইতে বর যাচ্ঞা করুন, আমি আপনার অভিলাষ পূরণ করি।" রাজা দিলীপ তখন করজোড়ে বলিলেন, "মা, সন্তানের প্রতি যদি তোর এতই করুণা, তবে এই বর দে যেন, সুদক্ষিণার গর্ভে এমন একটী আমার পুত্র হয়, যার নামে আমার বংশের পরিচয় হয়, আর কীর্ত্তি যেন তার অনন্তকাল ধরিয়া সংসারে স্থায়ী হয়।"

রাজা যে এই প্রার্থনাই করিবেন, কামধেনু তা' পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, তিনি প্রসন্নমুখে বলিলেন, 'তথাস্তু'।

সেদিন আশ্রমে ফিরিবার সময় রাজার প্রফুল্লমুখ দেখিয়া মহামুনি বশিষ্ঠ বুঝিতে পারিলেন, রাজার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে, তবু রাজা যখন

তাঁহাকে আনন্দের আতিশয্যে আপনার সৌভাগ্যের কথা বলিতেছিলেন, মুনিবর ধীরভাবে সমস্তই শুনিলেন। পরদিবস প্রাতে রাজাকে আর গোচারণে যাইতে হইল না, সেদিন তাঁহার গো-সেবা ব্রতের পারণ, আশ্রমেই রীতিমত সাধুসজ্জনের সেবার আয়োজন হইল। তারপর গুরু, গুরুপত্নী ও নন্দিনীকে পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া রাজা ও রাণী আপনাদের রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজা ও রাণীকে ফিরিতে দেখিয়া প্রজারা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। কয়েক মাস পরে আবার যখন তাহারা জানিতে পারিল, মহারাণী পুত্র প্রসব করিবেন, তখন তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। মহারাজ দিলীপ শিশু-চিকিৎসা বিষয়ে সুনিপুণ একজন বিশ্বস্ত চিকিৎসককে তখন হইতে মহারাণীর তত্ত্বাবধান করিবার আদেশ দিলেন। ক্রমে এক শুভ মুহূর্ত্তে রাণী সুদক্ষিণা একটী সুন্দর ও সুলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রসব করিলেন। শিশুর দেহের জ্যোতিঃতে সূতিকাগৃহ যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রাজা যখন শুনিলেন তাঁহার পুত্র হইয়াছে, তিনি আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন, যে যাহা চাহিল, তিনি তাহাকে তাহাই দান করিলেন। রাজ্যময় আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল, সে সময়ে লোকে যে সব তামাসা ভালবাসিতেন, দিলীপ সে সমস্তেরই ব্যবস্থা করিলেন, তবে তাঁহার পূর্ব্বে এরূপ উৎসবে, কয়েদীরা খালাস পাইত, দিলীপের সুখের রাজত্বে কাহাকেও ত আর কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই, কাজেই তাঁহার এক দুঃখ রহিয়া গেল যে, তিনি কোনও কয়েদীর দণ্ড মাপ করিতে পাইলেন না।

রাজা পুত্রের নাম রাখিলেন রঘু, রঘু ক্রমে বড় হইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার ধাত্রীর হাত ধরিয়া চলেন, তাহার অনুকরণ করিয়া কথা বলিতে শিখেন, তাহার ন্যায় পিতাকে প্রণাম করেন, রাজা ও রাণী এসব দেখিয়া সুখে আত্মহারা হ'ন। পঞ্চম বৎসর বয়সে রঘুর বিদ্যারম্ভ হইল। কি আশ্চর্য্য তাঁহার মেধা! কি তীক্ষ্ণ তাঁহার বুদ্ধি! একবার যাহা শুনেন, তাহা আর ভুলেন না। লেখাপড়া সাঙ্গ করিয়া পিতার নিকট রঘু যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি এক অদ্বিতীয় যোদ্ধা হইয়া উঠিলেন।

রাজা দিলীপ রঘুকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার যজ্ঞের অশ্ব যেখানে ইচ্ছা যাইতে থাকে, আর যে রাজা বা রাজপুত্র সে অশ্ব ধরেন, তাহার সহিত রক্ষক রঘুর যুদ্ধ বাধে। রঘুর সহিত যুদ্ধে জয়ী হয়, তখন এমন শক্তি কাহারও ছিল না,

সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে দিলীপের নিরানব্বইটী অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। তিনি অতঃপর শততম যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র দেখিলেন, 'মহাবিপদ, ত্রিজগতের মধ্যে একা তিনিই একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন, তাই তিনি আজ স্বর্গের রাজা ; এখন দিলীপ যদি একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করেন, তবে তাঁহার মান-মর্য্যাদা সবই নষ্ট হইবে। দেবসমাজে তাঁহার আর বিশেষত্ব রহিল কোথায় ? হয়ত একদিন দিলীপ স্বর্গে আসিয়া তাঁহার সিংহাসনেও দাবী করিয়া বসিবে—তখন ?' দেবরাজ আহার নিদ্রা ভুলিলেন। একদিন তিনি দেখিলেন দিলীপের অশ্ব বহুদূরে রহিয়াছে, রক্ষক রঘু তখনও সেখানে আসিয়া পৌঁছান নাই, সৈন্যসামন্তও একজনও নাই, সুযোগ বুঝিয়া ইন্দ্র তখন ঘোড়াটী লইয়া সরিয়া পড়িলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্বের খোঁজ পড়িল, চারিদিকে সন্ধান করিয়াও ঘোড়া যে কোথায় গেল, কেহই তাহা স্থির করিতে পারিল না। রঘু ত মহা বিব্রত, এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন অদূরে গোমাতা সুরভির কন্যা নন্দিনী দাঁড়াইয়া। তিনি শুনিয়াছিলেন, তাঁহার পিতামাতা কত সেবা ও যত্ন করিয়া নন্দিনীকে তুষ্ট করিয়াছিলেন, আর তাঁহারই বরে তাঁহার অপুত্রক পিতা তাঁহাকে লাভ করিয়াছেন। তিনি দেখিবামাত্রই নন্দিনীর যথেষ্ট সমাদর করিয়া আপনার বিপদের কথা বলিলেন। নন্দিনী কামধেনু, তাঁহার ক্ষমতাও অসীম, তাঁহার বরে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া রঘু দেখিলেন দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞের অশ্ব লইয়া পলাইতেছেন, আর যায় কোথা, অমনি রঘু সিংহবিক্রমে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন, আর দম্ভভরে বলিতে লাগিলেন, "দেবরাজ ! এই কি আপনার কাজ ? যজ্ঞের বিঘ্ন বিনাশ করেন বলিয়া আপনাকেই সর্ব্বপ্রথম যজ্ঞের আহুতি দেওয়া হয়, আর আজ আপনি পিতার যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ অশ্বকেই চুরি করিয়া লইয়া পলাইতেছেন।" রঘুর কথা শেষ হইতে না হইতেই ইন্দ্র মহা ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তিনি বলিলেন, "বালক, তোর গর্ব্ব ত কম নয়। কার সঙ্গে কিরূপে কথা বলিতে হয়, তা তোর জানা নাই ; তোর পিতা এখন আমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ত্রিভুবনে শতক্রতু বলিতে আমাকেই

বুঝাইত, তোর পিতা আমার সে সুনাম নষ্ট করিতে যাইতেছে, আমি তার প্রতিবিধান করিব না ?" এর পর আর কথা চলে না, রঘু আর বৃথা বাক্য-ব্যয় না করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন, উভয়ে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। রঘুর রণকৌশল দেখিয়া দেবরাজ অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন, "রঘুবর, তোমার আশ্চর্য্য রণনৈপুণ্য দেখিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমি দেবতাদের রাজা, তুমি যজ্ঞের অশ্ব ব্যতীত অন্য কোনও বর প্রার্থনা কর।" দেবরাজকে যুদ্ধে নিরস্ত হইতে দেখিয়া রঘুও ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিলেন, আর যুক্তকরে বলিলেন, "দেবরাজ, আপনি নেহাৎ যখন যজ্ঞের অশ্ব ছাড়িবেন না, দেখিতেছি অশ্বমেধ যজ্ঞ আর সম্পূর্ণ হইবার উপায় নাই, কিন্তু আপনি যখন সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তখন বর দিন, যেন অসম্পূর্ণ যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল পিতাঠাকুর মহাশয় প্রাপ্ত হয়েন।" ইন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া চলিয়া গেলেন, রঘুও দিলীপের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। দিলীপ যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু সেজন্য তাঁহার তেমন দুঃখ হইল না। দেবরাজের সহিত সংগ্রামে রঘুর বীরত্ব শুনিয়া ও তাঁহার বক্ষে বজ্র-প্রহারের চিহ্ন দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

এইরূপে বহুকাল রাজত্ব করিয়া বৃদ্ধ বয়সে মহারাজ দিলীপ কুলপ্রথামত তাঁহার উপযুক্ত পুত্র রঘুকে সিংহাসনে বসাইয়া আপনি মহারাণী সুদক্ষিণার সহিত বনে চলিয়া গেলেন। সেখানে মুনিঋষিদের ন্যায় ভগবচ্চিন্তায় শেষ জীবন যাপন করিলেন।

রঘু হইলেন রাজা। তাঁহার বয়স অল্প জানিয়া বিপক্ষ রাজারা তাঁহার সহিত শত্রুতাচরণ করিতে লাগিলেন, তাই সিংহাসন লাভ করিয়া রঘুর প্রধান লক্ষ্য হইল শত্রু দমন করা। দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় তিনি অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন,সেইজন্য আবার তাঁহার সমর-স্পৃহা জাগিয়া উঠিল ; তিনি একেবারে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া সমস্ত পৃথিবী জয় করিবার বাসনা করিলেন। তখনকার সময় রাজারা বর্ষার পর শরৎকালে যুদ্ধে বাহির হইতেন। রঘুও শরৎকালে দিগ্বিজয়ে বাহির হইবার জন্য রীতিমত সাজসজ্জা করিতে লাগিলেন। ক্রমে শরৎ আসিল, রঘুও প্রথমে আপনার রাজ্য সুরক্ষিত করিয়া, শুভদিন দেখিয়া অগ্নিতে বিধিপূর্ব্বক আহুতি প্রদান

করিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। পুরোহিতেরা রাজার মস্তকে পুষ্প-চন্দন দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, আর পুরস্ত্রীরা খৈ বৃষ্টি করিলেন।

রঘু দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন, রাজধানী অযোধ্যা হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই তিনি পূর্ব্বদিকে চলিলেন। পথে অনেক রাজার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল, কিন্তু তাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে বীরবর রঘুর কোনও বেগ পাইতে হইল না। তাঁহার প্রথম তুমুল যুদ্ধ বাধিল সুহ্মরাজের সহিত। এখন যে প্রদেশ আমাদের নিকট ত্রিপুরা, আরাকান বলিয়া প্রসিদ্ধ, তখনকার সময়ে সুহ্মদেশ বলিতে ওই সকল রাজ্যই বুঝাইত। সুহ্মদেশ জয় করিয়া রঘু বঙ্গদেশে প্রবেশ করিলেন। বাঙ্গালায় তখন বীর ছিল। বাঙ্গালী রাজারা রঘুর দিগ্বিজয়ে বাহির হইবার কথা শুনিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া গঙ্গা নদীর বক্ষে অগণিত নৌসেনা ও যুদ্ধ-তরণী লইয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। বীরকেশরী রঘু সিংহের ন্যায় বাঙ্গালী সৈন্য আক্রমণ করিলেন, প্রচণ্ডযুদ্ধে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াও বাঙ্গালী রাজারা রঘুর নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। রঘু তখন পর্য্যন্তও এরূপ ভীষণ ভাবে কোথাও বাধা পান নাই বলিয়া গঙ্গার মধ্যে ক্ষুদ্রদ্বীপে একটী সুবৃহৎ জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া আপনার বঙ্গজয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখিলেন, এবং পরাজিত শত্রুর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া হৃতরাজ্য সমর্পণ করিয়া উড়িষ্যার দিকে যাত্রা করিলেন। উড়িষ্যায় যাইতে হইলে কপিশা নদী পার হইতে হয়। মহাবীর রঘু গজ-সেতুর সাহায্যে কাপিশা নদী পার হইয়া উড়িষ্যা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু উড়িষ্যায় তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইল না। উৎকল দেশীয় রাজারা বিনাযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার ত করিলেনই, অধিকন্তু যাহাতে কলিঙ্গ অর্থাৎ মান্দ্রাজে যাইবার সুবিধা হয়, এরূপ পথও দেখাইয়া দিলেন। রঘু যত সহজে কলিঙ্গ জয় করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কলিঙ্গ দেশে যাইয়া দেখিলেন, কলিঙ্গ জয় তত সোজা নয়। কলিঙ্গরাজ তাঁহার বিপুল গজসৈন্য লইয়া রঘুকে আক্রমণ করিলেন, এবং মহেন্দ্র পর্ব্বত অর্থাৎ পূর্ব্বঘাটের পার্ব্বত্য অধিবাসীরাও সকলে একত্রিত হইয়া বিপুল বিক্রমে রঘুকে বাধা দিল। রঘুও ত এরূপ যুদ্ধই চাহেন, বহুদিন ধরিয়া তুমুল সংগ্রাম চলিল, অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী

কাম্বোজ
হূনদেশ
কাশ্মীর
রঘুর দিগ্বিজয়ের মানচিত্র
পারস্য সাম্রাজ্য
সিন্ধুনদ
কৈলাস
অযোধ্যা
কামরূপ
বঙ্গদেশ
মুরলা নদী
উৎকল
পূর্ব্ব সাগর
পশ্চিম সমুদ্র
কলিঙ্গদেশ
মহা সাগর
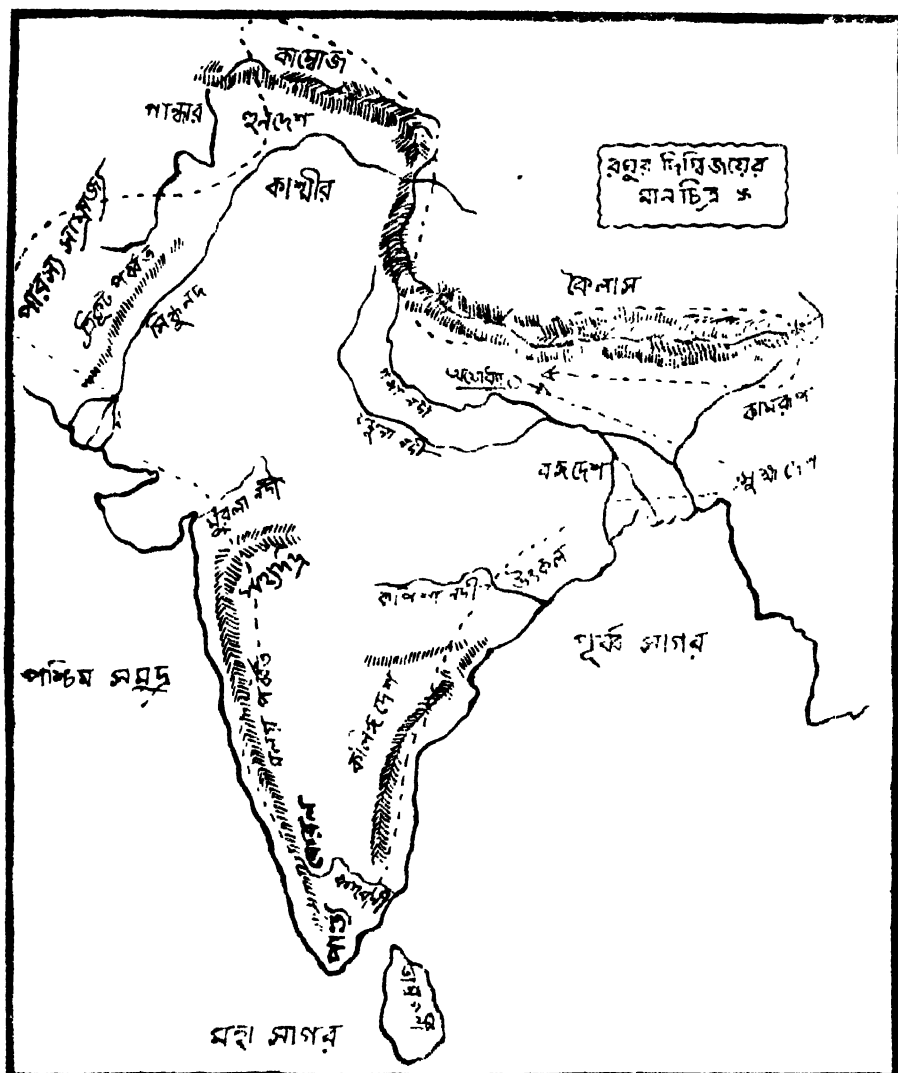
রঘুর প্রতি প্রসন্না হইলেন। মহেন্দ্র পর্ব্বতেও রঘু আপনার বিজয়বার্ত্তা জানাইবার জন্য জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন। তারপর সেখানকার সুস্বাদখ্যাত নারিকেলের মদ্য পান করিয়া মহা-উল্লাসে বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিয়া আরও দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। কাবেরী নদী অতিক্রম করিয়া মহাশূর পর্য্যন্ত কোনও দেশেই তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইল না, সেখানকার রাজারা তাঁহাকে রীতিমত আদর আপ্যায়ন করিয়া দক্ষিণ সমুদ্র হইতে আনীত অত্যুৎকৃষ্ট মুক্তাবলী তাঁহাকে উপহার দিলেন। রঘু তখন কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত পাণ্ড্যরাজ্য তুমুল যুদ্ধের পর জয় করিলেন। দক্ষিণদিকের আর কোনও রাজ্যই জয় করিবার রহিল না। রঘুও আপনার বিশালবাহিনী লইয়া পশ্চিমঘাট ধরিয়া ক্রমশঃ উত্তর মুখে চলিলেন। বাঙ্গালায় যেমন সুন্দর বন, তখন ঐ সকল স্থানে চন্দনবন ছিল, রঘু চন্দনবনের ভিতর দিয়া মলয় ও দর্দ্দুর পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন। তখন কেরল রাজের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ বাধিল, রঘুকে পরাজিত করে সাধ্য কাহার, তিনি সিংহের ন্যায় গর্ব্বভরে দেশের পর দেশ জয় করিয়া চলিলেন। এখন আমরা যে প্রদেশকে গুজরাট,কাথিয়াবাড় বলি, বীরবর রঘু সেই সমস্ত দেশ জয় করিয়া একেবারে পারস্য দেশে দিগ্বিজয়ে চলিলেন। পারস্যের সহিত ভারতবর্ষের তখন জল ও স্থল উভয় পথেই ব্যবসা বাণিজ্যের আদান প্রদান হইত, রঘু স্থলপথে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন। পারস্যরাজ তাঁহার বিখ্যাত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া রঘুর সহিত সংগ্রামে আসিলেন। সেই প্রচণ্ড যুদ্ধে মহাবীর রঘু তাঁহার সুদীর্ঘ বর্শা লইয়া এরূপ রণনৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন যে,সেরূপ বীরত্ব আমাদের দেশের অতি অল্প রাজাই দেখাইতে পারিয়াছেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর পারস্যরাজ পরাজয় স্বীকার করিলেন। রঘু আপনার বিজয়োন্মত্ত সৈন্য-সামন্ত লইয়া পারসিয়ার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের অত্যুৎকৃষ্ট মদ্যপান করিয়া রণক্লেশ অপনোদন করিলেন। পারস্য হইতে কাশ্মীর ও সেখান হইতে হূণ ও কাম্বোজীদের দেশ জয় করিয়া রঘু হিমালয়ের রণপ্রিয় পার্ব্বত্যজাতিদিগের প্রায় সকলকেই পরাজিত করিলেন, তাঁহার সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় গতি কেই-বা রোধ করিবে! হিমালয়ের অদূরেই কৈলাস অর্থাৎ চীন সাম্রাজ্য। রঘু

ইচ্ছা করিলেই চীনদেশও জয় করিতে পারিতেন, কিন্তু মাত্র কয়েকবৎসর পূর্ব্বে রাক্ষসরাজ রাবণ চীনদেশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া রঘু চীনের বীর্য্যকে উপহাস করিয়াই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অর্থাৎ বেহার রাজ্যে নামিয়া আসিলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বিনাযুদ্ধে জয় করিয়া রঘু পরিশেষে আপন রাজধানী অযোধ্যায় ফিরিলেন।

দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া কোথাও বা লুণ্ঠন করিয়া, কোথাও বা উপহার পাইয়া রঘু অতুলনীয় রত্নরাজি লাভ করিয়াছিলেন। একে ত তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের যে সকল রত্ন সঞ্চিত ছিল, তাহারই মূল্য নিরূপণ করা যায় না, তাহার উপর আবার তাঁহার আনীত ধনরত্ন। তিনি এই সমস্ত সম্পদ বিতরণ করিবার জন্য 'বিশ্বজিৎ' নামে এক যজ্ঞ করিলেন।

যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইবার পর মহারাজ রঘু আপনার সমস্ত ধনরত্ন ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে দান করিতে আরম্ভ করিলেন; শীঘ্রই তাঁহার এ অদ্ভুত দানের কথা দেশবিদেশে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তখন বহুদূর হইতে অসংখ্য অভাবগ্রস্ত লোক রঘুর দয়ায় আপন আপন অভাব পুরণ করিয়া লইতে লাগিল। এরূপভাবে দান করিলে রাজকোষে আর কতদিন অর্থ থাকে ? রাজকোষ ত শূন্য হইলই, রাজার বহুমূল্য বেশভূষা প্রভৃতিও আর রহিল না। কেবল রাজছত্র দিবার নহে বলিয়াই একমাত্র রাজছত্র অবশিষ্ট রহিল। এমন সময়ে মহামুনি বরতন্তুর কৌৎস্য নামক একজন শিষ্য রঘুর নিকট আসিলেন। পূর্ব্বে কোনও সদ্‌ব্রাহ্মণ রাজার নিকটে আসিলে,তাঁহাকে সুবর্ণপাত্রে পাদ্যঅর্ঘ্য দেওয়া হইত, এখন রাজার ভাণ্ডার শূন্য, স্বর্ণপাত্র আর কোথায় পাইবেন ; সেইজন্য ভৃত্যেরা মৃৎপাত্রে ব্রাহ্মণের পাদ্যঅর্ঘ্য আনিয়া দিলেন। দানের বহর দেখিয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে অত্যন্ত দমিয়া গেলেন ; তথাপি রীতি অনুসারে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন' রাজা বলিলেন "মুনিবর, আপনার চরণধূলি পাইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এখন অনুগ্রহ করিয়া আপনার শুভাগমনের কারণ বলুন।" মুনি আর বলিবেন কি ! মৃৎপাত্রে পাদ্যঅর্ঘ দেখিয়াই ত তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া গিয়াছে, তিনি বলিলেন, "মহারাজ ! আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি

যে, আমার আগমনের যথেষ্টই বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, আমি আসিয়াছিলাম গুরুদেবের প্রার্থিত ধন আপনার নিকট হইতে লইব বলিয়া; আপনি সুখে থাকুন, আমি অন্যত্র চলিলাম।" 'অন্যত্র' যাইবে রঘু ত এমন কথা কখনও শুনেন নাই, তিনি তখন সমস্ত কথা শুনিতে চাহিলেন। কৌৎস বলিলেন, "মহারাজ! আপনি বরতন্তু মুনির নাম নিশ্চয় শুনিয়াছেন, আমি তাঁহারই শিষ্য, আমার অধ্যয়ন যখন সমাপ্ত হয়, আমি গুরুদেবকে দক্ষিণা হিসাবে কিছু দিতে চাহিয়াছিলাম, গুরুদেব আমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন বলিয়া আমায় বলিলেন, 'তোমায় আর কিছুই দিতে হইবে না,' কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, তখন যে কেমন একটা ঝোঁক চাপিল, আমি ধরিয়া বসিলাম, কিছু লইতেই হইবে। গুরুদেব রুষ্ট হইয়া চতুর্দ্দশ কোটী সুবর্ণমুদ্রা চাহিয়া বসিয়াছেন, এখন করি কি! আমার বিশ্বাস ছিল, জগতের অধীশ্বর মহারাজ রঘুই এত ধন দিতে পারেন, কিন্তু আপনার মৃৎপাত্রে অর্ঘ্য দান দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি আমার অনেক পূর্ব্বে আসা উচিত ছিল।" রঘু তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, মহারাজ রঘু আপনার অভিলাষ পূরণ করিতে পারে নাই, একথা যেন কেহ না শুনে, আপনাকে কোথাও যাইতে হইবে না, আপনি আমার অগ্নিগৃহে দিন তিন চার অতিথি হইয়া থাকুন, আমি আপনার প্রার্থিত সুবর্ণমুদ্রা আনিয়া দিব!" এই বলিয়া রঘু কৈলাসপর্ব্বতে যাইয়া কুবেরকে জয় করিয়া সুবর্ণ আনিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, ও সৈন্যদিগকে প্রস্তুত হইবার জন্য আদেশ দিলেন, এমন সময়ে একদিন সকালবেলা কোষাধ্যক্ষ আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন যে, 'কাল সারারাত ধরিয়া রাজকোষে সুবর্ণ-মুদ্রার বৃষ্টি হইয়াছে, ভাণ্ডারে এমন স্থান নাই যে, সমস্ত সুবর্ণমুদ্রা রাখা যাইতে পারে।' রাজা বুঝিলেন যে, কুবের ভয় পাইয়া মুদ্রা পূর্ব্বেই পাঠাইয়া দিয়াছেন, তিনি তখন কৌৎসকে সমস্ত সুবর্ণ মুদ্রা লইয়া যাইতে বলিলেন; কিন্তু কৌৎস অত বেশী সুবর্ণ মুদ্রা লইতে নারাজ, তিনি বলিলেন, "আমি যাহা চাহিয়াছি, তাহাই লইব, বেশী লইতে যাইব কেন?" কিন্তু রাজা ছাড়িলেন না।

মুনির জন্য ধন আসিয়াছে, পরের ধন তিনি রাখিবেন কি করিয়া ? শেষে রাজা শত শত উষ্ট্র ও ঘোটকীর পৃষ্ঠে সমস্ত স্বুবর্ণমুদ্রা চাপাইয়া মুনির সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। মুনিবর আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রসন্নচিত্তে আশ্রমে চলিয়া গেলেন।
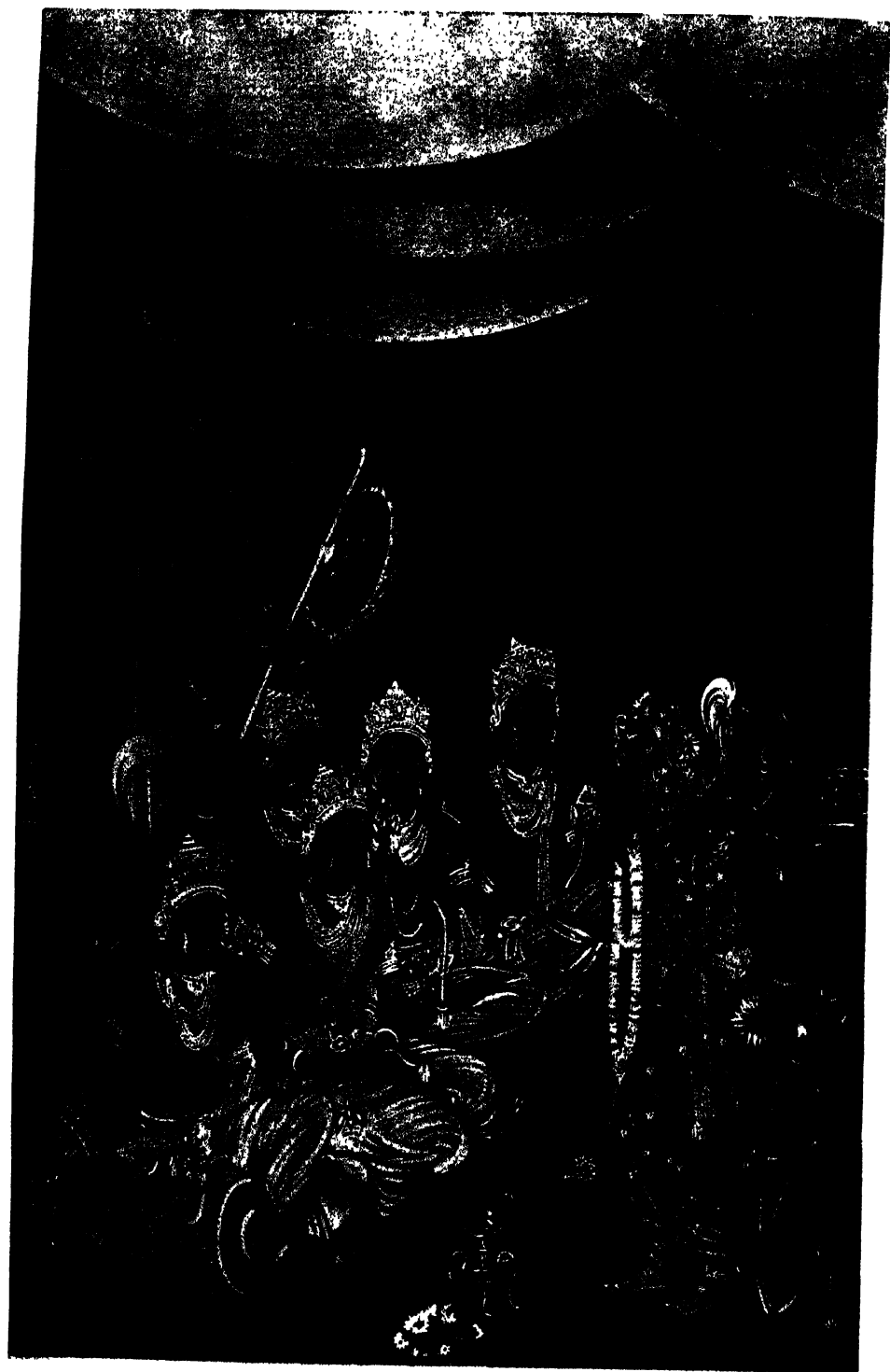
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহারাজ রঘুর এক পুত্র জন্মিল ; ঠিক ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে পুত্রের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মহারাজ তাঁহার নাম রাখিলেন, 'অজ'। অজ শব্দের অর্থে ব্রহ্মাকে বুঝায়। অজ যতই বড় হইতে লাগিলেন, পিতার সমস্ত সদ্‌গুণ তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইতে লাগিল। পিতার ন্যায় তীক্ষ্ণ মেধা, অসাধারণ শক্তি, অলৌকিক রণ-নৈপুণ্য দেখিয়া লোকে তাঁহাকে দ্বিতীয় রঘু বলিয়া মনে করিল।

তখনকার সময়ে ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে স্বয়ম্বর বিবাহ খুব প্রচলিত ছিল। রাজকুমার অজ যখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, সে সময়ে সংবাদ পাওয়া গেল, যে ভোজরাজের সুন্দরী ভগ্নী ইন্দুমতী স্বয়ম্বরা হইবেন। যথা সময়ে মহারাজ রঘুও স্বয়ম্বর সভায় পুত্রের যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ পাইলেন। পুত্রেরও বিবাহের বয়স হইয়াছে, এবং ভোজরাজের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধও মন্দ নয় ভাবিয়া মহারাজ রঘু সঙ্গে অনেক সৈন্য সামন্ত দিয়া পুত্রকে বিদর্ভনাথের রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন।

যুবরাজ অজ চলিয়াছেন, বনের পথ বেশ মনোরম। তিনি একদিন নর্ম্মদা নদীর তীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিয়াছেন, এমন সময় সহসা জলের ভিতর হইতে একটা প্রকাণ্ড হাতী বাহির হইয়া মহাবেগে তাঁহার তাম্বুর দিকে আসিতে লাগিল। হাতীর বৃহৎ শরীর আর আসিবার ভঙ্গী দেখিয়া অজের সৈন্যেরা ভয় পাইয়া যে যাহার প্রাণ লইয়া পলায়নের পথ দেখিল, তাহাদের মধ্যে আবার যাহারা প্রকৃত বীর তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। অজ সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিলেন, সম্মুখে মহা-বিপদ, কিন্তু কি করেন বন্য হস্তী বধ করা শাস্ত্রের নিষেধ, তিনি তখন তাহার কাণে এক বাণ মারিলেন, যেমন মারা অমনি হস্তীর অন্তর্ধান, তাহার স্থানে এক পরম সুন্দর গন্ধর্ব্ব। সকলেই অবাক্। গন্ধর্ব্ব তখন প্রণাম

করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রাজকুমার, আমি গন্ধর্ব্বরাজ প্রিয়-দর্শনের পুত্র প্রিয়ম্বদ। আমি আমার রূপের অত্যন্ত গর্ব্ব করিতাম বলিয়া মহর্ষি মতঙ্গের শাপে এই কদাকার হস্তীর আকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তিনিই আবার অনুগ্রহ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'যদি কখনও সূর্য্যবংশের মহারাজ-কুমার অজ তোকে শরাঘাত করেন, তবে তুই পুনরায় নিজের স্বাভাবিক আকৃতি ফিরিয়া পাইবি।' আজ আপনি আমার যে উপকার করিলেন, তাহার তুলনা হয় না, আমার এখন এমন কিছুই নাই যে আপনাকে উপহার দি, তবে আমি সম্মোহন নামক এক অস্ত্রের প্রয়োগ জানি, তাহা আপনাকে শিখাইব। আপনি এই অস্ত্রের বলে শত্রুকে প্রাণে না মারিয়া তাহার চেতনাশক্তি হরণ করিতে পারিবেন, সেও পরাজিত হইবে।" রাজকুমার অজ গন্ধর্ব্বকুমারের নিকট হইতে সম্মোহন অস্ত্র লাভ করিয়া বিদর্ভ দেশে উপস্থিত হইলেন।

রাজকুমার অজের আগমন সংবাদ পাইয়া স্বয়ং বিদর্ভনাথ আসিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর দেখাইয়া আপনার নবনির্ম্মিত প্রাসাদে লইয়া গেলেন।

পরদিবস প্রাতে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর। ভোজরাজের সুবিস্তৃত প্রাসাদের সুসজ্জিত কক্ষে স্বয়ম্বর সভা। বিদেশ হইতে যে সকল রাজপুত্র আসিয়াছিলেন, বৃহৎ মঞ্চের (অর্থাৎ গ্যালারীর) উপর তাঁহাদের বসিবার আসন। যুবরাজ অজ সভায় প্রবেশ করিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট সিংহাসনে গিয়া বসিলেন। কত দেশ হইতে কত রাজপুত্র আসিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই, তাঁহাদের রূপের আভায়, পোষাক ও অলঙ্কারের চাকচিক্যে সভার শোভার তুলনা নাই, মনে হয় যেন দেবরাজ ইন্দ্রের সভাও এত সুন্দর নয়।

সকলে যে যার আসন গ্রহণ করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমে স্তুতিপাঠকেরা চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় রাজাদের গুণ কীর্ত্তন করিয়া গীত গাহিল, তারপর শঙ্খের মঙ্গল-ধ্বনির সহিত রাজভগিনী ইন্দুমতী বধূ-বেশে শিবিকায় আরোহণ করিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। শিবিকা হইতে নামিয়া রাজকুমারী সহচরী সুনন্দা ও বৃদ্ধাধাত্রীর সহিত ধীরপদে

সোপানের উপর দিয়া মঞ্চে উঠিলেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে ও সম্মুখে রাজপুত্রের শ্রেণী, সকলেরই চক্ষু তাঁহার দিকে। তখন সখী সুনন্দা তাঁহাকে এক একটি রাজপুত্রের সম্মুখে গিয়া রাজপুত্রের বংশ-পরিচয়, তাঁহার ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকাহিনী বলে, আর তাঁহাকে বিবাহ করিলে রাজকুমারী যে চিরকাল সুখে থাকিবেন তাহাই বুঝাইয়া দেয়। প্রথমে মগধের যুবক রাজা পরন্তপ, তারপর লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র অঙ্গরাজ, তারপর অবন্তীরাজ, এইরূপে সুনন্দা রাজকুমারীকে অনেক রাজপুত্রেরই সম্মুখে লইয়া গিয়া তাঁহাদের অনেক গুণকীর্ত্তন করিলেন, রাজপুত্রেরা রূপে, গুণে বা বংশ-মর্য্যাদায় কোনও অংশেই নিকৃষ্ট নহেন, তবু ইন্দুমতীর কাহাকেও পছন্দ হইল না, 'লোকের রুচিই ভিন্ন।' তিনি এক একজনের নিকট যান, সুনন্দার নিকট হইতে সমস্ত শুনেন আর শেষে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া আসেন। রাত্রিতে যেমন প্রদীপ লইয়া পথ চলিলে, যে যে বস্তু সম্মুখে থাকে প্রদীপের আলোয় আলোকিত হইয়া উঠে, আবার সেখান হইতে আলোক চলিয়া গেলে পিছনের বস্তু অন্ধকারময় হইয়া যায়, সেইরূপ ইন্দুমতী যে রাজপুত্রের সম্মুখে যান আশার পুলকে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠে, আবার যখন তাঁহাকে পছন্দ হইল না বলিয়া রাজকুমারী আর একজনের কাছে চলিয়া যান, হতাশায় তাঁহার মুখ কালি হইয়া উঠে। ক্রমে তাঁহারা যুবরাজ অজের নিকট আসিলেন। ইন্দুমতীকে সম্মুখে দেখিয়া অজ, 'আমায় ইন্দুমতী বরণ করিবে কিনা' এই ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন. তাঁহার বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হইয়া উঠিল, তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন। যুবরাজ অজকে দেখিয়া ইন্দুমতীর চক্ষু নিষ্পলক, তাঁহার মনে হইতে লাগিল, সম্মুখে তিনি যাঁহাকে দেখিতেছেন তিনি যেন তাঁহার কত পরিচিত, যেন জন্মজন্মান্তর ধরিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধ ছিল; এদিকে তাঁহার সহচরী রঘু-তনয়ের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেবা শুনে, রাজকুমারীর সারা অঙ্গ তখন লজ্জায় অবশ, তাঁহার কামনার ধন সম্মুখে। সুনন্দা বলিতেছে, 'যুবরাজের কণ্ঠে বরমাল্য দাও,' তাঁহার অন্তরাত্মা, তাঁহার দেহ মন প্রাণ রাজকুমারকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিতেছে কিন্তু ঠিক সেই
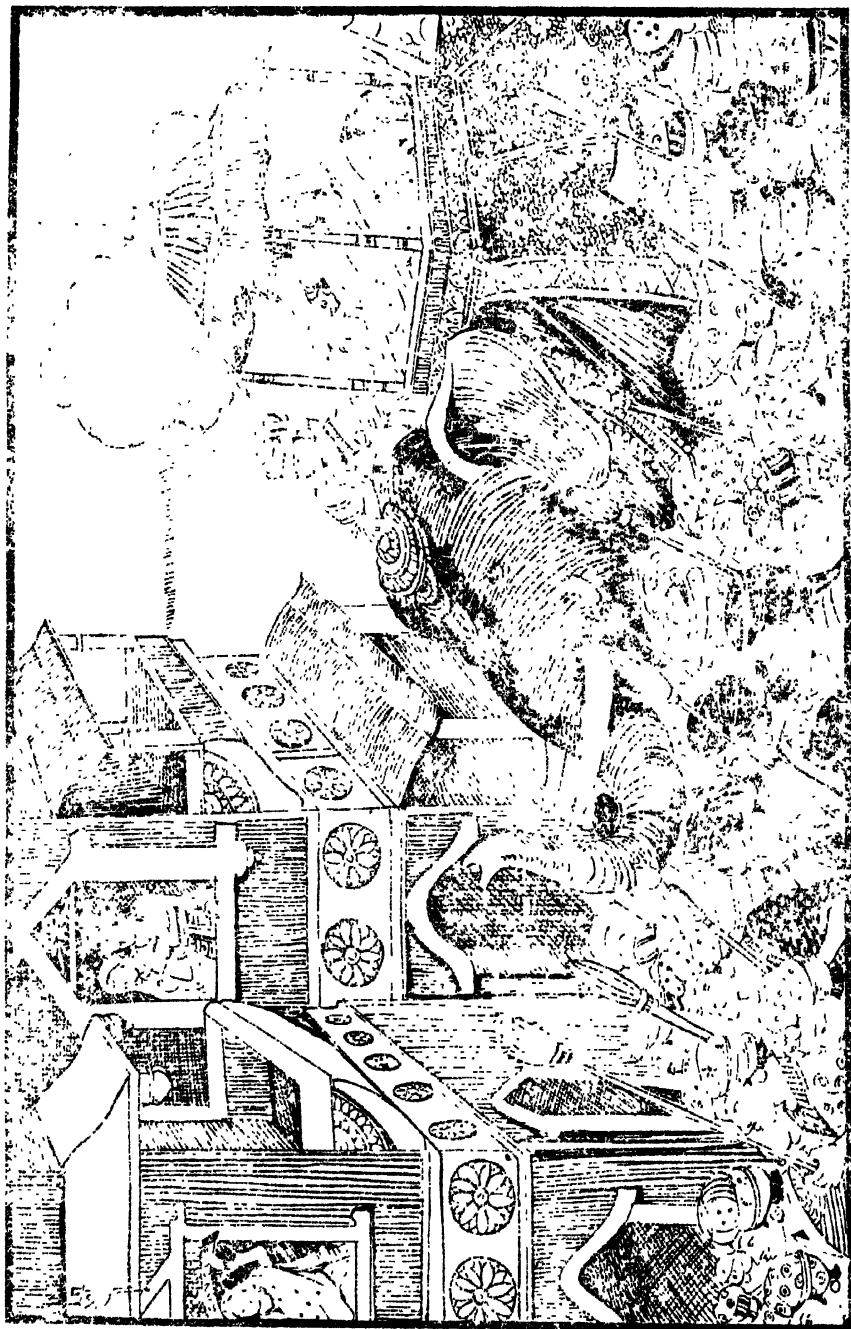
অজ-ইন্দুমতীর শোভাযাত্রা

সময় কি সংসারের যত লজ্জা একত্র হইয়া রাজকুমারীর দেহ অসাড় করিয়া ফেলিল, তাঁহার হাত তুলিবারও ক্ষমতা নাই। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সখী সুনন্দা সমস্তই বুঝিতে পারিল, তবু একটু পরিহাস করিবারও লোভ ছাড়িতে পরিল না, বলিল, "সখী, চল আমরা অন্যত্র যাই।" 'অন্যত্র' শুনিয়া ইন্দুমতীর গা জ্বলিয়া উঠিল, সুনন্দা কি তাঁহার মন বুঝে নাই, এসময়ও পরিহাস। তিনি ভ্রুকুটী করিয়া সুনন্দাকে শাসাইলেন। তাঁহার বৃদ্ধা ধাত্রী নিকটে ছিলেন, তিনি সমস্ত বুঝিয়া রাজকুমারীর হাত ধরিয়া যুবরাজ অজের গলায় বরমাল্য পরাইয়া দিলেন। রাজ-অনুচরেরা মঙ্গল-ধ্বনি করিয়া উঠিল।

তারপর এক সুসজ্জিত হস্তীর পৃষ্ঠে বসাইয়া ভোজরাজ যুবরাজ অজ ও ভগিনী ইন্দুমতীকে লইয়া ভবনে চলিলেন। বর আসিতেছে শুনিয়া পথের দুই পার্শ্বের বাড়ীর মেয়েরা সুবর্ণের চিক্ ফেলা বারান্দায় আসিয়া অজ ও ইন্দুমতীকে দেখিতে লাগিল। তাড়াতাড়িতে কাহার এক চোখে কাজল পরাই হইল না, কাহার পায়ের আল্তা ঘরময় ছড়াইয়া পড়িল, কাহারও বক্ষের বসন খসিয়া পড়িল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সকলেই অতৃপ্ত নয়নে বর দেখিতে লাগিলেন। ভোজরাজের ভবনে বিবাহ সভায় বরকণেকে লইয়া যাওয়া হইল। বর অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন, ইন্দুমতীও পুরোহিতের কথামত অগ্নিতে খৈ নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে বিবাহ সুসম্পন্ন হইলে পর বর ও বধূকে স্বর্ণের সিংহাসনে বসান হইল, তখন প্রথমে স্নাতক ব্রাহ্মণ, তারপর ভোজরাজ ও তাঁহার কুটুম্ব ও বন্ধুবর্গ, ও শেষে স্ত্রীলোকেরা ভিজা আতপ চাউল দিয়া বরকণেকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এদিকে যে সব রাজারা ইন্দুমতীকে বিবাহ করিবার আশায় বিদর্ভ দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহার মধ্যে অধিকাংশেরই অজের সৌভাগ্য দেখিয়া হিংসা হইল। তার মধ্যে আবার অনেকেই রঘুর দিগ্বিজয়ের সময়ে রঘুর নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, সে অপমান তাঁহারা তখনও ভুলিতে পারেন নাই। সুতরাং রঘুর পুত্রের উপর 'ঝাল' ঝাড়িবার এমন সুযোগ হারান মূর্খামি ভাবিয়া নগরের বাহিরে অযোধ্যার পথে অজের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

রাজকুমার অজ তাঁহার নবপরিণীতা রূপসী বধূ লইয়া নিজের দেশে যাত্রা করিলেন। পথে শত্রুপক্ষীয় রাজারা তাঁহার গতিরোধ করিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। সে যুদ্ধে কত যে রথ ভাঙ্গিল, কত সৈন্যের প্রাণ গেল, কত রাজপুত্রের অঙ্গহানি হইল বলা যায় না, শেষে অজ দেখিলেন, তাঁহার বিবাহের উৎসব এখনও শেষ হয় নাই, এমন আনন্দের দিনে এ সব কি ? তাঁহার তখন গন্ধর্ব্ব রাজপুত্রের দেওয়া সম্মোহন অস্ত্রের কথা মনে পড়িয়া গেল, তিনি অমনি মন্ত্রপূত করিয়া সেই বাণ ছাড়িলেন, আর যত মহামহা সব বীর ঘুমে অচেতন, কাহারও সাড়া নাই, কেইবা যুদ্ধ করে। অজ তখন ইন্দুমতীর নিকট গিয়া রাজাদের অবস্থা দেখাইয়া উপহাস করিয়া বলিলেন, "এই সব বীর তোমায় আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছিল, কেমন অবস্থা করিয়া ছাড়িয়াছি ? সামান্য একটা বালকও এখন ইহাদের যথা সর্ব্বস্ব লইয়া যাইতে পারে।" রাজকুমারী তাঁহার স্বামীর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার খুবই ইচ্ছা হইতেছিল যে তিনি নিজে কিছু বলিয়া প্রিয়তমের অভিনন্দন করেন, কিন্তু লজ্জায় তা পারিলেন না, সখীদের দ্বারা যুবরাজের প্রশংসা করাইলেন। তখন আর ভয়ের কোনও কারণ রহিল না, সকলের মুখে আবার হাসি ফুটিল, আবার সকলে অযোধ্যার দিকে চলিলেন। অযোধ্যায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মহারাজ রঘু পুত্রের বিবাহের সংবাদ পাইয়াছিলেন, তিনি সৈন্য সামন্ত সঙ্গে দিয়া মন্ত্রীকে যুবরাজের অভ্যর্থনা করিবার জন্য পাঠাইলেন, আর সারারাজ্যে পুত্রের বিবাহোৎসবের আয়োজন করিলেন। অযোধ্যায় মহাধূম। কায়েকমাস আমোদ প্রমোদে কি ভাবে যে কাটিয়া গেল, কেহই বুঝিতে পারিল না।

পুত্র বড় হইয়াছে দেখিয়া রঘু সূর্য্যবংশীয় রাজাদের কুলপ্রথা অনুকরণ করিয়া অজকে সিংহাসনে বসাইয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিতে মনস্থ করিলেন। শুভদিনে কুলগুরু বশিষ্ঠদেব অজের মস্তকে পবিত্র তীর্থজল দিয়া রাজসিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। যাহারা অল্প বয়সে রাজা হয়, তাহাদের অধিকাংশ প্রায়ই বিলাসী ও অত্যাচারী হইয়া উঠে, কিন্তু অজ হইলেন অন্যরূপ। সিংহাসন পাইয়া তাঁহার প্রধান ভাবনা হইল কিসে

প্রজার মঙ্গল হইবে। তাঁহার সুশাসনে প্রজারা মনে করিল যেন রঘুই আবার নবযৌবন পাইয়া তাহাদের উপর রাজত্ব করিতেছেন। অজের রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন দেখিয়া রঘু নিশ্চিন্ত হইলেন, তিনি বাণপ্রস্থের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, এবার সে সঙ্কল্প কাজে পরিণত করিতে চাহিলেন। পিতা বনে যাইবেন শুনিয়া অজ তাঁহার চরণে পতিত হইয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তাঁহার বড় ইচ্ছা পিতার নিকট থাকিয়া পিতার সেবা করেন। পুত্রবৎসল রঘু আর কি করেন, এমন অবস্থায় ত' আর পুত্রকে ছাড়িয়া যাওয়া যায় না। তিনি স্থির করিলেন যে বনে যাওয়া হইবে না বটে, তবে রাজধানীতেও আর থাকা হইবে না, সহরের বাহিরে এক নির্জ্জনস্থানে তিনি বাস করিবেন, অজেরও তাঁহার নিকটে যাইয়া সেবাশুশ্রূষা করিবার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইবে। ফলে তাহাই হইল, নগরের বাহিরে নির্জ্জন স্থানে মহারাজ রঘু ভিক্ষুকের বেশে পরমাত্মার চিন্তায় লীন হইলেন, আর অজ রাজসিংহাসনে বসিয়া সমগ্র পৃথিবী জয় করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর যোগাভ্যাসে কাটাইয়া রঘু দেহ রাখিলেন; পিতার দেহরক্ষার সংবাদ পাইয়া অজ আসিয়া রীতিমত সৎকার করিয়া তাঁহার দেহ ভূমিমধ্যে প্রোথিত করিলেন, কারণ, সমাধি-বলে-ত্যক্তপ্রাণ সন্ন্যাসীর দেহে অগ্নিসংস্কার করিতে নাই। সন্ন্যাসীদের শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করিতেও নাই, অজ কিন্তু এবার কাহারও মানা শুনিলেন না, তিনি গৃহীদের ন্যায় পিতার রীতিমত শ্রাদ্ধকর্ম্ম সমাপন করিলেন।

মহারাজ অজের এক পুত্র হইয়াছিল। পিতামাতা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন দশরথ। দশরথ তখনও সাবালক হ'ন নাই, এই সময়ে একদিন মহারাজ অজ ইন্দুমতীকে লইয়া নগরের বাহিরে তাঁহাদের উপবনে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। বাগানের একটী শিলার উপর দুজনে বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় মহর্ষি নারদ সেই উদ্যানের উপর মেঘের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন; তাঁহার বীণায় একগাছি স্বর্গের পারিজাত কুসুমের মালা ছিল, সহসা সেই মালা বাতাসে উড়িয়া মহারাণী ইন্দুমতীর বক্ষের উপর আসিয়া পড়িল, ইন্দুমতী সেই মালার পানে একবার চাহিয়াই ঢলিয়া

পড়িলেন, পাশেই ছিলেন অজ, তিনি 'হাঁ, হাঁ,' করিয়া উঠিলেন, ইন্দুমতীর শরীর উঠাইয়া দেখেন, তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! সামান্য একটা পুষ্পের মালা গায়ে পড়িলে যে প্রাণ বাহির হয়, ইহা ত তিনি কখনও শুনেন নাই, চোখে দেখিলেও যে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না। তিনি নিজের বুকের উপর মালাটী রাখিলেন, কৈ তাঁহার ত মৃত্যু হইল না। ইন্দুমতীকে তিনি প্রাণের চেয়েও ভালবাসিতেন, তাই তাঁহার শোকে পাগলের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। এই উদ্যানে তাঁহারা কতবার আসিয়াছেন, দুটীতে কত গল্প করিয়াছেন, কত আমোদ করিয়াছেন, একে একে সবই তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। যে ইন্দুমতীকে একমুহূর্ত্ত না দেখিলে তিনি থাকিতে পারিতেন না, সেই ইন্দুমতীকে এ জীবনে আর একটী বারের তরেও কখন দেখিতে পাইবেন না, এ কথা ভাবিতেও তাঁহার বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ইন্দুমতী ছাড়া যে তিনি আর কোন নারীকেই ভালবাসেন নাই; সেকালের বহুবিবাহ প্রথা থাকিলেও, ইন্দুমতীর মুখ চাহিয়া তিনি আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারেন নাই, আর সেই ইন্দুমতী তাঁহাকে চিরকালের জন্য ছাড়িয়া গেলেন। ইন্দুমতী যে তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কাজে তাঁহার সহায় ছিলেন, ইন্দুমতীই ছিলেন তাঁহার সংসারের সর্ব্বস্ব, তাঁহার গৃহিণী, তাঁহার মন্ত্রী, তাঁহার বন্ধু, তাঁহার সঙ্গিণী, গীতবাদ্যে তাঁহার প্রিয়শিষ্যা—আজ তাঁহার সেই ইন্দুমতী আর নাই, জগতে তাঁহার আর রহিল কি? তাঁহার ইচ্ছা হইল, ইন্দুমতীর চিতার আগুনে তাঁহার এ ব্যর্থ জীবন ত্যাগ করিবেন, কিন্তু আবার মনে করিলেন, এভাবে মরিলে জগতে তাঁহার অপযশ রহিয়া যাইবে, সকলে মনে করিবে রাজা বিদ্বান হইয়াও মহামূর্খের ন্যায় কাজ করিয়াছেন।

দশদিন পরে সেই উপবনেই ইন্দুমতীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া রাজা আবার অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু আর কোনও কার্য্যেই তাঁহার মন বসিল না, ইন্দুমতীর মধুর মুখখানি তাঁহার সকল কাজেই বাধা হইয়া রহিল। এদিকে কুলগুরু বশিষ্ঠ মহারাণীর অকালমৃত্যুর কারণ ধ্যান যোগে জানিতে পারিয়া মহারাজকে এক শিষ্য দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন

যে, তিনি সম্প্রতি এক যজ্ঞে ব্যাপৃত আছেন, সেইজন্য স্বয়ং আসিতে পারিলেন না, তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, 'তৃণবিন্দু নামে এক ঋষি ছিলেন, এক সময়ে সেই ঋষি কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহার তপস্যা দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হ'ন, এবং হরিণী নামক এক অপ্সরাকে ঋষির তপঃ ভঙ্গ করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। অপ্সরা নানাপ্রকারে ঋষির তপস্যার বিঘ্ন জন্মাইবার চেষ্টা করেন, মহর্ষি তাহার কার্য্যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ দেন, 'তুই পৃথিবীতে মানবী হইয়া থাক্,' ঋষির শাপে ভীতা হইয়া অপ্সরা হরিণী অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া মহর্ষিকে সন্তুষ্ট করিয়া এই আশীর্ব্বাদ পায় যে, যদি তাহার কখনও স্বর্গের কোনও পুষ্প দেখিবার সৌভাগ্য ঘটে তবেই তাহার এ শাপ বিমোচন হইবে। মহারাণী ইন্দুমতীই সেই অপ্সরা হরিণী, মহর্ষির শাপে ভোজরাজের গৃহে জন্মিয়াছিলেন, এখন স্বর্গের পুষ্পমাল্য দেখিয়া মনুষ্য-শরীর ত্যাগ করিয়া আবার স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। অতএব রাজা যেন আর অকারণ শোক না করেন।' মহর্ষির এ সান্ত্বনা-বাক্য অজের কর্ণে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু হৃদয়ে প্রবেশ করিল না। ইন্দুমতীকে ভুলিলে যে নিজেকেই ভুলিয়া যাইতে হয়। রাজার মনে সুখশান্তি রহিল না, শরীর ভাঙিয়া পড়িল, চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও রাজার শরীর সারাইতে পারিলেন না। ব্যাধিগ্রস্ত দেহমন লইয়া রাজা কয়েক বৎসর অতি কষ্টে কাটাইলেন, তারপর পুত্র দশরথকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া অনশন-ব্রত অবলম্বন করিলেন; রুগ্নদেহে এ ব্রত আর ক'দিন সয়? শীঘ্রই একদিন পুণ্যতোয়া গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমতীর্থে রোগজীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া মহারাজ অজ সকল জ্বালার সাঙ্গ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজসিংহাসনে বসিয়া রাজা দশরথের প্রধান লক্ষ্য হইল কিরূপে পূর্ব্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। তাঁহার বয়স অল্প হইলেও তিনি প্রথম যৌবনে মৃগয়ায়, জুয়াখেলায়, মদ্যপানে বা মেয়ে মানুষ লইয়া আমোদ প্রমোদে সময় কাটান নাই। দশরথের ন্যায় সংযমী ও সাধক রাজা পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রাজ্য সুরক্ষিত করিয়া তিনিও পিতামহ রঘুর ন্যায় দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। রঘু ও অজের প্রতাপে শক্রপক্ষের এমন প্রতাপশালী কেহই ছিল না যে, উত্তরকোশল-রাজের বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করে, সুতরাং দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া মহারাজ দশরথকে কোথাও বেগ পাইতে হয় নাই; তিনি অবলীলাক্রমে সমস্ত রাজ্য জয় করিয়া অনেক ধনরত্ন লইয়া আপন দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পিতা মাতা ছিল না, বৃদ্ধ অমাত্যরাই উদ্যোগী হইয়া কোশল, কেকয় ও মগধ রাজের পরমা সুন্দরী তিনটী রাজকুমারীর সহিত রাজা দশরথের বিবাহ দেওয়াইলেন। অতি সুখেই রাজার দিন কাটিতে লাগিল। এই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র অসুরের অত্যাচার হইতে স্বর্গরাজ্য নিরাপদ করিবার জন্য রাজা দশরথকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন, এরূপ নিমন্ত্রণ সূর্য্যবংশের প্রায় সকল রাজারাই পাইয়াছেন। দশরথ স্বর্গে যাইয়া যেখানে যত দানব ও অসুর ছিল, সকলকে এমন ভাবে জব্দ করিয়া ছাড়িলেন, যে দশরথের নাম অসুরদের নিকট মহাভয়ের কারণ হইয়া উঠিল। কিন্তু এত যুদ্ধ করিয়াও দশরথের সমর-সাধ মিটিল না, তিনি অযোধ্যায় আসিয়াই অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। একে ত তাঁহার মত বীর সে সময়ে কেহই ছিল না, তাহার উপর, স্বর্গে তাঁহার বীরত্বের কাহিনী সকলেই শুনিয়াছিল; এমন বীরের অশ্বমেধের অশ্ব ধরিয়া রাখা আর মৃত্যুকে যাচিয়া বরণ করা একই কথা, সুতরাং কেই-বা তাঁহার অশ্ব ধরে। দশরথ বিনা বাধায় অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিলেন। কিন্তু যিনি প্রকৃত বীর কতকাল আর তিনি ঘরে

বসিয়া থাকিতে পারেন, বসন্তকাল আসিতে না আসিতেই, তিনি আবার মৃগয়ায় বাহির হইলেন—যুদ্ধ করিবার ত' আর উপায় নাই, তাঁহার সহিত কে যুদ্ধ করিবে। নিবিড় বনে রাজা চলিয়াছেন মৃগয়ায়, সম্মুখে দেখিলেন এক মৃগ, আর যাইবে কোথায়, রাজা অমনি ধনুকে তীর যুড়িলেন, মারিবেন এমন সময়ে দেখিলেন, হরিণী আসিয়া হরিণের দেহ আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়াইল; বন্যজন্তুর মধ্যে এমন গভীর প্রেম দেখিয়া কি তীর মারা যায়! রাজা বিরত হইলেন, হরিণেরা পলাইয়া গেল। আর এক জায়গায় দেখিলেন এক মৃগ, রাজা এবার ভাবিলেন আর ছাড়া হইবে না, মারিতেই হইবে, কিন্তু কি বিপদ! হরিণটা এমন করুণভাবে রাজার দিকে চাহিল যে রাজা মারিবেন কি দয়ায় তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল, তীর আবার তূণীরেই রাখিয়া দিলেন। রাজার মৃগয়া করিবার রকম দেখিয়া তাঁহার মন্ত্রীরা বলিলেন, 'মহারাজ আপনি কখনও মৃগয়া করেন নাই। এরূপ ভাবে কোন জন্তুকেই মারিতে পারিবেন না, যে সব জন্তু ভয়ানক হিংস্র, বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, ভল্লুক এদেরকে লক্ষ্য করুন মারিতে পারিবেন, ও নিরীহ গোবেচারা হরিণ মারা আপনার কর্ম্ম নয়।' রাজাও ত তাই চাহেন, তিনি তখন বাঘ, সিংহ, গণ্ডার মারিতে লাগিলেন, এরূপ শীকারে তাঁহার বেশ আমোদ হইতে লাগিল।

এমনি করিয়া একদিন রাজা দশরথ মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন, সে দিন একটা বন্য বরাহের পিছনে ছুটিয়া এমন গভীর বনে প্রবেশ করিয়াছেন যে, তাঁহার অনুচরবর্গ কে যে কোথায় পড়িয়া রহিল, তিনি বুঝিতেও পারিলেন না। একে কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না, তাহার উপর সেদিন আবার একটা শীকারও জুটে নাই; এমন সময়ে শুনিলেন, যেন নিকটেই কোন হাতী জল পান করিতেছে। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। শব্দ লক্ষ্য করিয়া এক শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। 'বাবা গো' বলিয়া একটা কাতরধ্বনি তাঁহার কানে আসিল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার শরে যে প্রাণী মরিয়াছে, সে ত' হাতী নয়, এ যে মানুষের স্বর। তিনি

তৎক্ষণাৎ উৎকণ্ঠিত হইয়া বেতগাছের ঝোঁপের নিকট যাইয়া দেখেন সর্ব্বনাশ! একটী সুকুমার মুনি-বালকের বক্ষে তাঁহার তীর বিঁধিয়াছে। ব্রহ্মহত্যা করিলাম ভাবিয়া রাজা দশরথ সভয়ে বালককে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; বালক বলিল, যে তাহারা ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় নয়, পিতা তাহার বৈশ্য তাপস। পিতা মাতা দুইজনেই অন্ধ। এই বনেই আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা করেন। দশরথ বালকটীকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার পিতামাতার নিকট গিয়া অতিকষ্টে কোনও ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটী বুঝাইয়া বলিলেন। বালকটীই তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, সে ছাড়া জগতে আর তাঁহাদের এমন কেহই ছিল না যে, অন্ধদের সেবা করে। তাঁহারা রাজার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, তাঁহাদের পুত্রের ন্যায় নিরীহ তাপসবালকের যে শরাঘাতে অকালে প্রাণ যাইবে, এ যে কল্পনারও অতীত। বৃদ্ধ মুনি অনেক শোক করিলেন, পরে বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের পুত্র ত আপনার কোনও অনিষ্ট করে নাই, তবে কোন্ অপরাধে আপনি তাহার প্রাণবধ করিলেন? আজ আপনি আমাদের পুত্রের প্রাণবধ করিয়া আমাদেরও জীবন নাশ করিলেন, আর কাহার জন্যই বা আমাদের প্রাণ, আর কেই বা আমাদের দেখিবে।" বলিতে বলিতে অন্ধের ক্রোধ বাড়িয়া উঠিল, তিনি আপনার নয়নের জল হস্তে লইয়া শাপ দিলেন, "আজ যেমন আমরা পুত্রের শোকে প্রাণ হারাইতেছি, তোমাকেও একদিন রাজা সেইরূপ পুত্রের শোকেই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।"

দশরথের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। সারাজীবনে যাঁহাকে কখনও কাহারও একটা রুষ্টকথা পর্য্যন্ত শুনিতে হয় নাই, এতবড় তীব্র অভিশাপ আজ তাঁহাকে শুনিতে হইল। রাজা অস্থির হইয়া পড়িলেন; কিন্তু আবার একটা আশায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন। তিনি ত নিঃসন্তান, এ অভিশাপ যদি ফলিবার হয়, তবে ত তিনি তাহার পূর্ব্বে পুত্রমুখ দেখিতে পাইবেন। শাপে বর হইল ভাবিয়া তিনি মুনিকে বলিলেন, "মুনিবর! আমি ত অপুত্রক, আপনি শাপ দিয়া আমার উপকারই করিলেন, এখন অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আপনার কি করিতে

হইবে।" তাঁহারা তখন রাজাকে দিয়া চিতা প্রস্তুত করাইয়া পুত্রকে চিতায় সমর্পণ করাইলেন, পরে স্বামীস্ত্রীতে সেই জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। দশরথের মৃগয়ার সাধ চিরদিনের মত ঘুচিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লঙ্কায় রাক্ষসরাজ রাবণের অত্যাচারে মানুষ ত' দূরের কথা, দেবতারা পর্য্যন্ত জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাবণ যে কতবার স্বর্গে গিয়া দেবতাদের ধনরত্ন ও সুন্দরী কন্যা জোর করিয়া লইয়া আসিয়াছিল তাহার ঠিক নাই। দেবতারা অবশ্য যুদ্ধে রাবণকে জয় করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রহ্মার বরে রাবণ ছিল অজেয়, কে তাহাকে পরাজিত করে। দেবতারা শেষে নিরুপায় হইয়া সকলে মিলিয়া একদিন ভগবান্ নারায়ণের নিকট নিজেদের দুঃখের কাহিনী জানাইবার জন্য গেলেন। নারায়ণ তখন ক্ষীরোদ সমুদ্রের উপর সর্পরাজ বাসুকীর দেহে শয়ন করিয়াছিলেন, আর লক্ষ্মীদেবী তাঁহার পদসেবা করিতেছিলেন। দেবতারা গিয়া প্রণাম করিয়া সেই পরমপুরুষের স্তব আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "দেবগণ, আজ কিজন্য তোমাদের শুভাগমন হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি,—দুরাত্মা রাবণের বিনাশকাল নিকটবর্ত্তী; আমি শীঘ্রই পৃথিবীতে রাজা দশরথের পুত্ররূপে মনুষ্যজন্মগ্রহণ করিয়া রাক্ষসরাজের বিনাশসাধন করিব, তোমাদের কোনও ভয় নাই।" অনাবৃষ্টিতে শুষ্কপ্রায় শস্য যেমন বৃষ্টি পড়িলে সতেজ হইয়া উঠে, রাবণের অত্যাচারে নিপীড়িত দেবতারাও নারায়ণের আশ্বাস বাক্যে সেইরূপ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

এদিকে রাজা দশরথের যত বয়স হইতে লাগিল, ততই তাঁহার পুত্রমুখ দেখিবার ইচ্ছাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন কুলগুরু বশিষ্ঠের পরামর্শে তিনি 'পুত্রেষ্টি' নামক যজ্ঞ করিতে সম্মত হইলেন; স্বয়ং মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ হইলেন এ যজ্ঞের পুরোহিত। রাজা ও তাঁহার তিনরাণী শুদ্ধচিত্তে যজ্ঞস্থলে বসিয়া একমনে পুত্র কামনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়া আসিল, এমন সময় সকলে দেখিতে পাইলেন যজ্ঞের অগ্নি ক্রমে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে, তাঁহারা আরও দেখিলেন সেই অগ্নি হইতে এক স্বর্গীয় পুরুষ বাহির হইলেন, তাঁহার হস্তে এক সুবর্ণময় পাত্র,—পুরোহিতের

দেবতার হাত হইতে দশরথের পায়সান্ন গ্রহণ

আজ্ঞায় রাজা দশরথ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দেবতার হাত হইতে স্বর্ণময় পাত্র গ্রহণ করিলেন। তাহার মধ্যে পায়সান্ন ছিল, রাজা সেই পায়সান্ন তাঁহার পাটরাণী কৌশল্যা ও প্রিয়তমা কৈকেয়ীকে খাইতে দিলেন ; তাঁহারা আবার স্নেহ বশতঃ আপনাপন অংশ হইতে ছোট রাণী সুমিত্রাকে সেই অমৃততুল্য পায়সান্ন কিছু কিছু দিয়া সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করিলেন।

কয়েক মাস পরে জানা গেল যে, তিন রাণীই অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন। একদিন রাত্রে এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার হইল। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা তিন রাণীই এক সঙ্গে একই স্বপ্ন দেখিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, কয়েকজন খর্ব্বকায় পুরুষ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও অসি হস্তে লইয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, গরুড় তাঁহাদিগকে বহন করিতেছেন, স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁহাদের সেবা করিতেছেন এবং কশ্যপ প্রভৃতি মহর্ষিরা তাঁহাদের আরাধনা করিতেছেন। সকাল বেলা রাণীরা নিজেদের মধ্যে পূর্ব্বরাত্রের স্বপ্ন লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য ! সকলেরই এক স্বপ্ন। রাজা দশরথ স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার গৃহে মনুষ্য রূপে অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবান্ আর কে আছে ?

চৈত্র মাসের নবমীতিথিতে এক শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীভগবান্ চারি অংশে বিভক্ত হইয়া প্রথমে জ্যেষ্ঠা মহিষী কৌশল্যার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। শিশুর শরীরের জ্যোতিঃতে সূতিকাগৃহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, গৃহের প্রদীপগুলি সে জ্যোতিঃর নিকট অতি ম্লান বলিয়া মনে হইতে লাগিল। রাজা দশরথ পুত্রের মুখ দেখিয়া যে কত আনন্দ পাইলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না, তিনি পুত্রের নাম রাখিলেন রাম অর্থাৎ মঙ্গলময়। তাহার কয়েকদিন পরেই, কৈকেয়ী ভরতকে প্রসব করিলেন ; আবার তাহার কয়েকদিনের মধ্যে সুমিত্রা যমজ সন্তান প্রসব করিলেন। মহারাজ তাঁহাদের নাম রাখিলেন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। স্বয়ং নারায়ণ মনুষ্য-কলেবর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই জন্য পৃথিবীও যেন স্বর্গরাজ্য হইয়া উঠিল। দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দৈবদুর্ব্বিপাক আর রহিল না। ধরায় এক অপূর্ব্ব শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

কেবল রাক্ষসরাজ রাবণের ভাগ্যে ঘটিল অন্যরূপ। যে শুভমুহূর্ত্তে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্ররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন, সেই মুহূর্ত্তে রাক্ষসরাজের মাথার মুকুট সহসা ভূমিতে পড়িয়া গেল, দশানন যেন কাঁপিয়া উঠিলেন, তাঁহার হৃদয়ে এক অজানা ভীতির সঞ্চার হইল।

শশিকলার ন্যায় রাজকুমারেরা দিন দিন বড় হইতে লাগিলেন। মহারাজ তাঁহাদের সুশিক্ষারও ব্যবস্থা করিলেন। রাজকুমারেরা শাস্ত্রে এবং শস্ত্রে ত সুপণ্ডিত হইলেনই, বিনয় ও আচার ব্যবহারেও তাঁহাদের সমকক্ষ কেহ রহিল না। তাঁহাদের মধুর স্বভাবের গুণে প্রজারা তাঁহাদের অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িল।

একদিন রাজা দশরথ সভামধ্যে বসিয়া আছেন, এমন সময় কুশিক মুনির পুত্র মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, তপোবনে রাক্ষসেরা বড়ই উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে, যাগযজ্ঞ সুসম্পন্ন করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, বিঘ্ন নিবারণের জন্য আপনার পুত্র রামচন্দ্রকে আমি তপোবনে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।" মহর্ষি একে বিশ্বামিত্র, তায় আবার যাগযজ্ঞের বিঘ্নশান্তি! এরূপ অবস্থায় কি আর 'না' বলা যায়! রাজা অনুমতি দিলেন। রাম ও তাঁহার সহিত লক্ষ্মণ জনক ও জননীদের চরণধূলি মস্তকে লইয়া মুনির সহিত চলিলেন। দশরথ তাঁহাদের সহিত বহুসৈন্য সামন্তও দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মুনি জানেন শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং ভগবানের অবতার, তিনি একাই ত্রিভুবন বিজয়ে সক্ষম, সৈন্য সামন্ত লওয়া মিছা।

রাম-লক্ষ্মণ বনের পথে চলিয়াছেন। বয়স তাঁহাদের বেশী হয় নাই, মস্তকে তখনও বালকের ন্যায় শিখা ছিল। তাঁহাদের ত কখনও পথচলা অভ্যাস নাই, রথেই গমনাগমন করেন; পাছে পথ চলিতে কষ্ট হয়, মুনি সেইজন্য দুজনকে বলা ও অতিবলা নামক বিদ্যা শিখাইয়া দিলেন। এ বিদ্যা জানা থাকিলে পথহাঁটিতে কোনও কষ্ট হয় না। তাহার উপর মহামুনি এমন সব গল্প আরম্ভ করিলেন যে, রাম-লক্ষ্মণ কতপথ আসিয়াছেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কেবল গল্প শুনিবার দিকেই তাঁহাদের মন। তাহার উপর বনের দৃশ্য, পাখীর গান, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর কুলু কুলু

ধ্বনি, বনপুষ্পের সুমিষ্ট গন্ধ, এ সমস্ত তাঁহাদের পক্ষে সবই নূতন। ক্রমে তাঁহারা তপোবনের নিকট আসিয়া পৌঁছছিলেন। সেখানে আসিয়া উপরের দিকে চাহিয়া দেখেন মেঘের ন্যায় কালো কালো কি সব আকাশ হইতে তাঁহাদের দিকে নামিতেছে। বিশ্বামিত্র মুনি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ইহারাই রাক্ষস। 'রাক্ষস' শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার ধনুক উঠাইয়া তীর ছুঁড়িলেন। তাঁহার লক্ষ্য অব্যর্থ, তীর গিয়া একেবারে তাড়কা রাক্ষসীর বক্ষের মাঝে গিয়া বিঁধিল, বিকটাকার রাক্ষসী রাম-লক্ষ্মণের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়া রহিল। কি কুৎসিত তাহার চেহারা, গলায় মানুষের কাটা মাথার মালা, পরণে বাঘের ছাল, কিম্ভূতকিমাকার! তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করিয়া তাঁহারা আবার চলিতে লাগিলেন; মুনি বলিলেন, 'এ জায়গার নাম 'বামনাশ্রম', এই স্থানে শ্রীভগবান্ বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগৎকে পবিত্র করিয়াছিলেন।' বামন অবতারের কথা শুনিয়া রামচন্দ্রের মনে হইল, এইখানকারই কি যেন তিনি খুবই জানিতেন। অথচ কি যে জানিতেন অনেক চেষ্টা করিয়া কিছুই মনে পড়িল না। মনটা তাঁহার উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পথ চলিতে লাগিলেন। এবার মুনির নিজের আশ্রম, দূর হইতে তাঁহারা আসিতেছেন দেখিয়া শিষ্যেরা তাঁহার জন্য পাদ্য-অর্ঘ্য লইয়া আসিলেন। এমন সময়ে সহসা তাঁহাদের সম্মুখেই কাহারা যেন রক্ত, মাংস নিক্ষেপ করিতে লাগিল, রামচন্দ্র ত তাহাদের স্পর্দ্ধা দেখিয়া অবাক্, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের দলপতি মারীচ ও সুবাহু দুইজন রাক্ষসকে তীর ছুঁড়িয়া মারিয়া ফেলিলেন; অবশিষ্ট রাক্ষসেরা যে যাহার প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেল।

বিশ্বামিত্র মুনি রামলক্ষ্মণকে রক্ষক পাইয়া মহানন্দে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞে বিঘ্ন জন্মাইবার জন্য রাক্ষসেরা অনেক চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ যাহার সহায় সে যজ্ঞে কাহার সাধ্য বিঘ্ন ঘটায়। নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন করিতে পাইয়া বিশ্বামিত্র মুনি রামলক্ষ্মণকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই সময় মিথিলাপতি রাজর্ষি জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন, যেন তাঁহার যজ্ঞ সভায় মহর্ষি
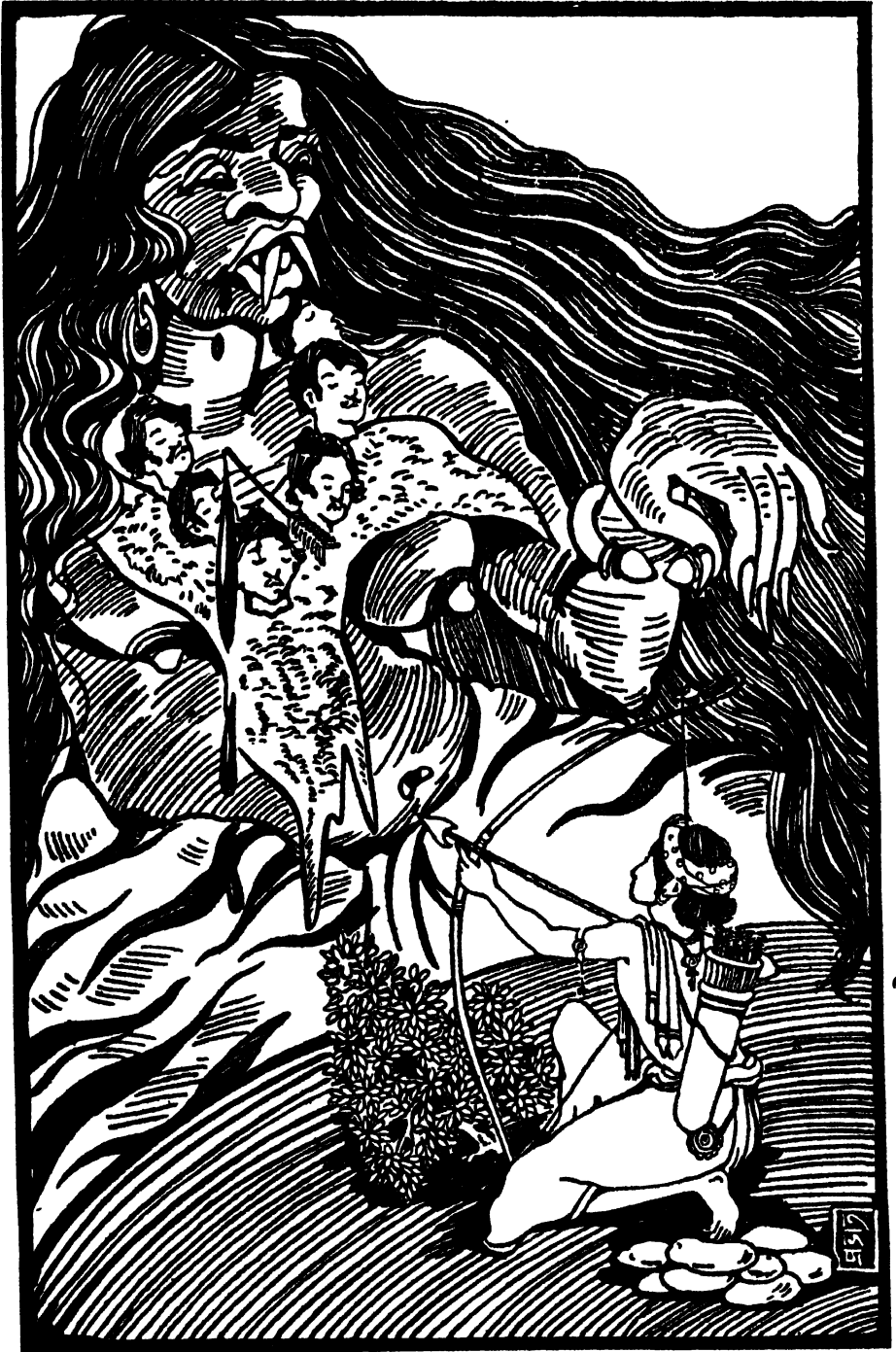
তাড়কা রাক্ষসী বধ

একবার পদধূলি দান করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। বিশ্বামিত্র শুনিয়াছিলেন যে জনকরাজা পণ করিয়াছেন যে, যে কোনও লোক হরধনুতে জ্যা আরোপণ করিবেন, তিনি তাঁহার সহিত আপন রূপসী কন্যা সীতার বিবাহ দিবেন। এখন নিমন্ত্রণ পাইয়া রামচন্দ্রকে সেই ধনু দেখাইবার জন্য বিশ্বামিত্র মুনি দু'ভাইকে সঙ্গে লইয়া মিথিলায় চলিলেন। পথি মধ্যে এক অতি আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ঘটিল। বনের মধ্যে একজায়গায় বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'পূর্ব্বে এখানে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম ছিল, কোনও অপরাধে সেই মুনি পত্নী-অহল্যাকে শাপ দেন, 'তুই পাষাণী হইয়া থাক্', সম্মুখে যে পাষাণ দেখিতেছেন ইহাই ছিল পূর্ব্বে গৌতমপত্নী অহল্যা। আপনি একে চরণ দ্বারা স্পর্শ করুন।' শ্রীভগবানের শ্রীচরণ স্পর্শে পাষাণ নড়িয়া উঠিল, ক্ষণমধ্যে ঋষিপত্নী অহল্যা আপনার পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের চরণবন্দনা করিলেন। অহল্যার উদ্ধার করিয়া পুনরায় তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। তাঁহারা মিথিলায় পৌঁছিয়াছেন শুনিয়া জনকরাজা মহর্ষির প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞস্থলে লইয়া গেলেন। যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইবার পর অবসর বুঝিয়া মুনি বিশ্বামিত্র জনককে তাঁহার ধনুকের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, 'শ্রীরামচন্দ্র একবার সেই ধনুকটী দেখিতে চাহেন।' রাজর্ষি জনক রামচন্দ্রের অল্প বয়স আর সুকুমার দেহ দেখিয়া মনে করিলেন, সীতার উপযুক্ত বরই বটে, এমন পাত্র আর কোথায় পাইবেন, কিন্তু আবার দুর্জ্জয় পণের কথা ভাবিয়া তাঁহার দুঃখ হইতে লাগিল, তিনি বলিলেন, "মহর্ষি, রামচন্দ্র নেহাৎ বালক, ধনু উত্তোলন করিবারই কি সাধ্য তাঁহার আছে?" মুনি বলিলেন, "মহারাজ, রামের বলবীর্য্য জানি বলিয়াই বলিতেছি, না হইলে আমি তাঁহাকে এস্থানে আনিতাম না। যে কাজ আজ পর্য্যন্ত কেহই করিতে পারে নাই, তাহা যে কোনও লোক কখনও করিতে পারিবে না, এমন কথা কি কেহ বলিতে পারে?"

বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া রাজা তখনই আপন অনুচরদিগকে মহাদেবের ধনুকটী সকলের সমক্ষে আনিতে বলিলেন। ধনু নয় ত যেন এক ক্ষুদ্র পর্ব্বত! রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে ধনুক উঠাইয়া তাহাতে জ্যা

যোজনা করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের সে দৃঢ় আকর্ষণ হরধনু সহ্য করিতে পারিল না, মড় মড় শব্দে একেবারে দুইখান হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। উপস্থিত সকলে বালকের শক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত! এই কোমল শরীরে এত শক্তি! জনক আনন্দে আত্মহারা, রামের ন্যায় জামাতা লাভ করা ত কম সৌভাগ্য নয়। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া কন্যা সীতাকে সকলের সমক্ষে আনিয়া রামের হস্তে সমর্পণ করিলেন, আর আপনার কুলপুরোহিতকে দিয়া অযোধ্যায় মহারাজ দশরথের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। পুত্র হরধনু ভঙ্গ, আর সীতার ন্যায় পত্নী লাভ করিয়াছেন শুনিয়া দশরথ আনন্দে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্য-সামন্ত লইয়া মিথিলায় যাত্রা করিলেন। মিথিলায় মহোৎসব পড়িয়া গেল, উভয় রাজাই আপনাপন পদমর্য্যাদা অনুসারে রীতিমত বিবাহের আয়োজন করিলেন। এক শুভ লগ্নে রামের সহিত সীতার, লক্ষ্মণের সহিত সীতার ভগ্নী উর্ম্মিলার, এবং ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজের দুই কন্যার বিবাহ হইল। চারি পুত্রের একসঙ্গে বিবাহ দিয়া এবং সীতা, উর্ম্মিলা প্রভৃতির ন্যায় পুত্রবধূ লাভ করিয়া রাজা দশরথ তাঁহার সাধনা এবং কামনার অপেক্ষাও বহুগুণ ফল লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে মনে বেশ একটা তৃপ্তি অনুভব করিলেন। তারপর রাজা পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া আপন রাজধানী অভিমুখে চলিলেন। কিছু দূর যাইতে না যাইতেই এক আপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। জামদগ্নি ঋষির পুত্র ক্ষত্রিয়দের মহাশত্রু পরশুরাম রামের হরধনু ভঙ্গ করিবার সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত একবার শক্তি পরীক্ষা করিতে আসিলেন। দীর্ঘকুঠারধারী পরশুরামকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া রাজা দশরথ সসম্মানে 'এই অর্ঘ্য' 'এই অর্ঘ্য' বলিয়া প্রণাম করিলেন, কিন্তু পরশুরামের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, তিনি একেবারে সোজাসুজি রামচন্দ্রের নিকট গিয়া বলিলেন, "যেদিন আমার পিতা ক্ষত্রিয়ের হস্তে নিহত হ'ন, সেই দিন হইতে ক্ষত্রিয় জাতি আমার পরম শত্রু। আমি বহুবার ক্ষত্রিয়দিগকে পরাস্ত করিয়া পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিয়াছি; তোর বিক্রম শুনিয়া বুঝিতেছি ক্ষত্রিয়েরা আবার মাথা তুলিতেছে। হরধনু ভাঙ্গিয়া আমার ক্রোধাগ্নিতে

তুই ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়াছিস্। কি ঘৃণার কথা। পূর্ব্বে 'রাম' বলিলে লোকে কেবল আমাকেই বুঝিত, আর এখন হয় ত কেহ কেহ রাম বলিতে তোকেও বুঝিবে। ওঃ অসহ্য! তোর মত একটা বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাওয়াও আমার পক্ষে অপমান, লোকে বলিবে কি! তোকে ছাড়াও ত যায় না। এই আমার ধনুক, এতে যদি জ্যা পরাইয়া তীর নিক্ষেপ করিতে পারিস্ তাতেই আমি তোর কাছে পরাজয় স্বীকার করিব। আর যদি ভয় হয়, মাপ চা'।" রামচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া পরশুরামের ধনুক এক হাতে লইয়া মাটিতে রাখিলেন, আর এক হাতে জ্যা পরাইয়া ধনুকেতে তীর যুড়িলেন। রামের তেজঃ দেখিয়া পরশুরামের মাথা হেঁট, কোথায় সে দর্প, কোথায় বা সে অহঙ্কার! পরশুরামের অবস্থা দেখিয়া রামচন্দ্রের দয়া হইল, তিনি বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আপনি বর্ণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া এই শরে আপনার প্রাণবধ করিলাম না, কিন্তু আমার শর যোজনা ত ব্যর্থ হইবার নয়, আপনি বলুন, এই শর দ্বারা আপনার গতিরোধ করিব, না, আপনি যাহাতে স্বর্গে যাইতে না পারেন তাহার ব্যবস্থা করিব?" পরশুরাম বলিলেন, "আমার গতিরোধ করিবেন না, আমার তীর্থ দর্শনের সাধ এখনও মেটে নাই। তবে আমি নিষ্কাম, স্বর্গসুখ চাহি না। আমি পূর্ব্বেই জানিতাম, আপনি সেই পরমপুরুষ নারায়ণ, তবু কেবল আপনার ভগবদ্-শক্তি দেখিবার আশায় আজ আমি আপনার নিকট ধৃষ্টতা দেখাইয়াছি, আমায় ক্ষমা করুন।" শ্রীরামচন্দ্র পূর্ব্বদিক লক্ষ্য করিয়া সেই বাণ ত্যাগ করিলেন, পরশুরামেরও আর স্বর্গে যাইবার পথ রহিল না। যাই করুন না কেন ভৃগুতনয় ব্রাহ্মণ, সেইজন্য রামচন্দ্র পরশুরামের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। 'মঙ্গল হউক' বলিয়া পরশুরাম চলিয়া গেলেন। পরশুরামের আগমনে রাজা দশরথের উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না, এখন পুত্রকে এমন অনায়াসে জয়ী হইতে দেখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া রামকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার মনে হইল, আজ যেন রামের পুনর্জন্ম লাভ হইয়াছে। পথে শিবিরে কয়েকদিন যাপন করিয়া তাঁহারা অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরম সুখেই দশরথের দিন কাটিতে লাগিল। রামের মত যাঁহার পুত্র, সীতার মত যাঁহার পুত্রবধূ, কৌশল্যার মত পত্নী, সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য, একান্ত রাজভক্ত প্রজা তাঁহার ত' সুখ হইবারই কথা। রাজার ক্রমে বার্দ্ধক্য আসিল। তাঁহাদের কুলের চিরপ্রথা মত তাঁহারও ইচ্ছা হইল, উপযুক্ত পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। রাম রাজা হইবেন শুনিয়া রাজ্যে মহাধুম, প্রজাদের আনন্দের সীমা নাই। এমন সময় কুটীল স্বভাবা কৈকেয়ী এক মহা অনর্থ ঘটাইলেন; যে দিন রামের অভিষেক হইবে তাহার পূর্ব্বদিন কৈকেয়ী রাজাকে আপনার নিকট ডাকাইয়া বলিলেন, "মহারাজ, তুমি পূর্ব্বে আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া দুইটী বর দিতে চাহিয়াছিলে, মনে আছে?" রাজার তখন মনে আনন্দ ধরে না, তিনি বলিলেন, "তোমায় আমার অদেয় কি আছে প্রিয়ে, কি চাও বল।" রাণী তখন এক বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস, আর এক বরে ভরতের জন্য রাজসিংহাসন চাহিয়া বসিলেন। প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যখন তাহা পালন করিতেই হইবে; অভিষেকের সকল আয়োজন ব্যর্থ হইল। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ভাবিয়া প্রজারা সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। রামের মনে কিন্তু বিকার নাই, তিনি প্রফুল্ল মনে সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া বল্কল পরিয়া দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিলেন। আজ কোথায় তিনি রাজসিংহাসনে বসিবেন, না চলিলেন একেবারে বনবাসে! শ্রীরামচন্দ্রের অসাধারণ পিতৃভক্তি দেখিয়া চারিদিকে ধন্যধন্য পড়িয়া গেল। এদিকে দশরথ রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়া হৃদয়ে যে ব্যথা পাইলেন, তাহা সহ্য করিবার মত ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। "হা রাম! কোথায় রাম!" বলিতে বলিতে পুত্রের শোকে তিনি অচিরে প্রাণত্যাগ করিলেন। অন্ধ মুনির শাপ ফলিয়া গেল।

ভরত থাকিতেন তাঁহার মাতুলালয়ে, এত যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহার বিন্দুবিসর্গও তিনি জানিতেন না। তাঁহার নিকট যখন সংবাদ গেল,

তিনি ত প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তারপর অযোধ্যায় আসিয়া সমস্ত দেখিয়া তাঁহার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। সামান্য রাজসিংহাসন, এর জন্য মাতার এত চক্রান্ত! তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, এ সিংহাসন তিনি স্পর্শও করিবেন না। তারপর তিনি পিতার সৎকার কোনওক্রমে সমাপন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের অন্বেষণে বাহির হইলেন। দণ্ডকারণ্যে তাঁহাদের সাক্ষাৎ পাইয়া ভরত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শ্রীচরণ ধরিয়া অনেক কাঁদিলেন, আর অযোধ্যায় ফিরিয়া রাজ-সিংহাসনে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন, "ভরত, পিতার সমক্ষে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আজ পিতা নাই বলিয়া সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব, তাহাও কি হয়, ভাই! অযোধ্যায় আর আমার ফিরিয়া যাওয়া হইবে না।" তখন ভরতও আপন প্রতিজ্ঞার কথা বলিলেন, রাজ্য ত তিনি লইবেনই না, তবে রামচন্দ্রের নামে রাজ্য চালাইবেন এই বলিয়া রামের পাদুকাযুগল লইয়া একেবারে নন্দীগ্রামে গিয়া উঠিলেন, অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। সেখানে শ্রীরামের পাদুকাদ্বয় রাজ-সিংহাসনে বসাইয়া শ্রীরামচন্দ্রের নামে রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। ভরতের এ অদ্ভুত ত্যাগ দেখিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

রামচন্দ্র আর দণ্ডকারণ্যে রহিলেন না, তিনি ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলেন। এক দিন তাঁহারা তিন জনে বনের মধ্য দিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে এক রাক্ষস আসিয়া হঠাৎ সীতাদেবীকে ধরিতে আসিল। দুর্বৃত্তের স্পর্দ্ধা দেখিয়া রামলক্ষ্মণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, রাক্ষসকে মারিয়া একেবারে ভূমির মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিলেন। ক্রমে তাঁহারা পঞ্চবটীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। পঞ্চবটীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম, অনেক মুনিঋষিরাও সেখানে বাস করেন, এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহারা কিছুদিন পঞ্চবটীতে বাস করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। তাঁহারা বেশ সুখে আছেন, এমন সময়ে একদিন লঙ্কার রাক্ষসরাজ রাবণের ভগ্নী শূর্পণখা সেই বনে বেড়াইতে আসিয়াছিল। যেখানে রামচন্দ্র সীতাদেবীর সহিত গল্প করিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া শূর্পণখার নজর পড়িল রামচন্দ্রের উপর, তাঁহার বীরত্বব্যঞ্জক সুন্দর আকৃতি দেখিয়া রাক্ষসীর মন তাঁহার প্রতি

আসক্ত হইয়া উঠিল, সে অমনি সীতার সম্মুখেই রামচন্দ্রকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া বসিল। রাম বলিলেন, "আমার ত বিবাহ হইয়াই গিয়াছে, পাশেই আমার স্ত্রী রহিয়াছেন, লক্ষ্মণের কাছে চেষ্টা কর না।" রাক্ষসী অমনি লক্ষ্মণের কাছে ছুটিল, লক্ষ্মণ বুঝাইয়া দিলেন বড় ভায়ের কাছে যখন একবার প্রস্তাব করা হইয়া গিয়াছে, তখন আর তিনি কিরূপে বিবাহ করিবেন। শূর্পণখা আবার রামচন্দ্রের নিকট আসিল। তাহার ব্যাপার দেখিয়া সীতাদেবী হাসিয়া উঠিলেন, একে দুইজনকার নিকট অপমান, তাহার উপর আবার একটা বালিকার হাসি। শূর্পণখা নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাণ্ড হাঁ করিয়া সীতাকে গিলিতে আসিল, লক্ষ্মণ পূর্ব্ব হইতেই রাগিয়া ছিলেন, এখন তরবারির আঘাতে তাহার নাক, কাণ কাটিয়া ছাড়িয়া দিলেন। রাক্ষসীও 'দাদা গো, গেলাম গো' বলিয়া পলাইয়া গেল। তাহার অবস্থা দেখিয়া রাক্ষসের দল ক্ষেপিয়া উঠিল, তাহাদের দলপতি খর ও দূষণ রাম-লক্ষ্মণকে এ অপমানের উপযুক্ত প্রতিফল দিবার জন্য 'মার মার' শব্দে পঞ্চবটী আক্রমণ করিল। রামচন্দ্র একা হইলে কি হয়, রাক্ষসদের মনে হইল যেন, প্রত্যেক রাক্ষসের সহিত এক এক জন রাম যুদ্ধ করিতেছেন। রামের নিকট সে সব যুদ্ধ কি আর যুদ্ধ, তিনি অনায়াসে খর, দূষণ, ত্রিশিরা প্রভৃতি রাক্ষসদের মুণ্ডপাত করিয়া ফেলিলেন, অবশিষ্ট যাহারা রহিল, তাহারা প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল। শূর্পণখা দেখিল রামলক্ষ্মণকে জব্দ করা যে-সে রাক্ষসের কর্ম্ম নয়, সে একেবারে লঙ্কায় রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট গিয়া নিজের দুর্দ্দশা, রাক্ষসদের পরাজয় ইত্যাদি সমস্ত ঘটনা সালঙ্কারে বর্ণনা করিল। ভগিনীর অপমানে রাবণ একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন, রাম আবার কে? যোদ্ধা বলিয়া ত তাহার নাম এ পর্য্যন্ত শোনাই যায় নাই, তাহার এতদূর স্পর্দ্ধা! বনে বনে বেড়ান সুন্দরী স্ত্রী লইয়া! রাবণের বড় ইচ্ছা হইল সীতাকে ধরিয়া আনে, তাহা হইলে রামকেও উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়, আর নিজেরও বেশ একটী সুন্দরী স্ত্রী লাভ হয়। রাবণ তখন মারীচ রাক্ষসকে স্বর্ণমৃগের রূপ ধরিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে ছলনা করিয়া বহুদূরে লইয়া যাইতে আদশ করিলেন, আর আপনি সুযোগ বুঝিয়া সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া লঙ্কায় চলিয়া গেলেন। পথে দশরথের

এক পক্ষীবন্ধু জটায়ু রাবণকে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে রাবণের শরে তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইল।

এদিকে ঘরে সীতা নাই দেখিয়া রামলক্ষ্মণের মাথা ঘুরিয়া গেল। তাঁহারা স্বর্ণমৃগের ব্যাপার দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলেন, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও কু-অভিসন্ধি আছে। তাঁহারা সীতার অন্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে জটায়ুর নিকট আসিয়া পড়িলেন; জটায়ুর তখনও প্রাণ বাহির হয় নাই, সীতাকে রাক্ষসরাজ রাবণ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, কেবল এই সংবাদটী জানাইবার জন্যই যেন তিনি বাঁচিয়াছিলেন। কথা শেষ হইতেই তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। পিতার বন্ধু, তাই রাম লক্ষ্মণ তাঁহার রীতিমত সৎকার করিয়া, পুনরায় সীতার অন্বেষণে দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলেন। পথে আবার এক বিপদ উপস্থিত! কোথা হইতে এক কবন্ধ আসিয়া রামচন্দ্রকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, রামচন্দ্র বিরক্ত হইয়া তাহাকে যেমন এক বাণ মারিয়াছেন, অমনি কবন্ধটা অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার স্থানে এক দিব্য পুরুষ। তিনি বলিলেন, কোনও মুনির শাপে তিনি এই বিকৃত দশা পাইয়াছিলেন, এখন শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়া তিনি শাপ-মুক্ত হইলেন। তাঁহারই পরামর্শে রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিলেন। সুগ্রীবের বড় দুঃখ ছিল যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালি একাই সমস্ত রাজ্য ভোগ দখল করিতেছিলেন, আর সুগ্রীব বেচারা রাজপুত্র হইয়াও বনে বনে অসহায় অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার সাহায্যকারী কেহই ছিল না, বালিও তাঁহাকে দেখিত না। সুগ্রীব রামচন্দ্রকে বন্ধু পাইয়া তাঁহার সাহায্যে বালিকে বধ করিয়া বানর-রাজ্য হস্তগত করিলেন। রামচন্দ্রেরও সুগ্রীবকে পাইয়া খুব সুবিধা হইল, তিনি সুগ্রীবের অনুচরদিগকে সীতার সন্ধানে নানা দেশে পাঠাইলেন। অনেকেই বাহির হইল বটে, কিন্তু সাফল্যলাভ করিল এক হনুমান্। হনুমান্ জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্পাতির নিকট হইতে রাবণ রাজার রাজ্য কোথায় জানিয়া লইয়া একেবারে মহাসাগরের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে অসীম সমুদ্র, তাহারই অপর পার্শ্বে রাবণ রাজার লঙ্কা। সাগর পার হইতে না

পারিলে লঙ্কায় যাইবার আর কোন উপায় নাই। হনুমান্ কিন্তু দমিবার পাত্র নহেন, তিনি আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া 'জয় রাম' বলিয়া এক লাফ দিলেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে হনুমান্ একেবারে গিয়া পড়িলেন লঙ্কায়। লঙ্কা একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ এখানে কোথায় যে সীতাদেবী আছেন, সন্ধান করিয়া বাহির করা ভয়ানক শক্ত ব্যাপার। হনুমান্ ত এই প্রথম এখানে আসিয়াছেন তাহার উপর আবার সীতাদেবীকে তিনি কখনও চোখে দেখেন নাই। তিনি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে শেষে এক জায়গায় দেখিলেন, একটা সামান্য বাগান, তাহারই এক বৃক্ষের তলায় এক লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী নারী দুঃখ করিতেছেন, আর তাহার চারিদিকে একদল রাক্ষসী বসিয়া গল্প করিতেছে। হনুমান মনে করিলেন, এই লক্ষ্মী প্রতিমা নারীই নিশ্চয় সীতা। তিনি তখন তাঁহার নিকট গিয়া রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক দেখাইলেন, বহুকাল পরে রামচন্দ্রের নিদর্শন দেখিতে পাইয়া সীতা যেন মৃত দেহে প্রাণ পাইলেন। তিনিও আপনার একটী অলঙ্কার রামচন্দ্রকে দিবার জন্য হনুমানের হাতে দিলেন। এ দিকে হনুমান্ আসিয়াছে শুনিয়া লঙ্কায় হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। রাবণের পুত্র অক্ষয় হনুমানকে ধরিতে আসিয়া তাহার হস্তে প্রাণ হারাইল। তখন স্বয়ং ইন্দ্রজিৎ আসিয়া হনুমানকে বন্দী করিয়া রাক্ষসরাজের দরবারে লইয়া গেলেন। রাবণ আদেশ দিলেন, 'বানরের লেজ পুড়াইয়া ছাড়িয়া দাও।' তখন রাক্ষসেরা হনুমান্‌কে ধরিয়া তাহার লেজে আগুন লাগাইয়া দিল, হনুমান্‌ও তাই চান, তিনি অমনি সেই আগুন জ্বালা লেজ লইয়া লঙ্কার ঘরে ঘরে লাফালাফি করিতে লাগিলেন। তিনি যেখানেই যান, সেখানেই আগুন জ্বলিয়া উঠে। সহরময় আগুন, রাক্ষসেরা একেবারে বেকুব বনিয়া গেল, হনুমান্‌কে জব্দ করিতে গিয়া নিজেরাই রীতিমত জব্দ হইল। শেষে হনুমান্ নিজেই ক্ষান্ত হইয়া সাগরের তীরে আসিয়া আবার এক লাফ দিলেন।

রামচন্দ্র সীতাদেবীর নিদর্শন পাইয়া আনন্দে সেটী বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন, তারপর সকলকে লইয়া সমুদ্রের তীরে যাইবার জন্য বাহির হইলেন। সমুদ্রের তীরে আসিতেই রামচন্দ্রের এক পরম বন্ধু লাভ হইল।

রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ রাবণকে উচিত কথাই বলিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল সীতাকে সসম্মানে ছাড়িয়া দেওয়া, সীতাকে এ ভাবে ধরিয়া রাখা অত্যন্ত অন্যায়। রাবণের তখন মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছিল, চোরে কি আর ধর্ম্মকথা শোনে, রাবণ বিভীষণকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। বিভীষণ রামের শরণাপন্ন হইতেই, রামচন্দ্র বুঝিলেন, এইরূপ ঘরশত্রুকে হস্তগত করিতে পারিলেই তাঁহার যুদ্ধে জয়লাভ নিশ্চিত, দেশমাতৃকার সর্ব্বনাশ এদের দ্বারাই সাধিত হয়। তিনি বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসন দিবার লোভ দেখাইয়া বানরদিগকে সমুদ্রের উপর একটী সেতু নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা দেখিতে বলিলেন। বানরেরা তাঁহার কথামত বাস্তবিকই সেই অসীম সমুদ্রের উপর কাষ্ঠ ও প্রস্তর দিয়া প্রকাণ্ড এক সেতু নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিল, মনে হইল যেন শ্রীভগবান্ জলধির উপর শয়ন করিবেন বলিয়া স্বয়ং শেষনাগ পাতাল হইতে উত্থিত হইয়াছেন। সেই সেতুর উপর দিয়া রামলক্ষ্মণ তাঁহাদের বানর-সৈন্য লইয়া সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কা অবরোধ করিলেন। রাক্ষসেরা রামচন্দ্রের আগমন সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছিল, তাহারাও রীতিমত সাজসজ্জা করিয়া যুদ্ধে নামিল। উভয় পক্ষে বহুদিন ধরিয়া ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ একদিন যুদ্ধে আসিয়া নাগপাশ নামক অস্ত্রে রামলক্ষ্মণকে বাঁধিয়া ফেলিলেন, গরুড় এ সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ লঙ্কায় আসিয়া তাঁহাদের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। ইন্দ্রজিৎ আর একবার যুদ্ধে আসিয়া লক্ষ্মণের বক্ষে শক্তি নামক এমন এক অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, যে, সে যাত্রা হনুমান্ গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে সঞ্জীবনী ঔষধ না আনিলে লক্ষ্মণের প্রাণরক্ষা কঠিন হইত। দুইবার পরাজিত হইয়া লক্ষ্মণ মেঘনাদের সিংহনাদ চিরকালের জন্য ঘুচাইয়া দিলেন। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া লঙ্কায় ঘোর হাহাকার উঠিল, তখন সকলে পরামর্শ করিয়া কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধে পাঠাইয়া দিল। কুম্ভকর্ণ ছিল অত্যন্ত নিদ্রাপ্রিয়, অসময়ে উঠিয়া যুদ্ধে যাইতেই বানররাজ সুগ্রীব শূর্পণখার ন্যায় তাহার নাসা ও কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন, আর বেচারার যাহাতে নিদ্রার আর কোনও

ব্যাঘাত না ঘটে সেইজন্য রামচন্দ্র একেবারে তার মহানিদ্রার ব্যবস্থা করিলেন।

লঙ্কায় যাহারা মহারথী ছিল, তাহারা সকলেই একে একে বিনষ্ট হইল। তখন স্বয়ং রাবণ যুদ্ধে আসিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা হয় রামকে মারিবেন, না হয় নিজে মরিবেন। রাবণ আসিল রথে, রামচন্দ্রের রথ নাই, সেইজন্য স্বর্গ হইতে দেবরাজ ইন্দ্র আপনার রথখানি রামচন্দ্রের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ইন্দ্রের সারথী মাতলির করধারণ করিয়া দেবরাজের সেই জয়শীল রথে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রের বর্ম্ম পরিধান করিলেন। তখন যুদ্ধ করিবার জন্য রাম ও রাবণ উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হইলেন। যে রাবণ এক সময় ইন্দ্রাদি লোকপালদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নিজের মস্তক স্বহস্তে ছেদন করিয়াছিলেন, এমন কি বাহুবলে কৈলাস-পর্ব্বতকেও তুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, তিনি ত' আর যে সে লোক নহেন, সেইজন্য সম্মুখে পাইয়া শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে প্রথমেই রীতিমত সম্মান দেখাইলেন। তারপর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাম রাবণে যুদ্ধ হইতেছে, সংসার যেন নিস্তব্ধ। আকাশে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষঃ, কিন্নর সকলেই যেন উৎকণ্ঠিত। রাবণ যত বাণ মারেন, রামচন্দ্র সমস্তই ব্যর্থ করিয়া দেন, রামচন্দ্রও যত বাণ মারেন, রাবণও তাহা নিবারণ করেন। যুদ্ধে দু'জনাই সমান, কেহ কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন। রাবণ শেষে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া লৌহকণ্টকময় এক সুবৃহৎ গদার মত শতঘ্নী অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, রামচন্দ্রও অর্দ্ধচন্দ্রবাণ মারিয়া অনায়াসে পাকা কলাটীর ন্যায় সে অস্ত্র কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর রামচন্দ্র রাবণকে মারিবেন নিশ্চয় করিয়া অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অস্ত্র বহু ঊর্দ্ধে আকাশপথে উঠিয়া প্রচণ্ড-শব্দে ফাটিয়া গেল, তাহার মধ্য হইতে মহা সর্পের ন্যায় শত শত অগ্নিশিখা রাবণের উপর মহাবেগে নিপতিত হইল, আর নিমেষমধ্যে দশাননের দশমুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। রাবণ নিহত হইলেন, স্বর্গ হইতে দেবতারা শ্রীরামচন্দ্রের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বহুকাল রাবণের গৃহে বাস করিয়াছেন বলিয়া সীতাদেবীকে

একবার সকলের সম্মুখে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হইল। তারপর আপন প্রতিজ্ঞামত বিভীষণকে লঙ্কার রাজসিংহাসনে বসাইয়া রামচন্দ্র রাক্ষসরাজের 'পুষ্পকরথ' নামক বিমানরত্নে আরোহণ করিয়া অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন।

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা ।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥"

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আজকাল আমরা যেমন আকাশে ব্যোমযান উড়িতে দেখি রাবণ রাজার পুষ্পকরথও কতকটা সেই ধরণেরই ছিল। রাম ও সীতাকে লইয়া পুষ্পকরথ আকাশের উপর মেঘের ভিতর দিয়া উড়িয়া চলিল। বহুকাল পরে সাক্ষাৎ, রাম ও সীতা দু'জনে নির্জ্জনে মনের সুখে গল্প আরম্ভ করিলেন। নীচে মহাসাগর, তাহার মধ্যে এক স্থানে রামের সুবিস্তৃত সেতু, মনে হইতেছিল যেন শরতের নির্ম্মল আকাশের মাঝে সীমাহীন ছায়াপথ অনন্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। রাম বলিতেছিলেন, "এই সমুদ্র পূর্ব্বে এত বড় ছিল না, আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ সগররাজার সন্তানেরা যজ্ঞের অশ্ব খুঁজিবার জন্য পাতালে যাইবার সময় খনন করিয়া সাগরের কলেবর এত বাড়াইয়াছে।" মহাসমুদ্রের মাঝে কোথাও তিমিমাছ মুখে করিয়া জল লইয়া আবার সেইজল উর্দ্ধদিকে নিক্ষেপ করিতেছে, দেখিয়া মনে হয় যেন 'চলন্ত ফোয়ারা'। কোথাও জলহস্তী এক একবার তাহার মাথা উঠাইয়া জল লইয়া খেলা করিতেছে; কোথাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাপ সমুদ্রের তরঙ্গের সঙ্গে উপরে উঠিতেছে আবার নামিতেছে; কোথাও বা অসংখ্য প্রবাল জলে ভাসিতেছে। অচিরে তাঁহারা তীর দেখিতে পাইলেন, বহু দূর হইতে মহাসমুদ্রের ওপারে তাল ও তমাল বনে পরিশোভিত নীলবর্ণ বেলাভূমি লৌহচক্রের একটা সূক্ষ্ম কালো রেখার মত দেখাইতেছিল। সাগর পার হইয়া ব্যোমযান অতিবেগে পৃথিবীর উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল, পিছনে চাহিয়া তাঁহাদের মনে হইল যেন সমুদ্রের মধ্য হইতে পৃথিবী উঠিয়া আসিতেছে। সে ব্যোমযানের জানালাও ছিল, সীতাদেবী সে জানালার ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া মেঘ ধরিতেছিলেন, আর মনে হইতেছিল যেন মেঘেরাও আদর করিয়া তাঁহার সে কুসুম-কোমল হাতে বিদ্যুতের বালা পরাইয়া দিতেছিল। ব্যোমযান আরও অনেকটা পথ অতিক্রম করিল, তখন সব পরিচিত স্থান রামচন্দ্র দেখিতে পাইলেন। যেখানে সীতার অন্বেষণে প্রথম নূপুর দেখিতে পাইয়া দুইভাই

মৃতপ্রায় প্রাণে জীবন পাইয়াছিলেন, সেই স্থান অতি আবেগ ভরে রামচন্দ্র সীতাকে দেখাইলেন ; এই সমস্ত জায়গায় তাঁহার বিরহে যে কি কষ্টে রামচন্দ্রের দিন কাটিয়াছিল, সবই সীতাকে বলিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে আবার গোদাবরী পার হইয়া তাঁহারা যখন পঞ্চবটীর উপর আসিয়া পড়িলেন, সে পঞ্চবটীর মধুময় স্মৃতি একে একে তাঁহাদের মনে পড়িতে লাগিল। সীতাদেবী স্বহস্তে যে সব বৃক্ষে জল দিতেন, যে বেতের কুটীরে সীতার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া রামচন্দ্র কখন কখন নিদ্রা যাইতেন, যে সব হরিণশাবকেরা সীতার হাতে না হইলে আর কাহারও হাত হইতে ঘাস খাইত না, সেই সমস্ত পুনরায় দেখিতে পাইয়া দুজনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পঞ্চবটীর পর অনেক মুনিঋষিদের তপোবন আরম্ভ হইল। যিনি কেবল ভ্রূকুটী করিতেই নহুষ ইন্দ্রত্বপদ হারাইয়াছিলেন প্রথমেই সেই অগস্ত্য মুনির আশ্রম ; তারপর শাতকর্ণির আবাস। রাম বলিলেন, "এই শাতকর্ণির তপোবন এখন উপবনে পরিণত হইয়াছে। অপ্সরাদের ছলনায় তপস্যা ছাড়িয়া মুনি এখন অপ্সরা লইয়া মাতিয়া রহিয়াছেন। এখন যে একটী সুমিষ্ট গীতবাদ্যের ধ্বনি আমাদের বিমানের দোতলার ছোট ঘরটীতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এ সেই শাতকর্ণিরই আমোদ-ভবন হইতে আসিতেছে। তারপর আরও কয়েকটি তপোবন অতিক্রম করিয়া তাঁহারা গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগে আসিলেন। এই প্রয়াগ তখনকার সময়েও মহাতীর্থ ছিল। তারপর তাঁহারা সরযূনদীর উপর দিয়া অযোধ্যায় আসিতে আসিতে দেখিতে পাইলেন, নগরের বাহিরে বিস্তর সৈন্য সামন্ত সজ্জিত রহিয়াছে। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, হনুমানের মুখে তাঁহাদের আগমন সংবাদ পাইয়া নিশ্চয়ই তাঁহার সর্ব্বত্যাগী ভাই ভরত তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছেন। অযোধ্যায় আসিবামাত্র পুষ্পকরথ আপনিই নীচে নামিল ; প্রজারা ত' পূর্ব্বে এ রকম বিমান কখনও দেখে নাই, তাহারা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। পুষ্পকরথ ভূমি স্পর্শ করিবামাত্র রামচন্দ্র সুগ্রীবের হাত ধরিয়া রথ হইতে নামিয়া প্রথমেই কুলগুরু বশিষ্ঠের পদধূলি গ্রহণ করিলেন, তারপর পরমস্নেহে ভরত ও শত্রুঘ্নকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। তখন

সকলে মিলিয়া সীতাদেবীকে প্রণাম ও পরস্পর অভিবাদনাদি সারিয়া লইয়া রথে আরোহণ করিয়া অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী উপবনে কয়েকদিন বাস করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। রামচন্দ্র আসিবেন বলিয়া স্বয়ং শত্রুঘ্ন তাঁহার জন্য সে বৃহৎ উপবনটি অতি দক্ষতার সহিত সাজাইয়া তাহাতে রামচন্দ্র ও তাঁহার সহচর অনুচরদের থাকিবার জন্য সুন্দর সুন্দর পট ভবন নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

উপবনে আসিয়াই তাঁহারা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে প্রণাম করিতে গেলেন। আজ চৌদ্দ বৎসর কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহাদের নয়ন অন্ধ-প্রায় হইয়া গিয়াছিল। রামলক্ষ্মণ যখন তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন, তাঁহারা চেষ্টা করিয়াও ভাল করিয়া পুত্রমুখ দেখিতে পাইলেন না, গায়ে হাত বুলাইয়া স্পর্শসুখই কেবল অনুভব করিলেন। আজ আর তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই। তারপর সীতা আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন, তাঁহারাও তাঁহাকে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়া আপনাদের কাছে বসাইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের দিন আসিল। প্রথমে জননীদের আনন্দাশ্রুতে, পরে নানা তীর্থের পবিত্রজলে রামচন্দ্রের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তারপর তিনি সসৈন্যে অযোধ্যায় শোভাযাত্রা করিলেন, ভরত তাঁহার মস্তকের উপর রাজছত্র ধরিয়াছিলেন, আর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন দুজনে দুই পার্শ্বে চামর করিতেছিলেন। সীতা দেবী আর একটী ক্ষুদ্র রথে তাঁহার পশ্চাতে চলিলেন। অযোধ্যার সেদিন রূপ যেন আর ধরে না, শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যার প্রাসাদে আসিয়া প্রথমেই রাজা দশরথের গৃহে প্রবেশ করিলেন। পিতা নাই, তিনি পিতার তৈলচিত্র ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কৈকেয়ীর চরণধূলি মস্তকে লইলেন। তাঁহার সরল নম্র ব্যবহারে কৈকেয়ীর সঙ্কোচপূর্ণ ভাব অনেকটা কাটিয়া গেল। এদিকে, বানরদের লইয়া বড় মজা হইল। বেচারীরা বনজঙ্গলেই চিরকালটা কাটাইয়াছে, সভ্যতা যে কি বস্তু তাহা তাহারা জানিত না। অযোধ্যায় আসিয়া তখনকার সময়ের আধুনিক দ্রব্যাদির ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের মাথা ঘুরিয়া গেল। প্রায় দুই সপ্তাহ অযোধ্যায় থাকিয়া তাহারা বিদায়

লইল। যাইবার সময় সীতা দেবী স্বহস্তে সকলকে অনেক রকম উপহার দিলেন।

রাম রাজা হইলেন। তাঁহার সুশাসনের গুণে প্রজাদের আর সুখের সীমা নাই, এখনও লোকে আদর্শ রাজার নাম করিতে হইলে রামের নামই করিয়া থাকে। ক্রমে জানিতে পারা গেল সীতাদেবী গর্ভবতী। একদিন রাম নির্জ্জনে সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আজকাল তাঁহার কি ভাল লাগে। সীতা বলিলেন, "তপোবন দেখিয়া বেড়াইতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে।" শীঘ্রই তাঁহার বাসনা পূরণ করিবেন বলিয়া রামচন্দ্র অযোধ্যানগরীর শোভা দেখিবার জন্য তাঁহাদের গগনস্পর্শী প্রাসাদের ছাদে উঠিলেন। যেদিকেই চাহেন, সেদিকেই যেন একটা সজীবতা, রাজপথের দুইদিকে দোকানের শ্রেণী, সরযূনদীর বক্ষে শত শত সমুদ্রগামী জাহাজ, নগরের উপকণ্ঠে কত সুসজ্জিত উপবন, নরনারীরা বেড়াইতেছেন। এ সকল দেখিয়া রামচন্দ্র বেশ আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহার পার্শ্বে ভদ্র নামক একজন অনুচর ছিলেন, রামচন্দ্র তাঁহার সহিত নগর সম্বন্ধে দু'একটা কথা কহিতেছিলেন, এক সময়ে সহসা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন, যে লোকে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কি বলে। ভদ্র বলিলেন, "মহারাজ! আপনার সকলেই প্রশংসা করিয়া থাকে কিন্তু—" "কিন্তু কি?" রামচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন, আবার বলিলেন, "কি বলিবে বল, ভয় কি?" ভদ্র আর বলিবে কি, যে কথা তিনি বলিবেন, মুখ দিয়া যে সে কথা বাহির করাই যায় না। কিন্তু রাম ছাড়িলেন না। তখন বাধ্য হইয়া ভদ্র বলিলেন, "কেহ কেহ বলে, রাণীমা ছিলেন রাবণের ঘরে তাঁহাকে আবার গ্রহণ করা শ্রীরামচন্দ্রের উচিত হয় নাই।" "বটে? প্রজারা এই কথা বলে নাকি?" বলিয়া রামচন্দ্র স্থির থাকিতে পারিলেন না, সূর্য্যবংশে কলঙ্ক! তিনি তখনই স্থির করিয়া ফেলিলেন, যার জন্য বংশে অপযশ সেই সীতাকে ত্যাগ করিবেন; কথাটা ভাবিতেও তাঁহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল, কিন্তু কি করিবেন কর্ত্তব্য ত সকল সময়ে মধুর হয় না।

নীচে নামিয়া রামচন্দ্র ভায়েদের ডাকাইয়া সকলকে বলিলেন,

"দেখ, এরূপ অপবাদ ভাল নয়, আমি অবশ্য নিশ্চিত জানি যে সীতার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, তাঁহার মত সতী সাধ্বী নারী সংসারে বিরল। কিন্তু লোকে যখন অন্যরূপ ভাবে তখন তাহাদের কথাটাই রহিয়া যাইবে। সকলেই জানে যে, পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে বলিয়াই মনে হয় চাঁদ কলঙ্কী, চাঁদ নিজে নির্ম্মল হলেও লোকে ত বলতে ছাড়ে না যে চাঁদ কলঙ্কী। যাহাই হউক, আমি এ অপবাদ আর বাড়াতে চাই না, আমার ইচ্ছা সীতাকে ত্যাগ করি, তোমরা কেহই একাজে বাধা দিও না।" তাঁহার কথা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত। তাঁহারা কেহই রামের কথার কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন রাম লক্ষ্মণকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া আদেশ করিলেন, 'তপোবন দেখিবার ছল করিয়া সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আইস।' লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আদেশ কখনও অন্যথা করেন নাই, আজও করিলেন না, তিনি সীতাদেবীকে তপোবন দেখাইতে যাইবার নাম করিয়া তাঁহাকে লইয়া নগরের বাহির হইয়া পড়িলেন। স্বামী যে এত শীঘ্র তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবেন, সীতা তা' স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়াই লক্ষ্মণের সহিত গল্প করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত হইল, ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া তিনি মনে মনে ভগবানের নিকট রামচন্দ্রের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহারা ভাগিরথীর তীরে আসিয়া রথ হইতে নামিয়া নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া বাল্মীকির তপোবনে আসিলেন। এইবার লক্ষ্মণের মহা সমস্যা। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে কোনও গতিকে রামচন্দ্রের আদেশ সীতাদেবীকে শুনাইয়া ফেলিলেন। সীতার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। লক্ষ্মণ বলে কি, রাম তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন! তিনি আর ভাবিতে পারিলেন না, ক্রমে চতুর্দ্দিক যেন অন্ধকার হইয়া আসিল, তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমির উপর পড়িয়া গেলেন। অতিকষ্টে লক্ষ্মণ তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন। স্বামীর এরূপ নির্ম্মম ব্যবহারেও সীতা স্বামীর দোষ দিলেন না, দোষ দিলেন আপন অদৃষ্টের, আর জন্মে নিশ্চয়ই তিনি কোন মহাপাপ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে আজ অমন সংসার, অমন স্বামী সমস্তই

তাঁহাকে হারাইতে হইল। তিনি বলিলেন, "লক্ষ্মণ, রাজাকে ব'লো যে, যদি তাঁহার সন্তান আমার গর্ভে না থাকিত তা' হইলে আমি আর এ প্রাণ রাখিতাম না। তাঁহার সন্তানের মুখ চাহিয়াই এ দারুণ বিচ্ছেদ আমায় সহ্য করিতেই হইবে। পূর্ব্বে তপস্বীরাই আমাদের শরণাপন্ন হইত, আর আজ আমিই তাঁদের শরণার্থিনী ? কি ভাগ্য লইয়াই জন্মিয়াছিলাম ! কিন্তু হে ভগবান, পরজন্মে যদি আবার নারী হইয়াই জন্ম গ্রহণ করি, যেন রামচন্দ্রই আমার স্বামী হন, আর যেন কখনও আমাদের বিচ্ছেদ না ঘটে। লক্ষ্মণ, আমি আর রাজরাণী নই, তবু ত আমি তাঁরই রাজ্যে বাস করিতেছি, আমায় স্ত্রীরূপে না হউক, যেন সামান্যা দীনা হীনা অনাথা প্রজা বলিয়াও মাঝে মাঝে তিনি আমার খোঁজ খবর নেন।" আজ কার মুখে কি কথা ! অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস ! লক্ষ্মণ আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন অবশ হইয়া আসিল, তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সীতাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। যত দূর দৃষ্টি যায় সীতা নিষ্পলকনেত্রে লক্ষ্মণকে দেখিতে লাগিলেন, তারপর যখন আর দেখা গেল না, দুঃখে ভয়ে বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

সীতার কাতর ক্রন্দনধ্বনি সে নির্জ্জন নিস্তব্ধ বনের মাঝে প্রতিধ্বনিত হইয়া একটা করুণ সুরের সৃষ্টি করিল। যে সব ময়ূরেরা মনের সুখে নৃত্য করিতেছিল, তাহারা থামিয়া পড়িল; হরিণ তাহার তৃণ ভক্ষণে বিরত হইল; বনের পশু পক্ষী সকলেই যেন সীতাদেবীর শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। অদূরে মহামুনি বাল্মীকি তাঁহার কুশকাষ্ঠ আনিবার জন্য যাইতেছিলেন, সহসা স্ত্রীলোকের কাতর ক্রন্দন তিনি শুনিতে পাইলেন, রোদনের অনুসরণ করিয়া যাইয়া দেখেন—সীতা। সীতাও সম্মুখে মহর্ষিকে দেখিয়া কোনপ্রকারে তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। মহর্ষি বলিলেন, "মা, তুমি সুপুত্রের জননী হও, আমি যোগবলে তোমার সমস্ত কথাই জানিতে পারিয়াছি, রামচন্দ্র জ্ঞানী লোক হইয়াও অকারণে কেবল দুষ্টলোকের অপবাদে তোমায় ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছেন। যা হউক, মা, তোমার শ্বশুর রাজা দশরথ আমার পরম বন্ধু ছিলেন, তোমার

পিতা রাজর্ষি জনকও আমায় যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। তোমার ভয় কি, তুমি আমার আশ্রমেই থাক; এখানে তোমার সঙ্গিনীরও অভাব হইবে না, মুনিকন্যারা সকল সময়েই তোমার সাথে সাথে থাকিবে। তোমার সন্তান হইলে আমরা সকলেই লালন পালন করিব, আমার আশ্রম ত তোমার বাপের বাড়ী, মা আমার।" তাঁহার কথা শুনিয়া সীতাদেবী কতকটা আশ্বস্তা হইলেন, তারপর তাঁহার সহিত তাঁহার আশ্রমে গেলেন। সেখানে মুনিকন্যারা তাঁহাকে পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইলেন। সীতা স্নান করিয়া তাঁহাদেরই মত বল্কল পরিলেন, তাঁহাদেরই মত ফলমূল খাইয়া পর্ণকুটীরে মৃগচর্ম্মের শয্যায় শয়ন করিলেন। এইভাবেই সীতার দিন কাটিতে লাগিল।

এদিকে লক্ষ্মণের মুখে সীতার সমস্ত কথা শুনিয়া রামচন্দ্র আর অশ্রুসংযত করিতে পারিলেন না। লোকনিন্দার ভয়েই তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাই বলিয়া ত আর মন হইতে তাঁহাকে বিসর্জ্জন করেন নাই, সীতার মুখখানি যে তাঁহার হৃদয়ে অহর্নিশি জাগিতেছে। রাম এবার রাজকার্য্যে মন দিলেন,অনেকেই তাঁহাকে আবার বিবাহ করিতে বলিয়াছিল, কিন্তু রাম কিছুতেই রাজী হয়েন নাই। যজ্ঞের সময় সস্ত্রীক যজ্ঞ করিতে হয় বলিয়া তিনি সীতার স্বর্ণপ্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া আপনার বামপার্শ্বে বসাইয়া যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সীতার নিকট যখন এ সংবাদ গেল, তিনি অত দুঃখেও কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাক্ষসরাজ রাবণ নিহত হইবার পরও রাক্ষসদের অত্যাচার একেবারে গেল না। লবণ নামে এক রাক্ষস মুনিঋষিদের যাগযজ্ঞে বাধা জন্মাইতে লাগিল। তপস্বীরা তখন দেশের রাজা রামচন্দ্রের নিকট খবর পাঠাইলেন। তাঁহারা আরও বলিয়া দিলেন যে লবণ রাক্ষসের এক দুর্জ্জয় শূল আছে, যতক্ষণ সে শূল তাহার হাতে থাকিবে, কেহই তাহাকে মারিতে পারিবে না। রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে লবণবধ করিতে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। শত্রুঘ্ন সৈন্য সামন্ত লইয়া চলিলেন। পথে যেদিন তিনি বাল্মীকি মুনির অতিথি হইলেন, সেই রাত্রেই জনকনন্দিনী একেবারে দুইটি পুত্র প্রসব করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র হইয়াছে শুনিয়া শত্রুঘ্ন অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন।

সকাল হইতেই শত্রুঘ্ন লবণ রাক্ষসের সন্ধানে বাহির হইলেন। ভাগ্যক্রমে তিনি যেখান দিয়া যাইতেছিলেন, রাক্ষসও ঠিক সেই পথ দিয়াই বন হইতে অনেক পশু ধরিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন তাহার হাতে সে দুর্জ্জয় শূল ছিল না। শত্রুঘ্ন দেখিলেন এই সুযোগ, তিনি অমনি তাহার সম্মুখে গিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। রাক্ষস বড় বড় গাছ আর পাথর লইয়া শত্রুঘ্নকে মারিতে আসিল, কিন্তু শেষে শত্রুঘ্নের শরেই তাহাকে প্রাণ হারাইতে হইল। মুনিঋষিরা শত্রুঘ্নকে অত্যন্ত সম্মান দেখাইয়া তাঁহাকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও তাঁহাদের আশ্রমে অতিথি হইয়া থাকিতে অনুরোধ করিলেন। শত্রুঘ্ন সেখানে দিনকতক থাকিয়া সেখানকার শোভায় এমন মুগ্ধ হইলেন যে যমুনার তীরে তিনি এক নগর নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিলেন। তাহার নাম হইল মথুরা।

কয়েক বৎসর পরে শত্রুঘ্ন যখন অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন, রামচন্দ্র তাঁহার যথোচিত অভিনন্দনের ব্যবস্থা করিলেন। শত্রুঘ্ন রামচন্দ্রকে সমস্ত কথাই বলিলেন, বলিলেন না কেবল সীতার পুত্রপ্রসবের কথা। বাল্মীকিমুনির নিষেধ ছিল। এইরূপে দিন যাইতে লাগিল, একদিন

রামচন্দ্র সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে প্রাসাদের দ্বারদেশে এক মৃতশিশুপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া এক ব্রাহ্মণ উচ্চৈঃস্বরে শোক করিতে করিতে বলিতেছিল, "হায়, দশরথ যখন রাজা ছিলেন, আমরা কি সুখেই ছিলাম, আর রামের রাজত্বে আমাদের কি দুর্দ্দশা! রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, কথাটা মিথ্যা নয়।" শ্রীরামচন্দ্রও ব্রাহ্মণের কথা শুনিতে পাইতেছিলেন, তিনি তখনই ব্রাহ্মণকে নিকটে ডাকাইয়া তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত কথাই শুনিলেন। মনটা তাঁহার অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। তিনি যমকে জয় করিয়া ব্রাহ্মণশিশুকে ফিরাইয়া আনিবেন ভাবিলেন, তখন, তাঁহার মনে হইল কে যেন অস্পষ্টভাবে বলিতেছে, রাজ্যে বর্ণাপচার হইলেই অকালমৃত্যু ঘটে, আপনি পাপের অনুসন্ধান করুন। রামচন্দ্র ব্রাহ্মণকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া অধর্ম্মের সন্ধানে বাহির হইলেন। তাঁহার পুণ্যময় রাজ্য পাপের লেশমাত্র নাই, তবু তিনি ছাড়িলেন না, বনের মাঝে এক জায়গায় দেখিলেন এক দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী পুরুষ বৃক্ষের শাখায় পা রাখিয়া ও নিম্ন দিকে মুখ করিয়া তপস্যা করিতেছে। রামচন্দ্র তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, যে সে একজন শূদ্র, নাম শম্বুক, স্বর্গপ্রাপ্তির আশায় ঘোর তপস্যায় রত হইয়াছে। রামচন্দ্র বুঝিলেন ইহাই বর্ণাপচার অর্থাৎ যে জাতির যে কার্য্যে জন্মগত অধিকার নাই, তাহার পক্ষে সে কাজ করা পাপ। শূদ্রের পক্ষে তপস্যা করা নিষিদ্ধ, সেই জন্য তাহার পাপে তাঁহার পুণ্যময় রাজ্যেও অকালমৃত্যু দেখা দিয়াছে। তিনি বিনা দ্বিধায় শম্বুকের প্রাণবধ করিলেন। সে শূদ্র তপস্যা করিয়া যা না পাইত এখন স্বয়ং ভগবানের হাতে নিহত হইয়া অনায়াসে স্বর্গে গমন করিল। রামচন্দ্রও অযোধ্যায় ফিরিয়া দেখেন ব্রাহ্মণকুমার পুনর্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে।

এদিকে, মহামুনি বাল্মীকির আশ্রমে থাকিয়া কুশ আর লব বড় হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের বিদ্যারম্ভ হইল, মহর্ষি স্বয়ং তাঁহাদিগকে বেদপাঠ শেষ করাইয়া নিজের রচিত পবিত্র রামায়ণ গান শিখাইলেন। রামচন্দ্র যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, দেশের যত মুনিঋষি সকলেই নিমন্ত্রণ পাইলেন। মহর্ষি বাল্মীকিরও নিমন্ত্রণ আসিল।

মুনি আরও শুনিলেন যে, রামচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিবাহ না করিয়া সীতাদেবীর স্বর্ণপ্রতিমা আপনার বামপার্শ্বে বসাইয়া যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। মুনি তখন রামসীতার পুনর্মিলনের এই সুযোগ ভাবিয়া কুশ ও লবকে অযোধ্যায় যজ্ঞ দেখিবার নাম করিয়া সকলকে রামায়ণ গান শুনাইবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। কুশ ও লব দু'ভাই অযোধ্যার পথে পথে রামায়ণ গান করিয়া বেড়ান, আর যে শোনে সেই মুগ্ধ হইয়া যায়। একে বাল্মীকির ন্যায় অদ্বিতীয় কবির প্রাণের রচনা, বিষয় শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র চরিত্রকথা, তায় আবার যাহারা গায়ক তাহাদের সুমধুর কণ্ঠস্বরের তুলনা নাই, তাহাদের মত এমন স্নিগ্ধ রূপও কেহ কখনও দেখে নাই। অযোধ্যায় যেন একটা সাড়া পড়িয়া গেল। রাজার যজ্ঞের যত না আলোচনা হয়, তার অপেক্ষা অনেক বেশী আলোচনা হয় গায়কদের। ক্রমে শ্রীরামচন্দ্রও একথা শুনিলেন, তিনি অত্যন্ত উৎসুক হইয়া একদিন লবকুশকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে সভার মধ্যে গান গাহিতে বলিলেন। লবকুশের মুখে পবিত্র রামায়ণ গান শুনিয়া সকলেই একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় হইল তাঁহাদের রূপ। বয়স আর বেশ এই দুয়ের যা পার্থক্য, সে বিশেষত্ব না থাকিলে, তাঁহাদিগকে স্বয়ং রামচন্দ্র বলিয়াই ভ্রম হইত। রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে তাঁহাদের গুরুর নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে মহামুনি বাল্মীকি স্বয়ং রচনা করিয়া তাঁহাদিগকে এ গান শিখাইয়াছেন। বাল্মীকি মুনি তাঁহারই চরিত্র অবলম্বন করিয়া এমন সুন্দর গীত রচনা করিয়াছেন শুনিয়া তিনি তখনই ভায়েদের লইয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে গেলেন। মুনির সহিত কথোপকথন করিয়া রামচন্দ্র জানিতে পারিলেন যে লবকুশ তাঁহারই পুত্র। বাল্মীকি তখন রামচন্দ্রকে সীতাদেবীর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করিতে বলিলেন। রাম বলিলেন, "ভগবান্, আপনার পুত্রবধূ আমাদের সকলের সম্মুখে অগ্নি-পরীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আমার নিজের কোনও আপত্তি নাই, তবে প্রজাদের কথা স্বতন্ত্র। জানকী যদি প্রজাদের সমক্ষে আর একবার আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে পারেন তবে সকল গোলই

মিটিয়া যায়, আমি এখনই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারি।" বাল্মীকি রামচন্দ্রের কথায় স্বীকৃত হইলেন।

রামচন্দ্রের সভা আজ লোকে লোকারণ্য, সীতাদেবী কি ভাবে আপনার চরিত্রের বিশুদ্ধতা প্রমান করিবেন সকলের মুখে কেবলই সেই আলোচনা। রাজার আহ্বানে মহর্ষি বাল্মীকি সীতাদেবীকে সঙ্গে করিয়া রাজসভায় আনিলেন। সীতাদেবীর পরিধানে ঋষিকন্যাদের মত গৈরিক-বসন, আলুলায়িত কেশ, শুষ্কপবিত্র মুখমণ্ডল। তিনি পূর্ব্বে কতবার এ রাজসভায় আসিয়াছেন। কিন্তু এ আসায় আর সে আসায়! তখন তিনি ছিলেন সাম্রাজ্ঞী, কত অমূল্য অলঙ্কারে তাঁহার কমনীয় দেহ অলঙ্কৃত থাকিত, কত দাস দাসী তাঁহার সেবার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া থাকিত, আর তিনি বসিতেন তাঁহার রাজ্যেশ্বর স্বামী শ্রীরামচন্দ্রের পার্শ্বে। আর আজ তাঁহার কি অবস্থা! সেই সভাতেই তিনি ভিখারিণীর বেশে সামান্যা প্রজার ন্যায় রাজার সম্মুখে বিচারের অপেক্ষায় দণ্ডায়মানা। কখন যে কাহার ভাগ্যে কি ঘটে কিছুই বলা যায় না। সীতার অবস্থা দেখিয়া রামচন্দ্রের মর্ম্মভেদ করিয়া হাহাকার উঠিতেছিল, তিনি অতিকষ্টে আত্মসংযম করিয়া রহিলেন। বাল্মীকি মুনি সেই মহতী সভার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সকলের সম্মুখে রামচন্দ্রকে সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিতে বলিলেন। রামচন্দ্র একবার সকলের দিকে চাহিলেন, সকলেই নীরব, কেহই মহর্ষির স্বপক্ষে কোনও কথা বলিলেন না, তখন রামচন্দ্র বলিলেন, "সীতা যদি সকলের সম্মুখে আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে পারেন, আমি এখনই তাঁহাকে গ্রহণ করি।" রামের মুখে আবার পরীক্ষার কথা শুনিয়া সীতাদেবীর বক্ষপঞ্জর যেন ভগ্ন হইবার উপক্রম হইল; তিনি আর অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না, জননী ধরিত্রীর দিকে চাহিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "মাগো, যদি আমি প্রকৃতই সতী হই, যদি কখনও রামচন্দ্র ব্যতীত অন্য কাহাকেও কামনা করিয়া না থাকি, তবে আমায় তোমার ক্রোড়ে স্থান দাও মা, এ অপমান এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।"

সীতাদেবীর কথা শেষ হইতে না হইতেই, এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা

ঘটিল। সভার মধ্য হইতে ভূমি ভেদ করিয়া এক বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতিঃসম্পন্ন সিংহাসনে বসিয়া এক বিদ্যুৎবরণা দেবী উঠিলেন, আর সীতাদেবীকে ক্রোড়ে লইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে পাতালে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যাপার দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। লবকুশের 'মা মা' শব্দে সকলের যেন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল; সীতাদেবীর নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ মাত্র রহিল না।

সীতাদেবীকে হারাইয়া রামচন্দ্রের আর কোনও বিষয়ে আসক্তি রহিল না, কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে রাজ্যশাসন করিতেন। এদিকে দেবতারা দেখিলেন, রাবণবধের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরামচন্দ্রের লীলা শেষ হইয়াছে, অথচ তিনি এখনও স্বর্গে ফিরিতেছেন না, তখন অন্তক দেব মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া অযোধ্যায় রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজ! আপনার সহিত আমার কতকগুলি অতি গোপনীয় কথা আছে, কিন্তু তাহা শুনিবার পূর্ব্বে আপনাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, আমাদের কথোপকথনের সময় যদি তৃতীয় ব্যক্তি কেহ আসিয়া পড়ে, তবে আপনি তাহাকে ত্যাগ করিবেন।" রামচন্দ্র স্বীকৃত হইলেন, লক্ষ্মণ স্বয়ং দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। তখন অন্তক দেব নিভৃতে ব্রহ্মার সকল কথাই রাজাকে বলিলেন এবং আরও বলিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে স্বর্গে কাহারও সুখ নাই।

দেবতার লীলা—লক্ষ্মণ দ্বারে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মহর্ষি দুর্ব্বাসা রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। লক্ষ্মণ জানিতেন দুর্ব্বাসা যে-সে মুনি নহেন, 'রামের সহিত এখন দেখা হইবে না' শুনিলে নিশ্চয়ই শাপ দিয়া সমস্তই ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। নিয়তির বিধান অলঙ্ঘ্য ভাবিয়া তিনি রামচন্দ্রের নিকট গিয়া মহর্ষির আগমন সংবাদ দিলেন। অসময়ে লক্ষ্মণকে আসিতে দেখিয়া অন্তকদেব রামচন্দ্রকে আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রামচন্দ্র তখন আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন; একবার যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তখন সে প্রতিজ্ঞা তাঁহাকে রাখিতেই হইবে। কিন্তু লক্ষ্মণকে ত্যাগ! ভাবিতেও

তাঁহার বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইল। উপায় নাই, শেষে লক্ষ্মণকেও ত্যাগ করিলেন, লক্ষ্মণ মনের দুঃখে সরযূর পবিত্র সলিলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া সকল জ্বালার শেষ করিলেন। সীতা গেলেন, লক্ষ্মণ গেলেন, রামচন্দ্রের প্রিয়তম যাঁরা তাঁহারা সকলেই চলিয়া গেলেন আর কাহাকে লইয়াই বা তাঁর সংসার। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশকে কুশাবতীতে ও কনিষ্ঠ লবকে শরাবতীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বর্গে প্রত্যাগমন করিলেন। দেবতাদের মধ্যে আনন্দের স্রোত বহিল।

নবম পরিচ্ছেদ

সকলের জ্যেষ্ঠ মহারাজ কুশ কুশাবতীতে আপনার রাজধানী স্থাপনা করিলেন। লব প্রভৃতি অপর সাতজন সকলেই বিভিন্ন দেশে রাজত্ব পাইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা কুশকেই মান্য করিয়া চলিতেন, এবং প্রত্যেকেই মহাশক্তিশালী হইলেও কেহ কখনও আপনার সীমা অতিক্রম করিতেন না, এইরূপে রঘুর বিখ্যাত বংশ আট ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল।

অযোধ্যার আর দুর্দ্দশার সীমা নাই, রামচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের সহিত প্রজারাও অযোধ্যা ত্যাগ করিয়াছিল, অবশিষ্ট যাহারা ছিল, তাহারাও ক্রমে নূতন রাজধানী কুশাবতীতে চলিয়া গেল। অযোধ্যা জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

একদিন রাত্রে মহারাজ কুশ আপনার শয়নকক্ষে শায়িত আছেন। প্রাসাদের সকলেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, তাঁহার আর নিদ্রা আসিতেছে না। এমন সময়ে কুশ দেখিলেন, তাঁহার শয্যাগৃহে একটি রমণী-মূর্ত্তি অর্গলমুক্ত না করিয়াই প্রবেশ করিলেন। তাঁহার শুষ্ক মুখ, আলুথালু কেশ, দেখিলেই মনে হয়, তিনি অত্যন্ত মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। কুশ অবাক্। তিনি বলিলেন, "আমার এ অর্গলবদ্ধ গৃহে আপনি কি করিয়া প্রবেশ করিলেন, অথচ আপনার শরীরে ত যোগলক্ষণও কিছুই দেখিতেছি না। আপনি কে? কাহার স্ত্রী? কি জন্যই বা আমার নিকট আসিয়াছেন? আপনার যাহা বক্তব্য আমায় বলুন; রঘুবংশীয় রাজারা নারীর সম্মান রাখিতে জানে!" তখন রমণী বলিলেন, "মহারাজ! আমি অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যে দিন আপনার পিতা ভগবান্ রামচন্দ্র অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, প্রজারাও আমায় ত্যাগ করিয়াছে। একদিন যাহার ঐশ্বর্য্যের নিকট স্বর্গের অমরাবতীও পরাভব স্বীকার করিয়াছিল আজ সেই আমার অবস্থা দেখুন। পূর্ব্বে যে স্থানে শত শত অট্টালিকা আমার শোভা বিস্তার করিত, আজ তাহাদেরই ভগ্নাবশেষ আমার দুর্দ্দশার পরিচয় দিতেছে। যে সকল রাজপথে সুবেশধারী নর-নারী কত আনন্দে গমনাগমন করিত, সেই পথেই

এখন শৃগাল কুক্কুর ব্যতীত চলিবার আর পথিক নাই। যে সব রমণীয় পুষ্করিণী সুন্দরী রমণীগণের জলক্রীড়ায় মুখরিত থাকিত, সেই সব পুষ্করিণী এখন বন্য মহিষের বিশ্রামস্থান হইয়াছে। একবার দেখুন, বন্য জন্তুরা অযোধ্যার বহুমূল্য চিত্রাবলী ও মর্ম্মর প্রতিমূর্ত্তিগুলির কি দশা করিয়াছে। পূর্ব্বেকার সুশোভিত প্রমোদবন। হায়, তাহাদের কথা আর কি বলিব ? যেখানে বিলাসিনী কামিনীরা ভ্রমণ করিত, যে সকল বৃক্ষের পুষ্প আহরণ করিত, আজ সেই উদ্যানে বনের বানর রাজত্ব করিতেছে। মহারাজ, আমার দুঃখের কথা আর কত বলিব ? আপনার পূর্ব্ব-পুরুষেরা, আপনার পিতা রামচন্দ্র যে স্থানে বাস করিয়াছেন, আপনিও সেইখানেই রাজধানী স্থাপন করুন, আমারও দুঃখের অবসান হউক।"

অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কথা শুনিয়া কুশ মনে মনে ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "দেবি। আমি তোমার দুঃখ দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।" এই কথা শুনিয়া দেবী যেরূপভাবে আসিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবেই মিলাইয়া গেলেন।

পরদিবস প্রাতে মহারাজ কুশ আপনার সভাসদ্দিগকে রাত্রের সে অদ্ভুত ব্যাপার বলিলেন। তাঁহারা শুনিয়া বলিলেন, "মহারাজ, অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী যখন স্বয়ং আহ্বান করিয়াছেন, তখন আর আপনার কালবিলম্ব করা উচিত নয়, অচিরেই অযোধ্যায় যাওয়া যাক্।"

তখন অযোধ্যায় যাইবার রীতিমত উদ্যোগ আরম্ভ হইল, শীঘ্রই এক শুভদিন দেখিয়া কুশ কুশাবতী ছাড়িয়া সসৈন্যে অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন, অযোধ্যার তখনও সংস্কার কার্য্য শেষ হয় নাই বলিয়া কুশ আর নগরের মধ্যে গেলেন না, বাহিরেই শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিলেন। অযোধ্যার নষ্টশ্রী আবার ফিরিয়া আসিল, শিল্পীদের নিপুণতা দেখিয়া কুশ সন্তুষ্ট হইলেন। তারপর এক শুভ দিনে অসংখ্য পশু বলি দিয়া বাস্তুদেবতার পূজা করাইয়া কুশ পিতৃপিতামহের রাজধানী অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে আমোদ-প্রমোদে অযোধ্যা মুখরিত হইয়া উঠিল।

ক্রমে বসন্তকাল আসিল, মহারাজ কুশ অন্তঃপুর-সুন্দরীগণের সহিত

সরযূ নদীতে জলবিহার করিতে গেলেন। রমণীরা মনের আনন্দে কুশের সহিত জল লইয়া নানা প্রকার ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তারপর ঘাটে উঠিয়া কুশ দেখিতে পাইলেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে রক্ষাকবচ নাই। এই কবচটি মহামুনি অগস্ত্য রামচন্দ্রকে দিয়াছিলেন, রামচন্দ্র সযত্নে কবচটি নিজে ধারণ করিয়া রাজ্যাভিষেক করিবার সময় কুশকে অর্পণ করিয়াছিলেন। কবচটি হারাইয়া কুশের মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল, তিনি তৎক্ষণাৎ জেলে ও ডুবুরি ডাকাইয়া কবচটি তুলিতে আদেশ করিলেন। তাহারা জাল ফেলিয়া সরযূ নদী তোলপাড় করিয়া ফেলিল, কিন্তু রক্ষাকবচটি আর পাওয়া গেল না। তাহারা কুশের নিকট আসিয়া বেশ সপ্রতিভভাবেই বলিল, "মহারাজ! আমাদের যথাসাধ্য আমরা করিলাম। মনে হয় নিশ্চয়ই কুমুদনাগ আপনার কবচটি পাইয়া নিজের নিকট রাখিয়া দিয়াছে। আমরা আর কি করিব?" কুমুদনাগের এত বড় স্পর্দ্ধা, মহারাজের আভরণ চুরি! মহারাজ তৎক্ষণাৎ ধনুকে গরুড়বাণ যোজনা করিলেন। গতিক সুবিধা নয় দেখিয়া কুমুদনাগ আপন রূপসী সহোদরা কুমুদ্বতীকে লইয়া তীরে মহারাজ কুশের নিকট আসিয়া তাঁহার রক্ষাকবচ তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন, আর অনেক মিনতি করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনি ভগবান্ বিষ্ণুর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনার সঙ্গে কি আমি বিবাদ করিতে পারি? আমার এই ভগিনী বল লইয়া খেলা করিতেছিল, এমন সময়ে আপনার রক্ষাকবচটি ওরই সম্মুখে পড়িয়া যায়। ওর আর কতই বা বয়স, কবচটি পাইয়া আপনার নিকট রাখিয়া দিয়াছিল, আমায় কিছুই বলে নাই। আমাদের অপরাধ লইবেন না। আপনার কবচটি গ্রহণ করুন আর দয়া করিয়া এই ভগিনীটিকে আপনার চরণ-সেবিকা করিয়া আমাদের বংশ পবিত্র করুন।"

অচিরে কুশের সহিত কুমুদ্বতীর বিবাহ হইল। যথাসময়ে তাঁহাদের একটি পুত্র জন্মিল, কুশ তাঁহার নাম রাখিলেন অতিথি। এ দিকে স্বর্গ হইতে নিমন্ত্রণ আসিল, অসুরেরা দেবতাদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তাঁহাকে দৈত্য বিনাশ করিবার জন্য যাইতে হইবে। এরূপ

নিমন্ত্রণ সূর্য্যবংশের প্রায় প্রত্যেক রাজাই পাইয়াছিলেন, কুশও কালবিলম্ব না করিয়া দেবরাজের সাহায্য করিবার জন্য স্বর্গে গমন করিলেন। দুর্জ্জয় নামক অসুরের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ হইল, তিনি অসীম পরাক্রম দেখাইয়া দৈত্যকে বধ করিলেন বটে, কিন্তু তাহারই শেষ আঘাতে নিজেও নিহত হইলেন। সেকালেও সহমরণের প্রথা ছিল, সতীশিরোমণি কুমুদ্বতীর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছিল, তিনি জ্বলন্ত অনলে আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। শত্রু হস্তে মৃত্যু সূর্য্যবংশে এই প্রথম, সুতরাং এই সময় হইতেই রঘুবংশের অধঃপতন আরম্ভ হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

কুশের মৃত্যুর পর বৃদ্ধ মন্ত্রীরা অতিথিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অতিথি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, তিনি কখনও কাহাকেও কষ্ট দিতে পারিতেন না। তিনি রাজা হইয়া কারাগারের যত কয়েদী ছিল, সকলকে মুক্ত করিয়া দিবার আদেশ দিলেন, আবার তাহার মধ্যে যাহাদের মৃত্যুদণ্ড হইয়াছিল, তিনি তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশও প্রত্যাহার করিলেন। সে সময়ে অযোধ্যায় ধনীব্যক্তিদিগের ও বিলাসিনী নারীদের পাখী পুষিবার রীতি ছিল। তিনি দেখিলেন পিঞ্জরের মধ্যে পাখী রাখিলে তাহাদের কষ্টের সীমা থাকে না, মুক্তবাতাসে বিচরণ করা ও আপন মনে স্বাধীনভাবে গান গাহিয়া উড়িয়া বেড়াইতেই তাহাদের আনন্দ। তিনি আদেশ করিলেন, অতঃপর তাঁহার রাজ্যে কেহই পিঞ্জরের মধ্যে পাখী রাখিতে পারিবে না। রাজার আদেশে শত শত পাখী বন্ধনমুক্ত হইয়া মনের সুখে বনে চলিয়া গেল। ভার বহন করিতে জন্তুদের কিরূপ কষ্ট হয়, তাহা কল্পনা করিয়া তিনি নিয়ম করিয়া দিলেন, আর কেহ জন্তুদ্বারা ভার বহন করিতে পারিবে না। তিনি আরও আদেশ করিলেন, গাভীর দুগ্ধ প্রথমে বৎসকে উদর পূরিয়া পান করাইতে হইবে, তারপর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে কেবল তাহাই দুহিয়া লইতে পারা যাইবে, কারণ গাভীর দুগ্ধ দোহন করিয়া লইলে বৎসেরা কিছুই খাইতে পায় না। এ আদেশ যাহারা অমান্য করিবে, তিনি তাহাদের জন্য সমুচিত শাস্তিরও বিধান করিয়া দিলেন।

মহারাজ অতিথির মন্ত্রী ও সেনাপতিরা তাঁহাকে দিগ্বিজয়ে বাহির হইতে পরামর্শ দিলেন। অতিথি ভাবিলেন শত্রুই যদি জয় করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে আপনার দেহের মধ্যে যে কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপু আছে তাহাদিগকেই জয় করা উচিত। তাহা না করিয়া ঘরে শত্রু পুষিয়া রাখিয়া বাহিরের শত্রু বিনাশ করিতে যাওয়া মূর্খতা। ইহাই স্থির করিয়া অতিথি সর্ব্বপ্রকার সংযম ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ইন্দ্রিয় দমন করিয়া পরে শত্রু জয়ে বাহির

রাজা অগ্নিবর্ণকে জলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ

হইলেন। রঘুবংশীয় রাজাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারে এরূপ সাধ্য কাহার? তিনি যেখানেই যান, সেখানেই তাঁহার জয় হয়। তাঁহার এই বিশেষত্ব ছিল যে, তাঁহার নিকট যে সকল শত্রু পরাজয় স্বীকার করিতেন, তিনি তাঁহাদের সহিত কখনও দুর্ব্ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহার ও চরিত্রের মাধুর্য্যে শত্রুও মিত্রে পরিণত হইত। তাঁহার শাসনগুণে চৌর্য্য, দস্যুতা ইত্যাদি দেখা যাইত না। এইরূপে দীর্ঘকাল সগৌরবে রাজত্ব করিয়া ধার্ম্মিকবর অতিথি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নিষধকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বংশের চিরপ্রথা মত শেষ জীবন অরণ্যে কাটাইলেন।

অতিথির পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নল, নলের পুত্র নভঃ এইরূপে পরপর অনেক রাজা অযোধ্যার সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহাদের সময়ে প্রজাদের সুখে দুঃখে এক রকমে দিন গেল। তারপর রাজা হইলেন অগ্নিবর্ণ। সিংহাসনে বসিয়া অগ্নিবর্ণ প্রথম প্রথম সুশাসনে মন দিলেন। তাঁহার শাসনগুণে রাজ্যময় সুখশান্তির বাতাস বহিল, প্রজারা রাজার জয়গান করিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অগ্নিবর্ণ ভাবিলেন রাজ্যময় যখন এত শান্তি, কিছুকাল আমোদ প্রমোদে কাটান যাক। তখন মন্ত্রীদের উপর রাজ্যের সমস্ত ভার দিয়া রাজা অন্তঃপুরে সুন্দরী নারী লইয়া নৃত্যগীতবাদ্য ও নানা প্রকার বিলাসিতায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। প্রথমে সামান্য সুরাপান আরম্ভ করিয়া অবশেষে তিনি এমন মাতাল হইয়া পড়িলেন যে, মদ না হইলে তাঁহার একমুহূর্ত্তও চলিত না। নানাপ্রকার অত্যাচারে তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, বহুবিধ ব্যাধি আসিয়া দেখা দিল। চিকিৎসকেরা পরামর্শ দিলেন রাজার রাজযক্ষ্মা হইয়াছে, মদ্যপান আর চলিবে না। কিন্তু রাজার পক্ষে তখন সুরা ও নারী এদুটী পরিত্যাগ করা একেবারেই অসম্ভব। রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া চলিল, তাঁহার উত্থানশক্তি রহিত হইল, সুন্দর আকৃতি শবের ন্যায় মনে হইতে লাগিল। তখন মন্ত্রীরা পরামর্শ করিয়া অগ্নিবর্ণকে উপবনের এক নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিলেন, এবং প্রজাদিগকে জানাইলেন যে রাজার মৃত্যু হইয়াছে। অগ্নিবর্ণের তখনও

সন্তানাদি হয় নাই বলিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর বিখ্যাত রঘুবংশে বাতি দিবার আর কেহই রহিল না ভাবিয়া দেশের লোক উৎকণ্ঠিত হইলেন। মন্ত্রীরা তখন দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া ইহার পর কে রাজা হইবেন, তাহাই স্থির করিবার জন্য এক সভা করিলেন। সেই সময়ে জানা গেল অগ্নিবর্ণের এক মহিষী সন্তানসম্ভাবিতা আছেন, সুতরাং দেশবাসীরা রাজার সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত রাজমহিষীকেই সিংহাসন প্রদান করিলেন।

নলোদয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিষধ দেশের রাজা নল অতি সুপুরুষ ও ধার্ম্মিক ছিলেন। অল্প বয়সে সিংহাসনে বসিয়াও রাজা নল আলস্যবিলাসে কাল কাটান নাই। নিজের চরিত্র ত তাঁহার নির্ম্মল ছিলই, উপরন্তু তাঁহার রাজত্বের মধ্যে জুয়াখেলা, মদ খাওয়া বা অন্য কোনরূপ কদাচার করিবারও যো ছিল না। এসব নিবারণ করিবার জন্য তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন।

নলের পিতা বীরসেন তাঁহাকে বাল্যকালে অনেক রকম বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাই উপযুক্ত বয়সে রাজা নল ধর্ম্মশাস্ত্রে, নীতিশাস্ত্রে ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠেন। তাঁহার আরও একটি বিশেষ গুণ ছিল যে তিনি একজন অতি সুনিপুণ অশ্বচালক ছিলেন।

সেই সময়ে ভীম ছিলেন বিদর্ভ দেশের রাজা। রাজা ভীমের এক অত্যন্ত রূপসী কন্যা ছিলেন তাঁহার নাম দময়ন্তী। তখনকার দিনে আমাদের দেশে ক্ষত্রিয় সমাজের নারীরা পুরুষের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করিতে পারিতেন না বটে, তবে পুরুষের সম্মুখে আসিবার কিংবা সকলের সম্মুখে তাঁহার সহিত কথা কহিবার বিশেষ কোন বাধা ছিল না। রাজকুমার নল ও বিদর্ভরাজের অবিবাহিতা কন্যা দময়ন্তীর মধ্যে মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হইত। এইরূপ সাক্ষাৎ হইতে উভয়ের প্রতি উভয়ের অনুরাগের সঞ্চার হইল, অথচ সমাজের শাসনে কেহ কাহাকেও আপনার আসক্তি জানাইতে পারিলেন না।

দময়ন্তীর অতুলনীয় রূপ দেখিয়া অবধি নলের চিত্তে আর শান্তি ছিল না। রাজকার্য্যে মন লাগিত না, মৃগয়া এক রকম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। দময়ন্তীর মুখখানি ধ্যান করা ছাড়া নলের আর অন্য কাজই

ছিল না। একদিন তিনি প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া উপবনে বেড়াইতে গেলেন, যদি কোনও মতে নিজের অশান্ত মনে কিছু শান্তি পান। সেখানে গিয়া দেখিলেন কতকগুলি সারস আর তাহাদের সহিত কতকগুলি রাজহাঁস খেলা করিতেছে। অমন সুন্দর পাখী দেখিয়া নল তাহাদের নিকট যাইতে লাগিলেন, তাহারাও নল আসিতেছে দেখিয়া মানুষের ভাষায় বলিয়া উঠিল, "মহারাজ নল, আপনি আমাদিগকে বধ করিবেন না, আপনি অনবরত যাঁহার ধ্যান করিতেছেন, জগতের সেই অদ্বিতীয়া রূপসী দময়ন্তীর সহিত যাহাতে আপনার বিবাহ হয়, আমরা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি।"

রাজহংসের কথা শুনিয়া নলের মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি তখন দময়ন্তীগতপ্রাণ, হাঁসেরা তাঁহার উপকারে আসিবে কি না, সে ভাবনা তাঁহার মনে আসিল না, তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে মহারাজ ভীমের প্রাসাদে যাইতে বলিলেন। রাজহংসের দল আকাশে উঠিল আর চক্ষুর নিমেষে ভীমের উপবনে, যেখানে রাজকুমারী দময়ন্তী তাঁহার সখীদের সহিত আলাপ পরিহাস করিতেছিলেন সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল। সুন্দর হংস দেখিয়া দময়ন্তী তাহাদের একটীকে আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাহাকে আদর করিতে লাগিলেন। তখন সেই রাজহাঁস নলকে যেমন বলিয়াছিল, সেই রকম মানুষের ভাষায় বলিল, "রাজকুমারী, মহারাজ নলের নাম তুমি নিশ্চয়ই শুনিয়াছ, তিনি যে তোমায় কত ভালবাসেন, সে আর কি বলিব। তাঁর মত রাজা আর হয় না, তুমি যদি তাঁকে বিবাহ কর, লক্ষ্মীর মত তোমারও সুখের আর সীমা থাকে না।" রাজহাঁস নলের আরও অনেক গুণ বর্ণনা করিতে লাগিল, আর দময়ন্তী তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন। হংসের প্রত্যেক কথাটী তাঁহার কর্ণে যেন সুধা বর্ষণ করিতেছিল। অহর্নিশি তিনি যাঁহার ধ্যান করিতেছেন সেই নিষধপতি নল আজ উপযাচক হইয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিতেছেন, এর অপেক্ষা তাঁহার আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে। তিনি বলিলেন, "হংসরাজ, তিনিই আমার প্রভু।" রাজহাঁসেরা যাহা চাহিতেছিল, তাহা এত সহজেই সিদ্ধ হইল দেখিয়া আনন্দিত মনে তখনই নলের নিকট গিয়া

দময়ন্তীর অনুরাগের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিল। নল যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন।

রাজহাঁসেদের মুখে নিজের প্রতি নলের অগাধ ভালবাসা জানিতে পারিয়া দময়ন্তীর মন আরও অস্থির হইয়া উঠিল। নলের বিরহ তিনি যেন আর সহ্য করিতে পারিলেন না, দিন দিন তাঁহার সুন্দর দেহ মলিন হইতে লাগিল, সদাই যেন অন্যমনস্ক হইয়া থাকেন। তাঁহার এ অবসন্নতা রাজা ভীমের অগোচর রহিল না, তিনি অচিরেই তাঁহার যুবতী কন্যার বিবাহের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখনকার দিনে ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে স্বয়ংবর প্রথা খুব প্রচলিত ছিল। কন্যা অত্যন্ত সুন্দরী, বিশেষত যদি বয়ঃপ্রাপ্তা হইত রাজারা প্রায়ই তাহার স্বয়ংবর বিবাহের ব্যবস্থা করিতেন। রাজা ভীম দেশের প্রধান প্রধান নৃপতিদিগের নিকট স্বয়ংবর সভায় আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন। স্বর্গের রাজা ইন্দ্র ও তাঁহার পারিষদবর্গ এ নিমন্ত্রণে বঞ্চিত হইলেন না। দময়ন্তীর স্বয়ংবর লইয়া দেশময় একটা বিরাট সাড়া পড়িয়া গেল। কত দেশ হইতে কত যে রাজা ও রাজপুত্র বিদর্ভ দেশে আসিলেন তাহার সংখ্যা নাই। দময়ন্তীর রূপের খ্যাতি স্বর্গেও পৌঁছিয়াছিল, তাই দেবরাজও ভীমের নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়া বহু আয়াস স্বীকার করিয়া সসৈন্যে বিদর্ভদেশে আসিলেন। নলও অবশ্য এ নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন, তিনি আসিলেন সাদাসিদে পোষাকে, দেহে অলঙ্কারের নামমাত্রও ছিল না। তবু সে উন্নত বীরত্বব্যঞ্জক সুন্দর অবয়বের তুলনা ছিল না। বিদর্ভ দেশে যত দেবতারা, রাজা ও রাজপুত্রেরা আসিয়াছিলেন, নলের সহিত সামান্য তুলনা হয়, এমন সৌন্দর্য্যও কাহার ছিল না। স্বয়ং ইন্দ্রও নলের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলেন, তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, যে সভায় নল উপস্থিত থাকিবেন সে সভায় থাকিয়া তাঁহার কোনও লাভ হইবে না। নলকে সম্মুখে পাইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া অপর কাহারও গলায় বরমাল্য দিবে এমন তরুণী যে থাকিতে পারে তাহা তাঁহার বিশ্বাস হইল না, অথচ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবার কল্পনাও তিনি করিতে পারিলেন না। তিনি

তখন এক কৌশল করিলেন। তিনি জানিতেন নলের ন্যায় নিষ্কলঙ্কচরিত্র উদার মহৎ যুবক আর নাই, তাই তিনি গোপনে নলকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ নল, তুমি একবার দময়ন্তীর কাছে যাও, আমার প্রসাদে তোমায় কেহই দেখিতে পাইবে না, তুমি স্বচ্ছন্দে অন্তঃপুরে গিয়া দময়ন্তীকে বলিয়া আইস যে, দেবতারা তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি যেন আমাদেরই মধ্যে একজনকে বরণ করেন।"

দেবরাজের আদেশ অমান্য করা যায় না, নলও অন্তঃপুরে দময়ন্তীর নিকট গেলেন, ইন্দ্রের বরে তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইল না। তিনি দময়ন্তীর সম্মুখে গিয়া বলিলেন, "রাজকুমারি, আমি নল, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের দূত হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, দেবরাজের ইচ্ছা আপনি যেন তাঁহাকে কিম্বা অপর কোন দেবতাকে স্বামিত্বে বরণ করিয়া চিরকাল স্বর্গের সুখ উপভোগ করেন।" নলের মুখে এই কথা। দময়ন্তী তখনই বুঝিয়া লইলেন যে নল আজ দূত মাত্র, দেবরাজের আদেশ বহন করাই তাঁহার কার্য্য, তাই তিনি দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া স্পষ্ট অথচ সংযত ভাষায় বলিলেন, যে তিনি মনে মনে নলকেই স্বামিত্বে বরণ করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং এখন তাঁহার পক্ষে দেবতাদের কাহারও পত্নী হওয়া অসম্ভব, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া তাঁহার আশা ত্যাগ করেন।

দময়ন্তীর নিজের মুখ হইতে আপনার প্রতি এত অনুরাগ জানিতে পারিয়া নলের যেন সত্বা লোপ পাইতেছিল, তিনি জাগিয়া আছেন না স্বপ্নের ঘোরে কি শুনিতে কি শুনিতেছেন, প্রথমটা তাহাই বুঝিতে পারিলেন না। দময়ন্তীর কথাগুলি যতই মনে পড়ে, ততই তাঁহার সারা দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠে, তিনি যে ইহার কি উত্তর দিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কাহারও মুখে কথা নাই, এমন সময় সভাগৃহে তূর্য্যধ্বনি হইতেছে শুনিতে পাইয়া নলের চৈতন্য হইল, তিনি আপনার দুর্ব্বলতায় আপনি লজ্জিত হইয়া ত্বরিতপদে ইন্দ্রের নিকট ফিরিয়া গিয়া দময়ন্তী যাহা যাহা বলিয়াছিলেন সবই জানাইলেন।

সেই দিন স্বয়ংবর সভার অধিবেশন। বিদর্ভ নগর সেদিন এমন

দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভা

সুন্দর ভাবে সাজান হইয়াছিল, যে তাহার সে সৌন্দর্য্যের নিকট স্বর্গের রাজধানী অমরাবতীও হার মানিয়া যায়। রাজা ভীমের প্রাসাদের এক সুপ্রশস্ত কক্ষে মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া রাখা হইয়াছিল, এখন তাঁহার অনুরোধে সমস্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সেই সুসজ্জিত মঞ্চের উপর আপনাপন আসনে গিয়া বসিলেন। মঞ্চের অপর একপার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট আসনে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরী রাজকুমারী দময়ন্তী সখীদের সহিত আসিয়া বসিলেন। তখন সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমেই মঙ্গলগীত; তারপর স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের যত রাজারা আসিয়াছিলেন বন্দীগণ একে একে উপস্থিত সকলের নাম নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদের প্রশংসাসূচক গান গাহিলেন। তারপর আপনার এক বিশ্বস্তা সখীর সহিত দময়ন্তী বরমাল্য হস্তে লইয়া স্বামী নির্ব্বাচন করিতে উঠিলেন। তিনি দেখিলেন সম্মুখের কতকগুলি আসনে কয়েকটী সুন্দর আকৃতির পুরুষ বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই আকার, বেশ, ভূষা সমস্ত একই প্রকারের, ভাল করিয়া দেখিলেও এককে অপর হইতে চেনা যায় না। লজ্জায় তাঁহার চরণ কাঁপিতেছিল, তবু তিনি আর একবার সচকিতে সেই পুরুষদের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন নলের মতই সকলের চেহারা। বড় আশা করিয়াই তিনি নলের গলায় বরমাল্য দিবার জন্য উঠিয়াছিলেন এখন তাঁহাদের মধ্যে কে যে প্রকৃত নল তাহা চিনিয়া লইবার সাধ্য তাঁহার ছিল না। নিরূপায় হইয়া দময়ন্তী মনে মনে বিপদের কাণ্ডারী শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দয়াময়, যদি আমি প্রকৃতই সতী হই, যদি আমি কায়মনোবাক্যে কেবল নলকেই কামনা করিয়া থাকি, তবে যেন অচিরেই এ সমস্যার সমাধান হয়।" করুণাময়ের আশীর্ব্বাদে দময়ন্তী দেখিতে পাইলেন নলের মত রূপধারী কতকগুলি রাজপুত্র বসিয়া আছেন বটে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাঁহাদের শরীর ভূমিস্পর্শ করিয়া নাই; তাঁহাদের মধ্যে কেবল একজন যা মঞ্চের উপর রীতিমত উপবেশন করিয়া আছেন। তখন দময়ন্তীর আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, নলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট রাজপুত্রেরা, যাঁহারা ভূমিস্পর্শ না করিয়াই মঞ্চের

উপর বসিয়া আছেন তাঁহারা দেবতা ব্যতীত আর কেহ নহেন, মায়ার ছলনায় নলের ন্যায় রূপ ধরিয়া কেবল তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য সম্মুখে রহিয়াছেন, আর যিনি ভূমি স্পর্শ করিয়া নত মস্তকে বসিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছেন, তিনিই তাঁহার স্বামী প্রকৃত নল। নলকে চিনিতে পারিয়া দময়ন্তী তখনই সখীকে লইয়া নলের সম্মুখে গিয়া প্রফুল্ল দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া বরমাল্যটি তাঁহার গলায় অর্পণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। দেবতারা নিরাশ হইলেও নলকে যথেষ্ট সম্মান্ করিতেন, তাঁহার দম্ভহীন বিনয়-নম্র-ব্যবহার সকলেরই চিত্ত জয় করিয়া রাখিয়াছিল, সুতরাং নলের সৌভাগ্যে হিংসা করা দূরে থাকুক তাঁহারা তাঁহাকে রীতিমত আদর আপ্যায়ন প্রদর্শন করিয়া স্বর্গের দিকে প্রস্থান করিলেন। নলও যথোচিত সমারোহ করিয়া চির-আকাঙ্ক্ষিতা পত্নীকে লইয়া আপনার দেশে চলিয়া গেলেন। সেখানে আর আনন্দের সীমা রহিল না। কেহ কেহ মন্দিরে মন্দিরে দেবার্চ্চনার ব্যবস্থা করিলেন, আর কেহ কেহ মদ খাইয়া কোলাহলে নগর মুখরিত করিয়া তুলিল। নানাপ্রকার ক্রীড়াকৌতুকে ও আমোদ-প্রমোদে রাজার বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নল ও দময়ন্তী বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের বিবাহিত জীবন যে খুবই সুখে কাটিবে তাহার আর সন্দেহ কি। বসন্তের আগমনে নল দময়ন্তীকে লইয়া রাজধানী ছাড়িয়া বনবিহারে গমন করিলেন।

এদিকে ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা স্বয়ংবর সভায় দময়ন্তীকে লাভ করিতে না পারিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় পথে কলির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। কলির মত হিংসুক ও ঈর্ষ্যাপরায়ণ দেবতা আর দু'টি নাই, সে নিজে কখনও কাহারও ভাল ত করেই নাই, কাহারও ভাল দেখিতে পর্য্যন্ত পারে না। পথে কলিকে দেখিয়া ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন সময় কোথায় যাচ্ছ কলি?" কলি বলিল, "দেবরাজ, আজ যে ভোজরাজের কন্যা দময়ন্তীর স্বয়ংবর। শুনেছি নাকি তাঁর মত রূপসী এখন আর কেউ নাই, কাজেই একবার বিদর্ভ নগরে যেতে হ'চ্ছে, যদি আমারই গলায় দময়ন্তীর বরমাল্য শোভা পায়!" কলির কথা শুনিয়া দেবতারা হাসিয়া উঠিলেন। ইন্দ্র বলিলেন, "বটে, এত সাধ, ত আগে যাওনি কেন? আমরা সেখান হ'তেই আস্‌ছি, দময়ন্তী নলকে পতিত্বে বরণ করেছেন, বিবাহও হয়ে গেছে।"

ইন্দ্রের কথা শুনিয়া কলি জ্বলিয়া উঠিল, সে চীৎকার করিয়া বলিল, "স্পর্দ্ধা দেখুন, এত সব দেবতা—স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র উপস্থিত থাকৃতে দময়ন্তী বরণ কর্‌লেন কি না একটা মানুষকে, তার এ দর্প এ অহঙ্কার ভাঙ্‌তেই হবে। এতে দেবসমাজ যে কি রকম অপমানিত হয়েছে, সে আমিই বুঝ্‌তে পার্‌ছি। স্বামিস্ত্রীতে কেমন এক সঙ্গে থাকৃতে পারে সে আমি দেখে নেব, এর ফল ভুগ্‌তেই হবে।"

কলির আর স্বর্গে যাওয়া হইল না, সে একেবারে নলের রাজধানী নিষধ নগরেই চলিল। সেখানে গিয়া কলি কেবল নলের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল যাহাতে নলের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার

সর্ব্বনাশ করিতে পারে। নল তাঁহার অভ্যাসমত একদিন বনবিহারে গমন করিয়াছেন, এমন সময় সুযোগ বুঝিয়া কলি তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল। কলির প্রভাব বড় সামান্য নয়, নলের শরীরে প্রবেশ করিবার পর হইতেই নলের যেন কেমন দুর্ম্মতি হইল। এতদিন যে সব কাজ তিনি পাপ বলিয়া মনে করিতেন, সেই সব কাজ করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে যেন একটা অদম্য বাসনা জাগিয়া উঠিল। যে নল রাজা হইয়াই আপন রাজত্ব হইতে বারবণিতা, জুয়াখেলা প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়া উঠাইয়া দিয়াছিলেন, সেই নল প্রিয়বন্ধু পুষ্করের আহ্বানে পাশাক্রীড়ায় মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি যে যে বস্তু পণ রাখেন, তাহা আর ফিরিয়া পান না। কলির প্রভাবে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল, তিনি পুষ্করের নিকট একে একে আপনার রত্ন, অলঙ্কার, রাজ্য, সম্পদ্ সমস্তই হারাইয়া পথের ভিখারী হইয়া পড়িলেন। ভাগ্যের যে এত বড় বিপর্য্যয় কখনও হইতে পারে, নল তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই; তাহার উপর বন্ধুরূপে গুপ্তশত্রু পুষ্করের তাড়না তাঁহার অসহ্য হইল, তিনি পতিব্রতা স্ত্রীকে লইয়া রাজ্য হইতে এক বস্ত্রে বাহির হইয়া রোদন করিতে করিতে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। যাহারা পূর্ব্বে নলের নিকট হইতে অশেষ প্রকারে সাহায্য লাভ করিয়াছিল, বনে আসিবার সময় তাহারা নলের দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াও সামান্য অন্ন, বা জল দিয়াও তাঁহার উপকার করিল না,—সংসারের ইহাই বৈচিত্র্য। একদিন যাঁহারা প্রাসাদের সুরম্য গৃহে কুসুমকোমল শয্যায় শয়ন করিতেন, তাঁহাদিগকে আজ শয়ন করিতে হইল বৃক্ষের তলে; চতুঃষষ্টি ব্যঞ্জনেও যাঁহাদের রসনার তৃপ্তি হইত না, তাঁহারা রহিলেন অনাহারে। দৈব যখন বিরূপ হয় মানুষের তখন আর কষ্টের সীমা থাকে না। দৈবের বিড়ম্বনায় নল আপনার পরিধেয় বস্ত্রখানিও হারাইয়া ফেলিলেন, তখন স্বামীস্ত্রীতে নিরুপায় হইয়া একই বস্ত্রে কোনও ক্রমে লজ্জা নিবারণ করিয়া বনের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহারা কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কোথায় আশ্রয় পাইবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, ভবিষ্যৎটা তাঁহাদের সম্মুখে ঘোর অন্ধকারময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ বনে বনে ঘুরিয়া দময়ন্তী অত্যন্ত

পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া দুইজনে এক বৃক্ষের তলায় বিশ্রাম লইবার জন্য বসিয়া পড়িলেন। দময়ন্তী এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সেইখানেই অচিরে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কলির প্রভাবে নলের তখন বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তিনি ভাবিলেন, এই ঘোর বিপদের সময় সঙ্গে নারী থাকিলে হয়ত তাঁহাকে এর অপেক্ষা আরও অনেক কষ্ট পাইতে হইবে, তার চাইতে দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু, তিনি ছাড়িয়া গেলে দময়ন্তীর যে কি দশা হইবে, সেটা তখন আর তাঁহার মনে আসিল না। যে বস্ত্রখানি তাঁহারা দুইজনে পড়িয়াছিলেন, নল অতি সাবধানে তাহা অর্দ্ধেক করিয়া নিদ্রিতা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কতকদূর যাইয়া নল দেখিলেন, বনের একাংশে আগুন লাগিয়াছে, আর তাহারই মধ্য হইতে কে যেন কাতর কণ্ঠে রোদন করিতেছে। নল অমনি উচ্চৈঃস্বরে, "ভয় নাই, ভয় নাই" বলিয়া যেখান হইতে ক্রন্দনের স্বর আসিতেছিল, সেইখানে শীঘ্র যাইয়া দেখেন এক কর্কোটক সাপ, জ্বলন্ত আগুনে পড়িয়া গিয়াছে, তাহার এমন ক্ষমতা নাই যে উঠিয়া সরিয়া যায়। সাপের দুরবস্থা দেখিয়া নলের বড় মায়া হইল, তিনি অমনি তাড়াতাড়ি নিকটে যাইয়া সাপটিকে আগুন হইতে তুলিয়া নানা প্রকারে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইলেন। কতকটা সুস্থ হইয়া কর্কোটক সাপ নলকে বলিল, "নল, তুমি আজ আমার প্রাণদান করিলে, আমারও যতদূর সাধ্য তোমার উপকার করিব।" এই বলিয়া সাপ তাহার মুখ হইতে খানিকটা বিষ বাহির করিয়া সে বিষ নলের দেহে মাখাইয়া দিয়া তাঁহাকে একখানি বস্ত্র দিল। সে বিষ ও বস্ত্রের গুণে নলের শরীর কলির দুরন্ত প্রভাব হইতে একেবারে মুক্ত হইল, তিনি যেন নূতন মানুষ হইয়া উঠিলেন। তখন কর্কোটক সাপ তাঁহাকে রাজা ঋতুপর্ণের নিকটে গিয়া থাকিতে বলিয়া কোথায় চলিয়া গেল তাহাকে আর দেখা গেল না। নলও কয়েকদিবসের মধ্যে ঋতুপর্ণ রাজার নিকট গিয়া আপনার প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া তাঁহার নিকটে আশ্রয় চাহিলেন। তাঁহার অশ্বচালনায় আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে শুনিয়া

অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ঋতুপর্ণ নলকে তাঁহার প্রধান সারথী নিযুক্ত করিলেন।

এদিকে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দময়ন্তী দেখিলেন পার্শ্বে স্বামী নাই। তিনি আশে পাশে অনেক খুঁজিলেন, কিন্তু নলকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তখন দময়ন্তী বেশ বুঝিতে পারিলেন, এবার প্রকৃতই তাঁহার কপাল ভাঙিয়াছে, নল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সেই নির্জ্জন নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে দময়ন্তী একা, যিনি সারা জীবন রাজপ্রাসাদ ও উপবনে কাটাইয়াছেন, অরণ্য যে কি বস্তু কখনও জানেন নাই, তিনি এরূপ গহন বনের মাঝে নিঃসহায় অবস্থায় কতক্ষণ থাকিতে পারেন। নিকট দিয়া হিংস্র জন্তুরা যাতায়াত করে তাহা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ চমকাইয়া উঠে। তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইল যে নল একজন ধার্ম্মিক লোক হইয়াও বিনা অপরাধে তাঁহার ন্যায় স্বাধ্বী স্ত্রীকে এই নিবিড় বনের মধ্যে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তবু তিনি স্বামীর দোষ দিতে পারিলেন না, দোষ দিলেন কলির। কলি শত্রুতাচরণ না করিলে কখন কি অমন স্বামী, দুর্ব্বলের রক্ষক বলিয়া যাঁহার নাম প্রসিদ্ধ,—তিনি কি এমন কাজ করিতে পারেন। কি করিবেন, কোথায় যাইবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া দময়ন্তীর মস্তক ঘুরিয়া আসিল, তিনি যেন জ্ঞানহারা হইয়া আপন মনে রোদন করিতে লাগিলেন। কখনও বা হরিণ দেখিয়া তাহাকেই বলেন, “হরিণ, তুমি কি আমার স্বামীকে ওদিকে যাইতে দেখিয়াছ ?” কখনও বা অশোক বৃক্ষ দেখিয়া তাহারই নিকটে গমন করিয়া বলেন, “অশোক গাছ, অশোক গাছ, তোমার নিজের শোক নাই বলিয়াইত তুমি অশোক; আমায় তোমার মত শোকহীন করিয়া দাও, তোমায় আমি রোজ পূজা করিব, তুমি আমার স্বামীর সন্ধান বলিয়া দাও। আমি যে একেবারে অনাথিনী, সব থেকেও আজ আমার কেহ নেই।” কোথায় আর যাবেন, যেদিকে দু’চক্ষু যায়, সেই দিকেই দময়ন্তী চলিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চলিবার পর দময়ন্তী এক মরুভূমির নিকট আসিয়া পড়িলেন, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় তাঁহার শরীর অবসন্ন, হইয়া পড়িয়াছিল আর চলিতেও পারেন না, কিন্তু কি করিবেন, চলা ছাড়া আর উপায় নাই। মরুভূমির

নিকট এক জায়গায় আবার জঙ্গল দেখিতে পাইলেন, তিনি যেমন মরুভূমি পার হইয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিবেন, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড অজগর সাপ মুখ হাঁ করিয়া তাঁহাকে গিলিতে আসিল। ভয়ে তিনি চক্ষু মুদিলেন। প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এইবার বুঝি সর্পের উদরে যান। বেশীক্ষণ তাঁহাকে আর এ ভাবে থাকিতে হইল না, ভগবানের আশীর্ব্বাদে এক ব্যাধ তখন সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল, অজগরকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়াই ছুটিয়া আসিয়া খড়্গের এক প্রচণ্ড আঘাতে তাহার প্রাণ সংহার করিল। দময়ন্তীর প্রাণরক্ষা হইল বটে, কিন্তু আবার এক নূতন বিপদ আসিয়া জুটিল। নির্জ্জন স্থানে দময়ন্তীর মত অমন সুন্দরী যুবতীকে একাকিনী দেখিয়া ব্যাধের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, সে প্রাণরক্ষা করিয়াছে এই ভাব দেখাইয়া দময়ন্তীর সহিত প্রথমে বেশ হৃদ্যতা আরম্ভ করিল, তারপর ক্রমে আপনার কুপ্রস্তাব করিয়া বসিল। যিনি রক্ষক তিনিই ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইলেন দেখিয়া দময়ন্তীর মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল; তিনি রোষকষায়িতনেত্রে ব্যাধের দিকে চাহিতেই সতীত্বের আশ্চর্য্য মহিমায় তাঁহার নয়ন হইতে অগ্নি বাহির হইয়া ব্যাধকে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। দময়ন্তী ব্যাধের কবল হইতে বাঁচিলেন বটে, কিন্তু এবার কোথায় যাইবেন সেই হইল তাঁহার ভাবনা, তাঁহার মনে হইল, এই জনবিহীন বনে একাকিনী ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তিল তিল করিয়া মরণের পথে আগাইয়া যাওয়ার অপেক্ষা অজগরের গ্রাসে পতিত হওয়াই শতগুণে ভাল ছিল। বনের মধ্যে ব্যাঘ্র দেখিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "বাঘ, তুমি আমায় ভক্ষণ কর, আমি যে আর এ বিড়ম্বনা সহ্য করিতে পারি না, ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন। আমি প্রার্থনা করি তোমার স্ত্রীর সহিত তোমার কখনও বিচ্ছেদ যেন না হয়।" দূর হইতে রাক্ষস দেখিয়া তাহাকেই বলেন, "রাক্ষস, তোমরা ত মানুষ খাও, আমায় খাইয়া ফেল, এ যন্ত্রণা আর আমি সহ্য করিতে পারি না।" অবসন্ন দেহমন লইয়া দময়ন্তী একেবারে নির্জ্জীব হইয়া পড়িলেন, তাঁহার আর চলিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত রহিল না, তিনি তখন একমনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল

একদল বণিক্ সেইদিকে আসিতেছেন। বহুদিন পরে দুর্গম অরণ্যের মধ্যে মানুষের সমাগম দেখিয়া দময়ন্তী আনন্দে অধীর হইয়া লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া বণিকদের নিকট গিয়া তাঁহাদের সহিত যাইতে চাহিলেন। দময়ন্তীর রূপ ও যৌবন দেখিয়া বণিকেরা মনে ভাবিলেন, এ নারীকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়, হয়ত এর জন্য অনেক বিপদ ঘটিতে পারে। তখন তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া দময়ন্তীকে বলিয়া দিলেন, যে, তাঁহারা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহাদের সহিত যাওয়া ছাড়া দময়ন্তীর আর অন্য উপায় ছিল না। তিনি কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহার কাতর-ক্রন্দন ও অসহায় অবস্থা দেখিয়া বণিকদের সকলকারই মনে দয়া হইল, তাঁহারা অবশেষে তাঁহাকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই বণিকেরা এক বাণিজ্যবহুল নগরীতে আসিলেন। এখানকার রাজার নাম সুবাহু, সুবাহুর সহিত একজন বণিকের বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল, তিনি দয়মন্তীকে রাজবাটীতে লইয়া গিয়া রাজা সুবাহুর জননীর নিকট রাখিয়া আসিলেন। দময়ন্তী এ পর্য্যন্ত আপনার প্রকৃত পরিচয় কাহাকেও দেন নাই, এখানেও দিলেন না; তবু রাজমাতা সস্নেহ ব্যবহারে তাঁহার কষ্টের অনেক লাঘব করিলেন। রাজ-সংসারে থাকিয়া দময়ন্তী নেহাৎ যাহা জীবনধারণের পক্ষে না হইলে চলে না, তাহাই লইতেন, আর তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব নলের চিন্তা করিয়াই সময় কাটাইতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এদিকে মহারাজ ভীম কন্যাজামাতার রাজ্যসম্পদ হারাইয়া বনে চলিয়া যাইবার কথা শুনিয়া তাঁহাদের সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। তাহাদের মধ্যে সুদেব নামক একজন চতুর ব্রাহ্মণ সুবাহুর রাজধানীতে আসিয়া অনেক পরিশ্রম করিয়া দময়ন্তীর সাক্ষাৎ পাইলেন। দময়ন্তীও তাহাই চহিতেছিলেন। পিতার গৃহে যাইবার তেমন কোনও সুবিধা পাইতেছিলেন না বলিয়াই এতদিন অপরের গলগ্রহ হইয়াছিলেন, এখন সুদেবের পরামর্শে রাজমাতাকে প্রকৃত পরিচয় দিয়া আপনার সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিলেন। রাজমাতাও দময়ন্তীর পরিচয় সম্বন্ধে কতকটা এইরূপ ধারণাই করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া সুদেবের সহিত দময়ন্তীকে পিতার গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

পিত্রালয়ে আসিয়া দময়ন্তীর প্রধান কার্য্য হইল নলের সন্ধান করা। পিতার যত বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ছিল, দময়ন্তী সকলকেই কোথাও না কোথাও নলের সন্ধানে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি আরও বলিয়া দিলেন যে, যেখানে নলের থাকা সম্ভব, কিংবা যাঁহাকে নল বলিয়া সন্দেহ হয়, চরেরা যেন এই কথা শুনাইয়া দেয়, যে, “যে ব্যক্তি বস্ত্রের অর্দ্ধেক চুরি করিয়া গহন বনের মাঝে স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশে বেড়ায় সে কখনও ভাল লোক নয়।”

নলের যে যে স্থানে থাকা দময়ন্তীর সম্ভব বলিয়া মনে হইল, সেই সমস্ত স্থানে তিনি বিশ্বাসী লোক পাঠাইলেন, কিন্তু ফলে কিছুই হইল না, চরেরা সকলেই একে একে ফিরিয়া আসিল, নলের সন্ধান কেহই আনিতে পারিল না। শেষে তাহাদের মধ্যে একজন ফিরিয়া আসিয়া দময়ন্তীকে বলিল, “রাজকন্যা, আপনার দুঃখের অবসান হইয়াছে, আমার খুব বিশ্বাস আমি নলের সন্ধান পাইয়াছি।” ‘নলের সন্ধান’! রাজকন্যা উৎকণ্ঠিতা হইয়া শুনিতে লাগিলেন; চর বলিয়া যাইতে লাগিল,

"অনেক দেশে ঘুরিবার পর অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের রাজধানীতে উপস্থিত হইলাম। সেখানে গিয়া অপর জায়গার মত রাজার সভায় আপনি যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, অন্যান্য কথার পর সেই কথাগুলিই বলিয়া ফেলিলাম। আমাদের কথা রাজা বা তাঁহার উপস্থিত সভাসদেরা কেহই বুঝিতে পারিলেন না বলিয়াই মনে হইল, তাঁহারা সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন, কেহই কোনও উত্তর দিলেন না। আমরাও সেখানে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্রাসাদের বাহিরে চলিয়া আসিলাম। তখন দেখিলাম ঋতুপর্ণ রাজার সারথি আমার নিকট আসিলেন, তাঁহার শুষ্ক মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন তিনি বিষম ভাবনায় পড়িয়া গিয়াছেন। যাহাই হউক, আমরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার পর তিনি বলিলেন, "দেখুন, বনের মাঝে কেহ আর ইচ্ছা করিয়া স্বজনকে পরিত্যাগ করে না; ভাগ্যের দোষে যে ব্যক্তি অর্থহীন, বস্ত্রহীন ও বন্ধুহীন হইয়াছে, শাস্ত্রের মর্ম্ম জানিলেও তাহার আর উপায়ান্তর ছিল না, তাহার উপর রাগ করিলে অবিচারই করা হয়।"

চরের কথা শুনিয়া দময়ন্তীর আর সন্দেহ রহিল না, তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, সে সারথি নল ছাড়া আর কেহ নয়। এখন নলকে কি উপায়ে আবার আনিতে পারা যায়, ইহাই হইল দময়ন্তীর প্রধান ভাবনা। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি এক উপায় বাহির করিলেন। আপনার একজন বিশ্বাসী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে তিনি অতি গোপনে রাজা ঋতুপর্ণের নিকট এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন, যে, 'কাল প্রাতে দময়ন্তী স্বয়ংবরা হইবে, আপনার সে স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত থাকা চাই, দময়ন্তীর অনুরোধ।' দময়ন্তী স্বয়ং স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন শুনিয়া ঋতুপর্ণের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি লোকটা মন্দ ছিলেন না, মনটাও ছিল তাঁহার খুব সরল, তাহার উপর দময়ন্তী নিজের স্বয়ংবর-সভায় আসিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অন্য কোনও কথা ভাবিবার অবসর হইল না। দময়ন্তী যে একবার স্বয়ংবরা হইয়াছিলেন,

তিনি অন্যের বিবাহিতা, তাঁহার আর বিবাহ হইতেই পারে না, এ সব কথা তাঁহার মনেই আসিল না। তিনি কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, অতদূর পথ একদিনে কি করিয়া যাওয়া যায়। দময়ন্তী যখন স্বয়ং লোক পাঠাইয়াছেন, বরমাল্য যে তাঁহারই কণ্ঠশোভা বৃদ্ধি করিবে সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহমাত্রও ছিল না। তিনি তখনই তাঁহার প্রধান সারথি নলকে আপনার কাছে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় আজই রাত্রি হইবার পূর্ব্বেই নিষধ নগরে লইয়া যাইতে পার?" তিনি আপন মনেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "ওঃ, আজ যদি কোনও গতিকে এই দুইশত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া নিষধ নগরে একবার যাওয়া যায়, তাহা হইলে আর ভাবনা কি, দময়ন্তী ত আমার!" দময়ন্তীর নাম শুনিয়া নল উৎসুকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন; ঋতুপর্ণ তখন আনন্দে আত্মহারা, মনের আনন্দ তাঁহার মুখে, বলার ভঙ্গীতে ও কণ্ঠের স্বরে যেন সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছিল। তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "দময়ন্তীর মত সুন্দরী পৃথিবীতে আর কেহ নাই, তুমি একবার যদি দেখিতে কখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারিতে না। আজই যদি লইয়া যাইতে পার, কাল তাহা হইলে আমিই দময়ন্তীর স্বামী হইতে পাই, তিনি স্ত্রী হইলে ঘরে আমার লক্ষ্মী বাঁধা থাকে, আমার মত আর তাহা হইলে কেহই সুখী থাকে না। আমাকে চান বলিয়াই ত নিজে লোক পাঠাইয়াছেন, দময়ন্তী নিশ্চয়ই কাল আমার হইবেন।"

ঋতুপর্ণের কথা শুনিয়া নল দময়ন্তীর স্বয়ংবরের সমস্ত রহস্য বুঝিতে পারিলেন। এ যে কেবল তাঁহাকে পাইবার জন্যই দময়ন্তী ঋতুপর্ণের সহিত ছলনা করিতেছেন তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন, 'হুঁ, কাল যে দময়ন্তী কাহার হইবে, সে আমিই বুঝিতে পারিতেছি।' তিনি মুখে ঋতুপর্ণের কথায় সায় দিয়া তাঁহাকে একদিনের মধ্যেই বিদর্ভ নগরে পৌঁছিয়া দিবেন বলিয়া রথ সাজাইয়া আনিলেন। অনেক আশা করিয়াই ঋতুপর্ণ রথে উঠিলেন। অশ্ব-চালনায় সুনিপুণ নল বিদ্যুৎ বেগে রথ ছুটাইয়া চলিলেন। ঋতুপর্ণ অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি কেবল ভাবিতেছেন কতক্ষণে একবার বিদর্ভ

নগরে পৌঁছিবেন, এমন সময় সহসা তাঁহার উত্তরীয়খানি বায়ুর বেগে শরীর হইতে খসিয়া পার্শ্বের এক বৃক্ষে সংলগ্ন হইয়া গেল। রাজা তখনই রথ সংযত করিতে আদেশ দিলেন, রথ থামিলে দেখা গেল, বহুদূরে উত্তরীয়টী দেখা যাইতেছে, এই কয়েক মূহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহারা এতদূর পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া ঋতুপর্ণ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, অশ্বচালনায় এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা তিনি ইহার পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই। তিনি নলকে বলিলেন, "আজ বাস্তবিকই একটা অদ্ভুত কৌশল দেখিলাম, আমিও তোমায় আমার নিজের এক অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইব ; আচ্ছা, বল দেখি আমাদের সম্মুখে এই যে গাছটা আছে, এ গাছে কতগুলা ফল।"

নল বলিলেন, "না গণিয়া কি করিয়া বলি গাছে কতগুলি ফল আছে?" ঋতুপর্ণ সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "তবে আর ক্ষমতা কি? গণিয়াত সবাই বলিতে পারে, না গণিয়া বলিতে পার? আমি বলিব কতগুলি ফল আছে? এতগুলি ফল, তুমি গাছে উঠিয়া গুণিয়া দেখ।" ঋতুপর্ণের কথায় নল অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়াছিলেন, তিনি তখনই গাছে উঠিয়া ফলের সংখ্যা গণনা করিয়া দেখিলেন, রাজার কথা আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়াছে। ঋতুপর্ণ হাসিয়া বলিলেন, "কেমন, মিলিয়াছে ত? আমি এরকম অদ্ভুত বিদ্যা আরও জানি, দময়ন্তীকে আগে বিয়ে করি, তারপর বাড়ী গিয়া পাশা খেলিয়া দেখাইব, দেখিবে পাশা ফেলিবার পূর্ব্বেই আমি বলিয়া দিব এবার কত দান পড়িবে। বুঝিয়াছ?" নল ভাবিলেন এমন একটি বিদ্যা জানা থাকিলে পুষ্করকে কোনও না কোনও সময়ে পাশা ক্রীড়ায় আহ্বান করিয়া হারাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ভগবান যদি দিন দেন তাঁহার রাজ্য সম্পদ্ আবার তাঁহারই হইবে। এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। এই ভাবিয়া তিনি রাজার সহিত আপন আপন বিদ্যার বিনিময় করিবার প্রস্তাব করিলেন। ঋতুপর্ণও ত তাহাই চাহেন, অশ্বচালনার এরূপ কৌশল জানাও ভাগ্যের কথা। দুইজনে বেশ বন্ধুর মত আপন আপন বিদ্যা অপরকে শিখাইয়া দিলেন। এমন সময় নল দেখিলেন, তিনি যে বৃক্ষের তলায় বসিয়া আছেন, তাহারই উপরে একজন মানুষ বসিয়া দুঃখ করিতেছে। নল অমনি

উঠিয়া তাহাকে দুঃখ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকটী বলিল, "মহারাজ নল, আমি কলি, বিনা কারণে আপনাকে অশেষ প্রকার যন্ত্রণা দিয়াছি বলিয়া আমার সে পাপের ফল ভোগ করিতে হইতেছে। সাধ্বী সতী দময়ন্তীর শাপে আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, আমি আর সহ্য করিতে পারি না। আপনার দুষ্টগ্রহের অবসান হইয়াছে, আমায় ক্ষমা করুন, আমি চলিয়া যাই।" বিনাদোষে যে এতদূর শত্রুতা করিতে পারে তাহার ন্যায় নীচ ব্যক্তিকে ক্ষমা! নল প্রথমটা কথা কহিলেন না, তারপর যখন কলি তাঁহার চরণে প্রণাম করিল, তখন নল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি ক্ষমা করিয়া রথে উঠিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহারা রাজা ভীমের রাজধানী বিদর্ভনগরে পৌঁছিলেন। বিনা সংবাদে সহসা রাজা ঋতুপর্ণ আসিয়াছেন শুনিয়া ভীম অত্যন্ত সমাদর দেখাইয়া অতিথিকে আপনার অভ্রভেদী প্রাসাদে লইয়া গিয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন। দময়ন্তীও তাঁহাদের আগমন সংবাদ পাইয়াছিলেন, তিনি জানিতেন যতই দূর হউক না কেন নল যখন সারথি তখন আজ তাঁহারা আসিবেনই। তিনি একবার সুবিধা করিয়া বাহিরে গিয়া অন্তরাল হইতে সারথি সত্যই নল কিনা দেখিতে আসিলেন; বহুদিন পরে প্রিয়তমের দর্শন পাইয়া দময়ন্তী আপনার সকল দুঃখ, সকল বিপদ ভুলিয়া গেলেন। তিনি তখন আপনার এক প্রিয় সহচরী কেশিনীকে দেখিতে পাঠাইলেন, নল কেমন আছেন, কি করিতেছেন। কেশিনীর কিন্তু সন্দেহ যায় নাই; সে নলকে নির্জ্জনে পাইয়া চিনিতে পারিয়াও একবার পরীক্ষা করিয়া লইয়া যখন বেশ বুঝিতে পারিল যে, এ সারথি আর কেহ নহেন স্বয়ং নল, তখন তাঁহাকে একেবারে প্রাসাদে দময়ন্তীর কক্ষে লইয়া গেল। আবার যে স্বামীস্ত্রীতে কখনও মিলিত হইতে পারিবেন সে আশা নল দময়ন্তী দুজনের কাহারও ছিল না। এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে সাক্ষাৎ করিতে পাইয়া তাঁহারা সারারাত্রি আপন আপন সুখদুঃখের কথা কহিয়াই কাটাইলেন। সকাল বেলা নল গেলেন শ্বশুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। রাজা ভীম কন্যার চক্রান্ত কিছুই জানিতেন না, আজ তিনি সহসা নিজের গৃহে জামাতাকে দেখিতে

পাইয়া সুখী ত হইলেনই, খুব আশ্চর্য্যও হইয়া গেলেন। প্রাসাদের সকলেই তখন তাঁহাকে রীতিমত সম্মান দেখাইতে আরম্ভ করিল। ঋতুপর্ণ নিজের সারথির সম্মান দেখিয়া অবাক। লোকে যত না তাঁহাকে খাতির করে, তার চেয়ে অনেক বেশী খাতির করে তাঁহার সারথির। তিনি ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না; স্বয়ংবরেরই বা উদ্যোগ কোথায়? তিনি ছাড়া ত রাজপুত্রও কেহই আসে নাই, কি ব্যাপার? ঋতুপর্ণের হাবভাব দেখিয়া নল তাঁহার মনের কথা সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, তিনি তখন হাসিমুখে কেন তাঁহার এ বাড়ীতে এমন 'জামাই আদর' ঋতুপর্ণকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। ঋতুপর্ণ লজ্জায় অস্থির, তিনি যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই একটা বিবাহিতা সধবা নারীকে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন, সেইজন্য লজ্জায় আর মুখ তুলিতে পারিলেন না। নল কিন্তু ঋতুপর্ণকে তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহারের জন্য খুব ভালবাসিতেন, তাই তিনি আর সে সব কথার উত্থাপন না করিয়া অন্যান্য কথায় তুষ্ট করিয়া রীতিমত আদর আপ্যায়ন দেখাইয়া বিদায় দিলেন। বিদর্ভনগর হইতে বাহির হইয়া ঋতুপর্ণ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

রাজা নল প্রায় মাসখানেক শ্বশুরবাটীতে কাটাইয়া রীতিমত সাজসজ্জা করিয়া আপনার রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিলেন। তাঁহাকে কেহই বাধা দিল না, তিনি একেবারে রাজধানীর নিকটে আসিয়া পুষ্করের নিকট এক দূত দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, যে, 'তোমার ছলনায় আমি রাজ্য হারাইয়াছিলাম, আমার রাজ্য আমি আবার লইতে আসিয়াছি, যুদ্ধে বা পাশাক্রীড়ায় যাহাতে অভিরুচি হয়, আমার সহিত শক্তির পরীক্ষা করিতে পার।' পুষ্কর যুদ্ধের অপেক্ষা দ্যূত ক্রীড়াই জানিতেন ভাল, তাছাড়া তিনি নলকে পাশাতেই হারাইয়াছিলেন, এবারও ভাবিলেন আবার পরাজিত করিবেন; নলকে তিনি পাশাক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। ঋতুপর্ণের নিকট হইতে নল যে অক্ষবিদ্যা শিখিয়াছিলেন, সেই বিদ্যার বলে তিনি পুষ্করকে অনায়াসে পরাজিত করিয়া আপনার রাজ্যসম্পদ পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন।

একদিন পুষ্কর তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, একথাও ভুলিয়া নল পুষ্করকে ক্ষমা করিয়া আবার তাঁহাকে পূর্ব্বেকার ন্যায় বন্ধু হইয়া থাকিতে বলিলেন। নলের মহানুভবতায় পুষ্কর মোহিত হইয়া তাঁহার চরণদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

নল আবার রাজা হইয়াছেন জানিয়া রাজ্যময় আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। প্রজারা নলকে হারাইয়া সুখে ছিল না, পুষ্কর তাহাদের উপর অত্যাচার করিত। আবার তাহারা নলকে রাজা পাইয়া যেন হারানিধি ফিরিয়া পাইল। অতি সুখেই রাজা নলের দিন কাটিতে লাগিল।

মেঘদূত

পূর্ব্বমেঘ
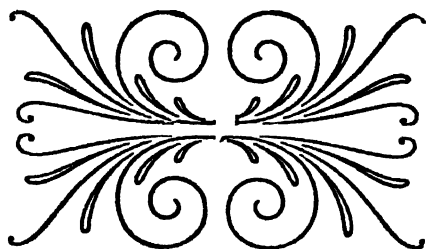
যক্ষপতি কুবেরের এক তরুণ ভৃত্য ছিল, নাম ছিল তার গুহ্যক। একবার সে প্রভুর কাজে একটা গুরুতর ভুল ক'রে ফেলেছিল ব'লে যক্ষরাজ তা'কে এক বৎসরের জন্য নির্ব্বাসনের দণ্ড দেন। সে থাক্‌ত অলকায় তার প্রভুর রাজধানীতে, সেইখানেই ছিল তার ঘরবাড়ী, আর সেই ঘরে ছিল তার ঘর-আলো-করা প্রেমময়ী এক তরুণী ভার্য্যা। এখন, তার নির্ব্বাসন হ'ল রামগিরির পাহাড়ে। কোথায় অলকা আর কোথায় রামগিরি! বেচারী যক্ষ আর কি করে, স্বয়ং যক্ষরাজের শাস্তি, মাথা পেতে নিতেই হ'ল। সেখানে গিয়ে দুঃখের আর সীমা রইল না তার; যে প্রেয়সীকে সে এক দণ্ড না দেখ্‌লে থাক্‌তে পার্‌ত না তার জন্যই তার যত কষ্ট।

ক'মাস সে কোনো গতিকে কাটালে, শরীর হ'য়ে গেল জীর্ণ শীর্ণ, হাতের বালা আর হাতে হয় না, কেবলই খুলে পড়ে যায়। এই ভাবেই তার দিন যায়। গ্রীষ্মের পর এল বর্ষা, আষাঢ় মাসের প্রথম তারিখেই রামগিরির আকাশে মেঘ দেখা দিল। একেইত, মেঘ দেখলেই স্ত্রী নিয়ে সুখী যে-জন, তারও মন বিচলিত হ'য়ে উঠে, তখন যে বেচারার মন তার প্রাণ-প্রেয়সীকে বক্ষে পাবার আশায় উতলা হ'য়েই আছে, অথচ সে রয়েছে কতদূরে তার ঠিক নেই, তার অবস্থা যে কি হয়, সে আর বোঝাবে কে?

এতদিন সে কোনও গতিকে আপনাকে সাম্‌লে রেখেছিল, কিন্তু নূতন মেঘ দেখে মনের তার সকল বাঁধন ছিঁড়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠে দু'হাতে দু'মুঠা ফুল নিয়ে মেঘের দিকে অঞ্জলি দিয়ে তা'কে তার সাদর সম্ভাষণ জানালে। দক্ষিণ দিক থেকে মেঘ যাচ্ছিল উত্তরে—সেই উত্তরে যেখানে তার স্বপ্নপুরী অলকা, আর সেই অলকারই এক সুখ-স্মৃতি-ভরা গৃহের শোভা ছিল তার জীবনসর্ব্বস্ব পত্নী। প্রেয়সীর কোনও সংবাদ সে অনেক দিনই পায় নাই, তাই যে মেঘ তারই অলকার দিকে

যাচ্ছে, তাকে দিয়ে অন্ততঃ নিজের একটা সংবাদ তার প্রিয়ার কাছে দিয়ে পাঠাবার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মেঘ যে একটা জড়পদার্থ—ধূম, অগ্নি, জল আর বাতাসের সমষ্টি এ কথা তার মনে পড়ল না; মনে আর পড়বেই বা কি ক'রে, মিলনের আকাঙ্ক্ষায় মন যার এত উৎকণ্ঠিত, তার কি আর চেতন অচেতনের জ্ঞান থাকে?

সে ভাবলে মেঘের মত বন্ধু আজ তার আর সংসারে কেউ নেই, তাই সে মেঘের দিকে চেয়েই বলতে লাগল, "বন্ধু, তুমি দক্ষিণ মেঘ, কাজেই বুঝতে পারছি মেঘেদের অতি শ্রেষ্ঠ কুলেই তোমার জন্ম, ইন্দ্রের তুমি হ'চ্ছ একজন প্রধান সহায়, তার উপর আবার সর্ব্বত্রই তোমার অবাধ গতি, তাই তোমার মত মহতের কাছেই আমার এ প্রার্থনা নিয়ে এসেছি। মহতের কাছে চেয়ে নিষ্ফল হওয়াও ভাল, তবু অধমের কাছে চেয়ে পাওয়াও কিছু নয়।

তুমিত যাচ্ছই সেই উত্তর দিকে, ভাই, একবার না হয়, আমার উপরোধে যক্ষরাজ কুবেরের রাজধানী অলকাপুরী হ'য়ে যেও। প্রভুর ক্রোধে আজ আমার এই দশা, আমার একটা কথা সেই অলকায় পৌঁছে দিও, বন্ধু।"

মেঘ যদি অলকায় যেতে না চায়, তাই যক্ষ আবার লোভ দেখিয়ে বল্‌তে লাগল, "ভাই, অলকার যা বিশেষত্ব সে আর তোমায় কি বল্‌ব, এমনটী আর অন্য কোন সহরেই পাবে না। এ সহরের বাহিরে একটা উদ্যানে মহাদেব থাকেন, তাঁর মাথার সে চাঁদের কিরণে বারো মাস এর ঘরবাড়ী জ্যোৎস্নায় যেন হাস্‌তে থাকে। আবার যে পথ দিয়ে তুমি যাবে, সে পথও অতি চমৎকার। দেখবে এখন, এই সব প্রান্তরের উপর দিয়ে যখন তুমি যাবে. কত বিরহিণী উপর দিকে চেয়ে তোমায় দেখবে। আহা, তোমায় দেখলে মনে তাদের কি আশাটাই না জাগে! তারা জানে যে স্বামী তাদের যেখানেই থাকুক না, এ মেঘ দেখতে পেলে বাড়ীতে তাদের আস্‌তেই হবে। এমন দিনে প্রিয়ার বিরহ কেউ যে আর সহ্য করতে পারে না, সে তারা খুব ভাল করেই জানে।"
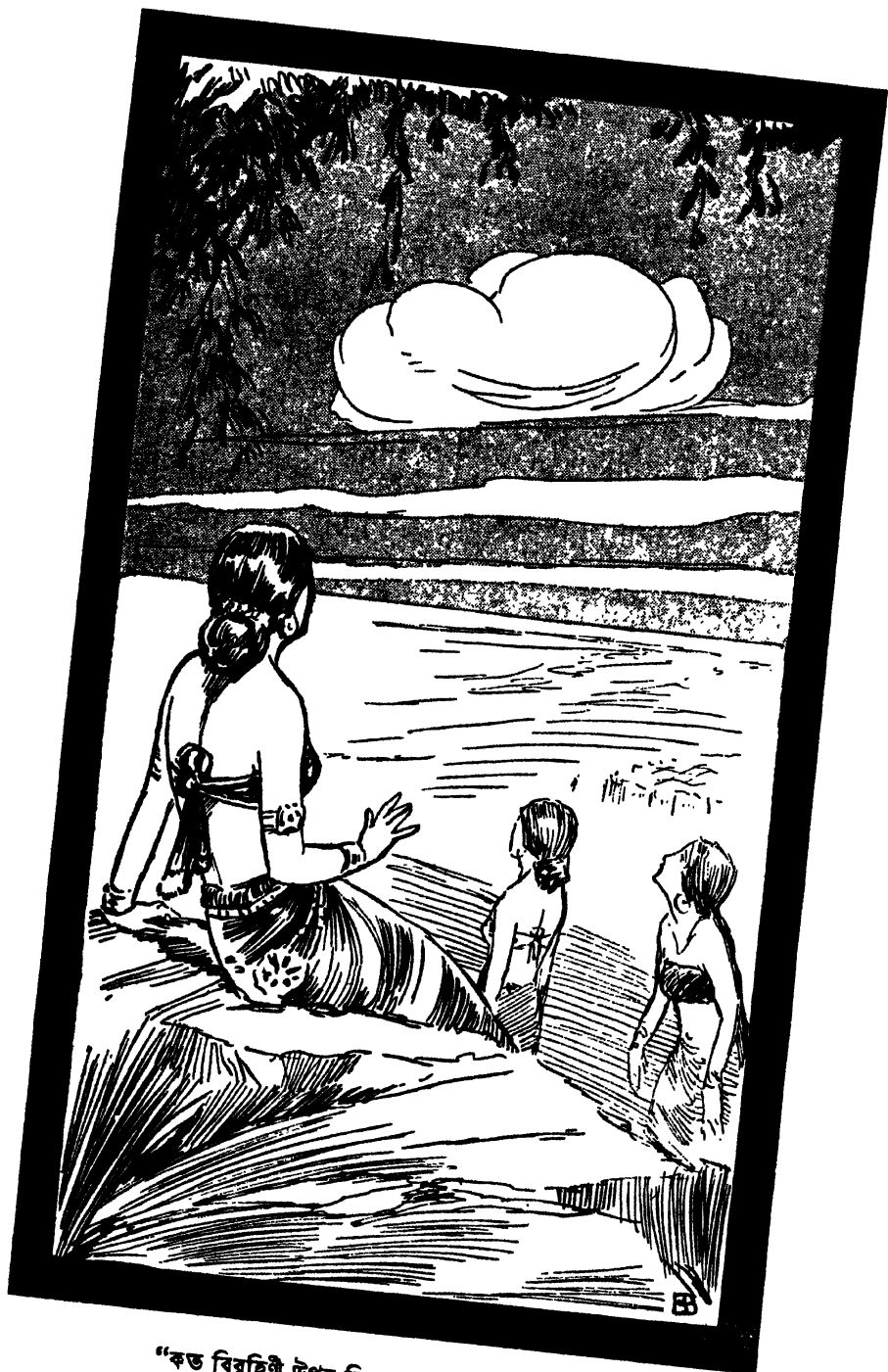
"কত বিরহিণী উপর দিকে চেয়ে তোমায় দেখ্‌বে"

তারপর এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যক্ষ বল্‌লে, "তারা ত আর আমার মত পরাধীন নয়, যে, তোমার মত নূতন মেঘ দেখেও প্রিয়ার কাছে না গিয়ে থাক্‌বে সেই এক কোন্ সুদূর বিদেশে।"

যক্ষ আবার বল্‌তে লাগ্‌ল, "যাই হ'ক বন্ধু, দক্ষিণ বাতাস তোমার সহায় হবে, চাতক পাখীরা তোমায় দেখে মধুর সুরে তোমার স্তব গাইবে, বকবধূরাও দলে দলে তোমার কাছে উড়ে উড়ে আস্‌বে, সে কি চমৎকার লাগবে তোমার।"

পথের এমন মজাদার ব্যাপার ব'লেই যক্ষের কেমন ভয় হতে লাগ্‌ল, মেঘ হয়ত এই সব দেখেই মত্ত হ'য়ে থাক্‌বে, তাই সে তাড়াতাড়ি আবার বলে উঠল, "কিন্তু বন্ধু, দেখো যেন দেরি ক'রে ফেলো না ভাই। প্রিয়া আমার সব ছেড়ে দিয়ে, আমারই আশাপথ চেয়ে রয়েছে, কবে আবার আমার দেখা পাবে কেবল সেই দিন গণেই তার দিন কাটছে। তুমিত জানই, বন্ধু, যে বিরহিণী তরুণীদের প্রাণ কি কোমল, প্রাণনাথের সঙ্গে আবার একদিন মিলন হবে কেবল এই আশায় তারা কোন গতিকে বেঁচে থাকে। তাঁদের দেখে মনে হয় না কি, যেন একটা ফুল বোঁটা হতে খসেও খসে নি? বুঝলে ভাই, তোমার বৌদির অবস্থা, তাই একটু তাড়াতাড়ি যেও বন্ধু।"

যক্ষের মনে হ'ল অতটা পথ একলা যেতে মেঘ যদি না চায়, তাই সে আরও একটু মিষ্টি সুরে বলতে লাগল, "বন্ধু, তোমার মধুর গর্জ্জন শুন্‌তে পেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে রাজহংস তোমার কাছে ছুটে আস্‌বে, এই সময় তারা মানসসরোবরেই যায়; তুমিও সেই দিকেই যাচ্ছ জেনে কি আনন্দেই না তারা তোমার সাথী হবে। একটা কথা মনে পড়ল বন্ধু, ঐ যে দূরে দেখা যাচ্ছে চিত্রকূট পাহাড়, ও বড় যে-সে পাহাড় নয় ভাই, সকলের পূজ্য স্বয়ং রঘুপতিরাম চরণধূলি দিয়ে একে ধন্য ক'রে গেছেন। তুমি একবার ওর সঙ্গে দেখা ক'রে আলিঙ্গনটা সেরে নিও, বন্ধু। আর এই সময়টায় তোমা থেকে জল কিছু পড়বেই, যে দেখবে নিশ্চয়ই তার মনে হবে যে, বহুদিনের পর আবার দুই বন্ধুর দেখা হ'য়েছে, তাই চোখের জল বাধা মানছে না।

কোন্ পথ দিয়ে তোমায় যেতে হবে আগে সেই পথের পরিচয়টা করিয়ে দি, তারপর ভাই, আমার প্রিয়াকে যে কি বল্‌তে হবে, সে কথাগুলি বলব, এখন। তবে বন্ধু, যেতে যেতে যদি শ্রান্ত হ'য়েই পড়ো, মাঝে মাঝে পর্ব্বতের উপর বিশ্রাম ক'রো, আর যদি তৃষ্ণা পায়? তার জন্যও কোনও চিন্তা নাই, নদী পাবে যথেষ্টই, সুমিষ্ট নির্ম্মল জল যখন ইচ্ছে পান ক'রে নিও।

এখান থেকে তুমি সোজাই যাবে, দেখতে পাবে সিদ্ধদের মেয়েরা উপর দিকে তোমার পানে চেয়ে রয়েছে। নিশ্চয়ই তারা ভাব্‌বে বাতাস বুঝি পাহাড়ের চূড়ো ভেঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে, কাজেই তাদের লজ্জা সরম আর সে সময় কিছুই থাকবে না, তুমি ভাই ভাল করেই তাদের চাঁদমুখগুলি দেখতে পাবে। তারপরই পাবে বেতের বন, তোমায় দেখে দিঙ্‌নাগেরা শুঁড় উঠিয়ে খানিকটা হয়ত কপ্‌চাবে, তুমি অবশ্য, সে সব ভ্রূক্ষেপ না করে উত্তর মুখেই চলতে থেকো।

সাম্‌নে দেখতে পাচ্ছ বন্ধু, ঐ রামধনুটা, যেটাকে মনে হ'চ্ছে যেন ঐ উইঢিপি থেকেই বেড়িয়েছে, তুমি যখন ওর কাছে যাবে, কি সুন্দর মানাবে তোমায়, মনে হবে যেন রাখালবেশী শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরপুচ্ছ মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

তুমি আস্‌ছ দেখে পল্লীবাসী মেয়েরা তোমার দিকে চেয়ে থাকবে, সে সময় তাদের চোখে আনন্দের আভাস দেখতে পাবে বন্ধু, কেন-না, তারা জানে চাষের সুফল দেবার মালিক হ'চ্ছ তুমি। তারা ত' আর নাগরিকা নয়, কটাক্ষের কায়দা তারা মোটেই জানে না, তাদের সে সরল চাহনি তোমার ভাল লাগবেই। তারপর খানিকটা তোমায় চাষাদের ক্ষেতের উপর দিয়ে যেতে হবে। সেও মন্দ নয় বন্ধু, দেখে নিও লাঙল দেবার পর একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ কেমন মিঠে লাগে।

তারপরই একটা পাহাড় পাবে, তার নাম হচ্ছে আম্রকূট। এ পাহাড়ের জঙ্গলের আগুন তুমিত অনেকবারই নিবিয়েছ, কাজেই তুমি শ্রান্ত হয়ে আস্‌ছ দেখে নিশ্চয়ই এ পাহাড় তোমায় মাথায় ক'রে রাখবে বন্ধু, তাতে আর কোন ভুল নেই। যে অতি ক্ষুদ্র অতি নগণ্য সেও যখন উপকারী

বন্ধুকে আশ্রয় দিতে ইতস্তত: করে না, তখন আম্রকূট পাহাড়ের মত মহতের কথা আর কি বলব, ভাই।

এই আম্রকূট পাহাড়, আমের বনে দেখবে ছেয়ে গেছে ; এই সময়কার পাকা পাকা আমেভরা আম গাছের বন, আর ঠিক সেই বনের মাথায় যখন গিয়ে তুমি পড়বে, খুব দূর হ'তে আকাশ থেকে অমরদম্পতী নীচের দিকে চেয়ে এই আম্রকূট পাহাড়ের চূড়োগুলি আর তার উপর আমের ঐ বন যখন দেখতে পাবে, তাদের মনে হবে না কি—যে পৃথিবীর যেন সুপুষ্ট দুটী স্তনই দেখা যাচ্ছে।

এই পাহাড়ে বেশ সুন্দর সুন্দর কুঞ্জ আছে ভাই, বনচরদের মেয়েরা এই সব কুঞ্জে বেড়িয়ে খুব আমোদ পায়। কুঞ্জগুলি অবশ্য দেখ্‌তে মানা করিনি, কিন্তু দেখো যেন দেরি হ'য়ে যায় না। একটু আধটু জল বর্ষণ ক'রে তাড়াতাড়ি চ'লে এসো, একেবারে সেই রেবা নদীর ধারে, বিন্ধ্যগিরির গা ব'য়ে এই রেবা নদী নাম্‌ছে, দূর হতে দেখলে নিশ্চয়ই তোমার মনে হবে যে, প্রকাণ্ড একটা কাল কুচকুচে হাতীর গায়ে কে যেন ভস্মের রেখা টেনে দিয়েছে।

কি সুন্দর এই রেবা নদীর জল। তায় আবার বুনো হাতীদের যখন মদস্রাব হয়, তখন তারা শরীর ঠাণ্ডা করতে স্নান করে এই রেবা নদীর জলে। তাই এর জলে যা সৌগন্ধ! তুমি বন্ধু, এর খানিকটা জল পান করে নিও, তাহলে আর হাল্কা থাকবে না। বাতাসের সাধ্য হবে না তোমায় উড়িয়ে নিয়ে যায়। যার ভিতরে কিছু নেই, মানমর্য্যাদায় তার আর কি অধিকার, ভাই? পূর্ণতাই ত' হ'চ্ছে সংসারে গৌরবের জিনিষ।

চাতকপাখীরা একটু জল পাবার আশায় তোমার পিছু পিছু উড়্‌ছে দেখে সিদ্ধরা সব মেয়ে পুরুষে তোমার দিকে চেয়ে হয়ত হাত বাড়িয়ে এক, দুই ক'রে ক'টা বক আর চাতকপাখী আছে গুণ্‌বে, সেই সময় বন্ধু, এক কাজ ক'রো যদি ভারি মজা হবে। তুমি সে সময় যদি সামান্য গর্জ্জন ক'রে ওঠ, তাহ'লে সেই সুন্দরীরা ভয় পেয়ে তাদের সহচরদের জড়িয়ে ধর্‌বে, তখন বুঝতে পাচ্ছত? প্রেয়সীদের স্বেচ্ছায় জড়িয়ে

ধরা—এমন সুখটা কেবল তোমার জন্তেই তারা পাবে ব'লে সিদ্ধ যুবারা কি রকম মন খুলে আশীর্ব্বাদ কর্‌বে তোমায় !

ওখানকার সব পাহাড়েই ফুলের মিষ্টি গন্ধ, তাই বন্ধু, তুমি যতই আমার কাজে যাচ্ছ ব'লে শীঘ্র যাবার চেষ্টা কর না কেন, দেরি তোমার হবেই, সে আমি এখান থেকেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি। ওসব পাহাড়ে অনেক ময়ূর আছে, তারা তোমায় দেখে খুবই আনন্দধ্বনি ক'রে তোমায় অভ্যর্থনা ক'রবে। তুমি যত শীঘ্র পার, সেখান থেকে চ'লে এস ভাই, বুঝছ ত' আমার অবস্থা ?

পাহাড়গুলা পার হ'লেই, যে দেশ আরম্ভ হবে তার নাম হচ্ছে দশার্ণ। সে দেশের উপবন কেতকী গাছে ভরা, তুমি গেলেই সেই সব কেয়াগাছে ফুল ফুট্‌তে আরম্ভ হবে তখন সে উপবনগুলির কি মনোরম শোভা হবে, এখান থেকে কি আর বল্‌ব, বন্ধু। তার পাশেই জামবন, পাকা পাকা জাম ফলের সে শ্যামল শোভা দেখ্‌লে চোখ জুড়িয়ে যায়।

দশার্ণদেশের রাজধানী হচ্ছে বিদিশা, খুবই নামজাদা সহর, সবাই এর নাম জানে, এই বিদিশা সহরের মধ্য দিয়ে বেত্রবতী নদী প্রবাহিত হ'চ্ছে। তুমি বন্ধু, উপর থেকে খানিক নেমে এসে এ বেত্রবতীর সুস্বাদু জল পান ক'রো, দূর হ'তে যারা দেখবে নিশ্চয়ই তারা ভাব্‌বে যে, তুমি যেন চুপি চুপি এসে প্রেয়সীর অধরসুধা পান করে নিচ্ছ।

তারপর একটা পাহাড় দেখ্‌তে পাবে, তার নাম হচ্ছে 'নীচৈঃ,' এ পাহাড়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করা মন্দ হবে না বন্ধু। তুমি সেখানে গেলে, তোমার স্পর্শ পেলে, কদমফুল ফুটে উঠবে, মনে হবে যেন তোমায় পেয়ে আনন্দেই পাহাড়ের দেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে। এ পাহাড়ে আরও মজা আছে বন্ধু, সহর থেকে বিলাসীরা সব আসে এখানে মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্ত্তি কর্‌তে, তারা চ'লে গেলেও গুহার মধ্য হ'তে তাদের অঙ্গের সুবাস শীঘ্র যায় না, সারা পাহাড়টাই যেন সুবাসিত হ'য়ে থাকে।

এইখানেই আবার সকাল বেলা সুন্দরীরা যুঁইফুল তুল্‌তে আসে। রোদে যখন তারা ঘেমে যাবে, গালগুলি তাদের লাল হ'য়ে উঠ্‌বে, তখন

ভাই, তাদের মাথার উপর গিয়ে একটু ছায়া দিও, তাদের কষ্টের অনেক লাঘব হবে।

এবার তোমায় একটু বেঁকে যেতে বল্‌ব, বন্ধু। অলকা যদিও ঠিক উত্তরে, তবু ভাই, তোমার নিজের জন্যই বল্‌ছি একবার খানিক পশ্চিমে গিয়ে উজ্জয়িনীটা দেখে এস; তারপর অবশ্য, আবার উত্তর পথেই যাবে। উজ্জয়িনীর—বুঝেছ বন্ধু, সুন্দরীদের কি সুন্দর চাহনি, তাদের সেই বিদ্যুতের মত চকিত কটাক্ষ, সে দেখে যদি না মজা পেলে, তবে ছাই, আর ও চোখ থেকেই বা কি লাভ?

উজ্জয়িনীর পথটাও অতি চমৎকার। কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে সেখানে, ব'লে দিচ্ছি। প্রথমেই পাবে নির্ব্বিন্ধ্যা নদী। আহা, এ সময় বেচারী বাস্তবিকই, একেবারে ক্ষীণ হ'য়ে থাকে—তোমারি বিরহে বন্ধু, কেবল তোমারি বিরহে। তোমার দেখা পেলে, তোমার সোহাগ-বারি লাভ কর্‌লে আর কি তার এ দশা থাকবে? কাজেই বন্ধু, তোমায় বেশী আর কি বল্‌ব, বিরহীদের বন্ধু তুমি, এ দুঃখ তার আর রেখো না।

এই নির্ব্বিন্ধ্যা নদী পার হ'লেই অবন্তীদেশ আরম্ভ হবে, উজ্জয়িনীই হ'চ্ছে অবন্তীর রাজধানী। উজ্জয়িনীর শোভা সে আর কি বল্‌ব তোমায়, দেখ্‌লে মনে হবে যেন স্বর্গের পুণ্যবান্ লোকেরা পৃথিবীতে ফিরে আস্‌বার সময় তাদের সে অবশিষ্ট পুণ্যটুকুর জোরে স্বর্গেরই খানিকটা কান্তি সঙ্গে ক'রে এই উজ্জয়িনীতে এসেছে। তাই এর যেমন শোভা, তেমন শোভা আর পৃথিবীর কোন সহরেই খুঁজে পাবে না, ভাই।

এই উজ্জয়িনীর বুক দিয়ে শিপ্রানদী ব'য়ে চ'লেছে। খুব ভোরের বেলায় সারস যখন তার মধুর কাকলীতে শ্রবণেন্দ্রিয় জুড়িয়ে দেয়, এই শিপ্রানদীর স্নিগ্ধশীতল বাতাস সদ্যফোটা কমলিনীর সৌগন্ধ ব'য়ে এনে উজ্জয়িনীর তরুণীদের প্রিয়তমের সঙ্গে রাতজাগার ক্লান্তি এমন মধুর ভাবে মুছিয়ে দেয়, মনে হয় যেন চতুর নায়ক মিষ্ট কথায় নায়িকার মন ভোলাচ্ছে।

উজ্জয়িনীর ঘরে ঘরে জানালা দিয়ে ধূপের ধূম বেরুতে দেখ্‌বে। মেয়েরা এতে চুল শুকিয়ে নেয়, তাই এত সুবাস তার। তুমি এ ধূপের

ধোঁয়ায় আপনার শরীর পুষ্ট করে নিও, তোমার অঙ্গও সুবাসিত হয়ে উঠ্‌বে। তুমি আস্‌ছ জান্‌তে পেরে বাড়ী বাড়ী পোষা ময়ূরেরা নাচ্‌তে থাক্‌বে। ঘরে ঘরে দেখ্‌বে ফুলের তোড়া, সদ্যফোটা ফুলের গন্ধে ভরপুর, মেঝের উপর গৃহলক্ষ্মীদের পায়ের আল্‌তার দাগ। যেদিকেই যাও না কেন, এখানকার সর্ব্বত্রই একটা লক্ষ্মীশ্রী দেখ্‌তে পাবে, বন্ধু। তাই বল্‌ছি, সেখানে দু'একটা বাড়ীর ছাদে একটু বিশ্রাম ক'রে নিও, দিব্যি আরাম পাবে।

ওখানকার চণ্ডীশ্বরের মন্দির না দেখে, উজ্জয়িনী ছেড়ে যেও না। ভোলানাথের ভূতপ্রেতেরা তাদের প্রভুর কণ্ঠের সে নীল আভা তোমার মধ্যে দেখতে পেয়ে খুবই আনন্দ পাবে। আর তুমিও খুব আনন্দ পাবে সেখানকার গন্ধবতী নদীর হাওয়া খেয়ে। কত সুন্দরী যুবতী যে গায়ে চুয়া, চন্দন, কুঙ্কুম এই সব মেখে এ নদীতে স্নান করতে আসে তার ঠিক নেই। তাই সে নদীর জলে আর জলো হাওয়ায় এত মিষ্ট গন্ধ।

আর একটা কথা তোমায় ব'লে রাখি, বন্ধু, ওখানে যদি একটু সকাল সকাল গিয়ে পড়, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রো। এই সময় দেবাদিদেবের আরতি হয়, তুমি যদি সেই সময় মৃদু মৃদু গর্জ্জন করো তা'হলে খুব সুন্দর পটহধ্বনির কাজ হবে। তা'তে অবশ্য, তোমার পুণ্যসঞ্চয়ও কিছু হবে।

আরতির সময় দেবদাসীরা প্রভুকে রত্নময় চামর ঢুলিয়ে কোমর নাচিয়ে নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে যখন শ্রান্ত হ'য়ে পড়্‌বে তুমি সামান্য একটু জল বর্ষণ করে তাদের সে ক্লান্তি দূর ক'রো। তারাও এ উপকারটুকু পেয়ে তোমার দিকে ভ্রমরের মত কালো চোখের কটাক্ষ ক'রে চেয়ে থাকবে। তারপর আরতি শেষ হ'লে স্বয়ং পশুপতি নৃত্য সুরু করেন ; হাত তুলিয়ে রক্তরঞ্জিত গজের চামড়া নিয়ে তাঁর সেই তাণ্ডব-নৃত্য। তুমি ভাই, বেশ মিশ্‌মিশে কালো আছ, তার ওপর জবাফুলের মত লাল সায়াহ্নের শেষ আলো তোমার গায়ে লাগলে তোমাকেও তাঁর সেই রক্তরঞ্জিত গজের চামড়ার মত দেখাবে। তাঁর সে নৃত্য আরম্ভ হ'তে না হ'তেই তাঁর কাছে গিয়ে পড়বে, তাহ'লে তাঁর আর সে চামড়াটার কথা মনে থাকবে না। তারপর মা ভবানীকে যথারীতি ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখিয়ে চলতে থাকবে।

রাজপথ দিয়েই তোমায়, অবশ্য, খানিকক্ষণ যেতে হবে, এইসব পথ দিয়ে রাত্তির বেলায় অভিসারিকা নারী নাগরদের বাসায় যায়। যে অন্ধকার রাত্রি! তুমি বন্ধু, মাঝে মাঝে কষ্টিপাথরে সোনার রেখার মত বিদ্যুৎ চম্‌কিয়ে তাদের পথ চেনবার সুবিধা করে দিও। আর যদি ফিন্‌ফিন্ ক'রে একটু আধটু জলও ছাড়ো, তা'হলেও খুব ভাল হয়, পথের শ্রান্তিটা কিছু কমে তাদের। কিন্তু সাবধান বন্ধু, দেখো যেন গর্জ্জে উঠো না, বেচারীরা ভয় পেয়ে যাবে তাহলে।"

রাত্তিরের ব্যাপার বল্‌তে বল্‌তে যক্ষের একটা কথা মনে পড়ে গেল, মেঘকেও একবার বিশ্রাম নেবার কথা না বল্‌লে যেন অভদ্রতা হ'য়ে পড়ে, তাই সে আরও একটু মিষ্টি সুরে বল্‌তে লাগল, "বন্ধু, রাতটাও বেশী হ'য়ে পড়ছে, তার ওপর আবার মেয়েদেরকে পথ দেখাবার নাম ক'রে অতবার আলো দিয়ে তোমার প্রেয়সী বিদ্যুৎ নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হ'য়ে পড়বেন, তাই বল্‌ছি ভাই, যখন দেখবে কোনও বাড়ীর পায়রাটীও আর জেগে নেই, অমনি সেই বাড়ীর ছাদে নেমে এসে সুখে খানিকটা ঘুমিয়ে নিও। অবশ্য আবার সূর্য্য উঠলেই যে তুমি জেগে উঠবে, সে আমি খুব ভাল করেই জানি, কেন-না, তোমার মত লোক যখন পরের কাজের একটা ভার নিয়েছে, তখন মিছামিছি দেরি সে কিছুতেই কর্‌বে না।

ঠিক এই ভোর হবার সময়টায়, বাইরে যাঁরা সব রাত কাটিয়ে এসেছেন, তাঁরা বাড়ী ফিরে স্ত্রীদের সোহাগ জানিয়ে তাদের চোখের জল মোচাচ্ছেন, যেন তাই দেখেই সূর্য্যদেবও উঠ্‌তে উঠ্‌তে কমলিনীর সে শিশির-সিক্ত মুখখানির শিশিররূপ অশ্রু রশ্মিরূপ হাত দিয়ে মুছিয়ে নিচ্ছেন। কাজেই বন্ধু, এ সময়টা একটু দূরেই থেকো, সূর্য্যদেবকে আড়াল করো না, কর্‌লে তিনি রেগে উঠ্‌বেন।

আরো খানিকটা গেলেই গম্ভীরা নদী দেখ্‌তে পাবে। কি স্বচ্ছ, কি নির্ম্মল তার জল, ভাই ; তুমি যখন তার উপর দিয়ে যাবে তোমার ও মূরতি একেবারে তার হৃদয়রূপ জলের ভিতর গিয়ে পড়বে, আর সেই সময় যদি ছোট ছোট চক্‌চকে পুঁটি মাছগুলো খেল্‌ছে দেখতে পাও, তোমার মনে

হবে বন্ধু, নদীই যেন তোমার দিকে চেয়ে কটাক্ষ হান্‌ছে। কাজেই একে উপেক্ষা করা উচিত হবে না তোমার।

এ সময় জলও তার শুকিয়ে এসেছে। তীর থেকে অনেক নীচে সে নীল জল এমন ভাবে রয়েছে, দেখ্‌লে মনে হবে যেন কোন সুন্দরীর নীল শাড়ীখানি কোমর হ'তে খসে পড়ছে। একপাড়ে একটা বেতের ঝোঁপ দেখ্‌তে পাবে, নুয়ে একেবারে জলের ভিতর গিয়ে পড়েছে, ঠিক যেন সুন্দরী তার সে খসে-পড়া নীল শাড়ীখানি হাত দিয়ে কোনও গতিকে ধ'রে রয়েছে। এ অবস্থায় একে ছেড়ে যেতে তোমারও হয়ত দেরি হবে, কোন্‌ রসিক পুরুষই বা এমন কাপড় খ'সে পড়েছে যে-যুবতীর তাকে ছেড়ে চট্‌ করে অন্য কোথাও চ'লে যেতে পারে ?

এবার পাবে দেবগিরি। তোমারই বৃষ্টি-ভেজা মাটির গন্ধ ব'য়ে এনে বাতাস, দেখো, তোমাকেই কেমন ধীরে ধীরে বাতাস করবে, বন্ধু। এই গন্ধেরই লোভে বুনো হাতীরা দলে দলে এসে শুঁড় উঠিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেবে ; আর এই জলো-হাওয়া পেয়েই ডুমুর গাছে ডুমুর ফল পাকতে আরম্ভ হবে। এই দেবগিরিতে সূর্য্য অপেক্ষাও তেজস্বী দেব-সেনাপতি কার্ত্তিক বাস করেন। অসুরের হাত হ'তে দেবতাদের উদ্ধার করবার জন্য মহেশ্বর এঁর জন্ম দেন। তুমি বন্ধু, তাঁর মাথায় মন্দাকিনী নদীর জলে ধোওয়া পুষ্পের বৃষ্টি ক'রে তাঁকে স্নান করিয়ে দিও। তাতেই তাঁর পূজা হবে।

পাহাড়ের ভিতর দিকে এসে পড়বে ব'লে, গর্জ্জনও তোমার বেশ গুরুগম্ভীর শোনাবে, আর তোমার সে ধ্বনি শুনলেই দেবসেনাপতির ময়ূরটা আহ্লাদে নেচে উঠবে। এত আর যে-সে ময়ূর নয়, বন্ধু, এর সুদৃশ্য পুচ্ছ খ'সে পড়লে স্বয়ং মা-ভবানী সেটা সাদরে তুলে নিয়ে কানের দুলে গুঁজে রাখেন, অবশ্য, বুঝতেই পারছ ত যে পুত্রস্নেহের খাতিরেই ময়ূরের এত খাতির! আবার দেখবে মহাদেবের মাথার চাঁদের কিরণ লেগে ময়ূরের চোখ দুটা কি উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

কার্ত্তিক-পূজা সেরেই ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ো, বন্ধু। পথে দেখবে যুগলমূর্ত্তি সিদ্ধরা বীণা বাজিয়ে চ'লেছে। তোমায় দেখলেই তাড়াতাড়ি

স'রে গিয়ে তোমার পথ ছেড়ে দেবে (পাছে তোমার জল লেগে তাদের বীণার তার ভিজে গিয়ে খারাপ হয়ে যায় এই ভয়ে)। আর খানিকটা গেলেই আবার একটা নদী দেখতে পাবে, সেখানে একটু দাঁড়িয়ে যেও। শুনেছি, এ নদীর একটা বিশেষত্ব আছে, রন্তিদেব নাকি যে গোমেধ যজ্ঞ করেন, এ নদী তাঁর সেই কীর্ত্তি থেকেই উৎপন্ন হ'য়েছে।

কি সুন্দর কালো বরণ তোমার ভাই, মনে হয় যেন সেই শ্যাম-সুন্দরেরই খানিকটা রূপ তুমি চুরি ক'রে নিয়েছ। আর ওই রূপ নিয়ে যখন তুমি নীচে নেমে এই নদীতে জল নিতে আস্‌বে, তখন আকাশ থেকে বহুদূর হতে যাঁরা দেখবেন—এ নদীটা অবশ্য ছোট নয়—তবু তাঁদের মনে হবে নদীটা খুব সূক্ষ্ম, যেন একটা মুক্তার মালা পৃথিবীর গলায় পরান আছে, আর তারই মাঝখানে তুমি, যেন সুন্দর একখানি বড় ইন্দ্রনীলমণি সে মুক্তাহারের শোভা বাড়াচ্ছ।

এ নদী পার হ'য়ে তুমি আবার চল্‌তে আরম্ভ ক'রে দিও, বন্ধু। এর পরেই হচ্ছে দশপুর। সে দেশের উপর দিয়ে যখন তুমি যাবে, সেখানকার সুন্দরীরা তোমার দিকেই চেয়ে থাক্‌বে। তাদের সেই সুন্দর চোখের কৌতূহলপূর্ণ এদিক্‌-ওদিক্‌ চাহনি দেখলে মনে হবে যেন বায়ুর বেগে কুঁদফুলগুলি নড়ে উঠছে, আর কালো ভোমরার দল সেগুলির পিছু পিছু ছুটাছুটি করছে।

দশপুর পার হলেই তুমি ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রবেশ করবে। প্রথমেই সেই বিখ্যাত কুরুক্ষেত্রের মাঠ, ক্ষত্রিয়দের মহাযুদ্ধের আজো সাক্ষ্য দিচ্ছে। জলের ধারা ঢেলে তুমি যেমন পদ্মের কলি বিনষ্ট ক'রে ফেল, গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনও তেমনি তাঁর শত শত তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে কত রাজার যে মাথা কেটেছিলেন, কে তার সংখ্যা করে, ভাই ?

এর পাশেই সরস্বতী নদী। দু'পক্ষই তাঁর বন্ধু ব'লে কুরুপাণ্ডবের মহাযুদ্ধে বলরাম যোগ দেন নাই। সেই সময়টা তিনি বাস করতেন এই সরস্বতীরই তীরে। এর জলের গুণের কথা আর কি বলব, বন্ধু, স্বয়ং বলরাম তাঁর প্রেয়সী রেবতীর মদির নয়নের মত রক্তবর্ণ, সুস্বাদু সুরা ফেলে এরই জল পান করে দিন কাটিয়েছেন। তাই বলি ভাই, এর জল

খানিকটা পান করে নিও। নির্ম্মলজলে তোমার ভিতরটাও নির্ম্মল হবে, বাহিরে অবশ্য তুমি যে কালোমাণিক সেই কালোমাণিকই থাকবে।

তারপর কন্‌খল পার হ'লেই তুমি একেবারে ভাগিরথীর তীরে এসে পড়বে। কত উঁচু হিমালয় পর্ব্বত, সেইখান থেকে নেমে এসেছেন এই জহ্নু্‌কন্যা গঙ্গা, দেখ্‌লে মনে হয় যেন সগর রাজার বংশধরদের উদ্ধার কর্‌বার জন্যই স্বর্গে যাবার সিঁড়ি হয়ে রয়েছে।

দিগ্‌হস্তীরা যেমন পিছন দিকে পা লম্বা ক'রে শুয়ে জল পান করে, তুমিও যদি বন্ধু, এই গঙ্গার নির্ম্মল জল পান করবার সময়, তাদেরই মত একটু বেঁকে খুব নীচে নেমে এস, তাহ'লে গঙ্গার সে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জলে তোমার ছায়া যখন পড়বে, ঠিক মনে হবে যেন এখানেও আবার সেই গঙ্গাযমুনারই মিলন হয়েছে।

তারপর বন্ধু, আরও খানিকটা উঁচুতে উঠলে গিয়ে পৌঁছিবে একেবারে সেই পাহাড়ে ঠিক যেখান থেকে গঙ্গা নদীর উৎপত্তি হয়েছে। সেখানে অনেক হরিণ বসে থাকে। এই পাহাড়ের চূড়ো সদাই বরফে ঢাকা, তুমি যদি খানিকক্ষণ সেই বরফের উপর বিশ্রাম নাও, দূর হতে দেখে মনে হবে যেন মহাদেবেরই প্রকাণ্ড সাদা বৃষটি মাথায় পাঁক মেখে দাঁড়িয়ে আছে।

ঝড় বইলে সেখানকার প্রকাণ্ড বনে দেবদারুগাছ পরস্পরে ঠুকে গিয়ে মাঝে মাঝে ভীষণ আগুন জ্বলে ওঠে। সে আগুনে সকলকারই বিশেষত চমরীমৃগদের কষ্টের আর শেষ থাকে না। তুমি ভাই, মুষলধারে যত পার বৃষ্টি ঢেলে এ আগুন নিভিয়ে দিও। বিপন্ন যারা—তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যই ত মহতের সম্পদ—নয় কি ?

ওই হিমালয় পর্ব্বতেই অষ্টাপদ বলে একরকম হরিণ দেখতে পাবে। তারা তোমায় দেখে দলে দলে ছুট্‌তে থাক্‌বে, তুমি অবশ্য তাদের যাবার পথ থেকে স'রে এস, তবুও যদি তাদের মধ্যে কেউ কেউ সোজা চ'লে না গিয়ে তেড়ে এসে তোমায় ডিঙিয়ে যাবার জন্যে লাফাবার চেষ্টা ক'রে, তুমি খুব শিলাবৃষ্টি ক'রে তাদের নিরস্ত করো। নইলে বেচারীদের কোন অঙ্গ ভেঙ্গে যেতে পারে। যে কাজ করা যায় না সে কাজ করবার মিথ্যা চেষ্টা যে করে, লাঞ্ছনা তার সইতে হবেই।

এই পথটা ভাল ক'রে চলো, বন্ধু, এইখানকারই একটা শিলায় দেবাদিদেব মহাদেবের শ্রীচরণের সুস্পষ্ট চিহ্ন আছে দেখতে পাবে। যোগী পুরুষেরা সর্ব্বদাই এ চরণ বিধিমত পূজা ক'রে থাকেন, যিনি কেবল দর্শনও করেন সমস্ত পাপ তাঁর খণ্ডে যায়, এ দেহ ত্যাগ করবার পর তিনি মহাদেবের একজন গণ হয়ে প্রভুর পাশেই থাকতে পান। তুমি ভাই, খুব ভক্তি সহকারে এ শ্রীচরণ-চিহ্নটী আগে প্রদক্ষিণ ক'রে নিও।

ওখানে আবার কিন্নরদের মেয়েরা সবাইমিলে একসঙ্গে সুমিষ্ট কণ্ঠে যখন মহাদেবের ত্রিপুরবিজয়ের গান গায়, সেই সময় বাঁশঝাড়ের ছিদ্রে ছিদ্রে বাতাস গিয়ে কি সুন্দর ধ্বনি হয়, বন্ধু, দূর থেকে মনে হয় যেন কেউ গানের সঙ্গে বাঁশী বাজাচ্ছে, আর তুমি যদি সেই সময় পাহাড়ের গুহার মধ্যে গিয়ে মৃদুমধুর গর্জ্জন করতে থাক, তা'হলে সুন্দর তাল দেওয়ার কাজ হবে, পশুপতির কাছে এ গানের আর কোন অংশই অপূর্ণ থাকবে না।

হিমালয়ে দেখবার অনেক জিনিষই আছে, সেসব তাড়াতাড়ি পার হয়ে তুমি ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের ছিদ্র দিয়ে বরাবর উত্তর দিকে চ'লে যাবে। এই ছিদ্র-পথ দিয়েই হংসের দল মানসসরোবরে যায়। পরশুরাম নিজে এই পাহাড়ে পথটী ক'রে গেছেন,তাই আজও লোকেরা তাঁর এ কীর্ত্তি ভোলেনি। তুমি বন্ধু, এই পথ দিয়ে দেহটী বেশ লম্বা ক'রে নিয়ে যখন উপর দিকে যাবে, নিশ্চয়ই মনে হবে, যেন বলিরাজকে ছলনা করবার জন্যই ভগবান্ বিষ্ণুর সুশ্যাম একখানি পা স্বর্গের দিকে উঠে যাচ্ছে।

তুমি আরও খানিকটা উপরে উঠলে একেবারে, বন্ধু, কৈলাস পাহাড়ে গিয়ে পড়বে। রাক্ষসরাজ রাবণ হাত দিয়ে এমন জোরে একে নড়িয়েছিলেন যে,এ পাহাড়ের সন্ধিস্থানগুলি সব ফাঁক ফাক হয়ে গেছে। বারোমাস বরফে ঢাকা এ পাহাড়ের চূড়ো দেখলে মনে হবে যেন দেবকন্যাদেরই মুখ দেখবার একখানি সুবৃহৎ আয়না খাড়া ক'রে কে রেখে দিয়েছে। এর আশে পাশে দেখতে পাবে পাহাড়ের ছোট ছোট চূড়ো পাশাপাশি সাজান রয়েছে, সব ক'টাই কুঁদফুলের মত সাদা বরফে ঢাকা, দেখ্লে মনে হয় যেন

মহাদেবের প্রতিদিনকার বিরাট অট্টহাসি আকাশের গায়ে জমাট বেঁধে রয়ে গেছে।

এই কৈলাসের একেবারে বুকে গিয়ে উঠবে, বন্ধু। আহা, সদ্যচেরা হাতীর দাঁতের মত এর রং, আর নূতন কাজলের মত নীলাভকৃষ্ণ তোমার রং। আমি যেন মনশ্চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি ভাই, তোমরা দুটীতে কাছাকাছি রয়েছ, আর দেখাচ্ছে যেন গৌরকান্তি বলরাম সুন্দর একখানি শ্যামলী রংয়ের চাদর গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

এই কৈলাস পাহাড়েই মাঝে মাঝে হরপার্ব্বতী দুজনে পাশাপাশি হাতধরাধরি ক'রে তাঁহাদের বিহার-শৈলে বেড়াতে যান, মহাদেবের হাতে অবশ্য সে সময় সাঁপের বলাটালা কিছুই থাকে না। তুমি যদি দেখ্‌তেই পাও তাঁরা বেড়াতে যাচ্ছেন, তা'হলে বন্ধু, তোমার সমস্ত বাষ্প জমাট বেঁধে কষ্টিপাথরের সিঁড়ির মত ধাপের পর ধাপ হয়ে মা-দুর্গার সামনে তাঁর পায়ের কাছে শুয়ে পড়ো। উঁচু পাহাড়ে ওঠবার কষ্ট তা'হলে তাঁর আর থাক্‌বে না।

রূপসী দেবকন্যারা তোমায় কাছে পেয়ে কৌতুক করবার জন্যে তাদের সে কোমল হাতের কঠোর বালার ঘা দেবে, আর তোমার ভিতর থেকে ফোয়ারার মত জল বেরুতে থাকবে। এমন গরমের দিনে, তোমার মত আরামের জিনিষ পেয়ে যদি তারা খেলাতে মেতেই থাকে, না ছাড়্‌তে চায় তোমায়, তা'হলে তুমি ভাই, বেশ দু' একবার গর্জ্জন ক'রে উঠো, তারা ভয় পেয়ে তোমায় ছেড়ে দিতে পথ পাবে না।

সেইখানেই ভাই মেঘ, তুমি মানসসরোবর দেখ্‌তে পাবে, এই মানসসরোবরে সোনার পদ্ম ফোটে, এর জল খানিকটা তোমার পান করা চাই-ই। হয়ত ঐরাবত হাতীও সেখানে থাকবে, সে সময় যদি খানিক জল বর্ষণ করো, ঐরাবত মহাখুসী হয়ে তোমার দিকে চেয়ে থাক্‌বে। কল্পদ্রুমের বন ত আছেই সেখানে, রেশমের মত খুব সূক্ষ্ম তাদের পল্লব, তুমি ভাই, তোমার মেঘলা বাতাস দিয়ে সেগুলি কাঁপিও, দেখবে মজা মন্দ লাগবে না।

খানিকক্ষণ এমনি ক'রে হিমালয়ে কাটিয়ে আবার একবার যাত্রা

সুরু করো, এবার আর বেশী দূর যেতে হবে না, সাম্‌নে দেখলেই চিন্‌তে পারবে, প্রিয়তমের কোলে প্রেয়সীর মত কৈলাসের শিখরে যক্ষপুরী 'অলকা', তারই গা দিয়ে গঙ্গানদী ব'য়ে যাচ্ছে, দেখ্‌লে তোমার মনে হবে যেন নায়িকারই পরণের কাপড়খানি শিথিল হ'য়ে খুলে পড়্‌ছে। এখানকার বাড়ীগুলি খুব উঁচু, আকাশ যেন ভেদ ক'রে উঠেছে। বর্ষাকালে এই সব বাড়ীর মাথায় যখন মেঘ জমে আর বৃষ্টি হয়, তখন তোমায় আর কি বল্‌ব, ভাই, মনে হয় যেন রূপসী তরুণীরা তাদের কালো চিকুর কেশে মুক্তার জাল প'রে দাঁড়িয়ে আছে।"

উত্তর মেঘ

যক্ষ তখন ব'লেই চ'লেছে, "বন্ধু, সেই অলকার প্রাসাদগুলির তুলনা কেবল তোমার মধ্যেই পাওয়া যায়। তোমার ভিতরে যেমন বিদ্যুৎ আছে, প্রাসাদগুলির ভিতরেও তেমনি বিদ্যুৎবরণা রূপসীরা থাকে। তোমার গায়ে রামধনু, তাদেরও দেওয়াল রং বেরং-এর চিত্র করা। তুমি যেমন মৃদু মধুর ধ্বনি ক'রে ওঠ, তাদেরও ভিতর থেকে তব্‌লার সেই রকম মিঠে আওয়াজ আসে। তোমার ভিতরে যেমন জল, তাদের ভিতরে তেমনি মণি; আর উচ্চতায় তুমিও যেমন আকাশ ছুঁয়ে থাক, তারাও তেমনি আকাশ ছুঁয়ে আছে।

ভাই হে, এ অলকার সুন্দরীদের হাতে পদ্মের কলি, মাথায় কুঁদ ফুলের মালা, মুখে সৌন্দর্য্য বাড়াবার জন্য লোধ্র ফুলের রেণু মাখা, খোপায় নূতন কুরবকের কুঁড়ি, কানে শিরীষ আর সীমন্তে কদম ফুল—সব ঋতুর ফুলই এখানে এক সঙ্গে দেখতে পাবে ভাই।

আর দেখ্‌তে পাবে, এ অলকায় ফুল গাছে বারোমাস ফুল ফুটে রয়েছে, আর বারোমাসই এর মধু খেতে গুন্ গুন্ ক'রে ভোমরার দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুষ্করিণীতে দেখ্‌বে ভাই, সারা বছর এতে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে; আহা যখন রাজহংসের দল জলের উপর সারি দিয়ে ব'সে থাকে, মনে হয় যেন সরসীর নিতম্বে চন্দ্রহার শোভা পাচ্ছে। সেখানকার বাড়ীর পোষা ময়ূরেরা রোজই নৃত্য করে, তাদের সে পুচ্ছের বাহার কখনও ম্লান হ'তে জানে না। রাত্তিরে আঁধার নেই, বারোমাসই এখানে স্নিগ্ধ চাঁদের আলো, সে জ্যোৎস্নাও ভাই নিত্য, না আছে তার হ্রাস, না আছে তার ক্ষয়।

এ ধনীর দেশে এক আনন্দে ছাড়া আর অন্য কোন কারণেই চোখের জল কারো পড়ে না। প্রণয়ীদের মান অভিমানের পালা ছাড়া এখানে কলহ ব'লে আর কিছুই নেই। দুঃখকষ্টের কথা? মদন ঠাকুরটাই যা মাঝে মাঝে পীড়া দেন, নইলে অন্য দুঃখকষ্ট যে কি জিনিষ, সে খবর অলকার লোক রাখে না, আর তাও সে কষ্ট প্রণয়ীদের মিলন হ'লেই

সেরে যায়। এখানকার আর একটা মজা কি জান? যৌবন ছাড়া আর অন্য বয়স নেই।

এ অলকার ঘরে ঘরে স্ফটিক বসান মেঝেতে রাত্রে তারার ছায়া যখন পড়ে, তখন মনে হয় যেন হাজার হাজার ফুল মেঝের উপর ছড়ান রয়েছে। আর এই সব মেঝের উপর বসে যক্ষরা তাদের রূপসী প্রেয়সীদের নিয়ে তবলা বাজিয়ে আর কল্প গাছের সুরা পান ক'রে কি আনন্দে যে প্রেমের উৎসবে মেতে থাকে, সে আর কি বল্‌ব, বন্ধু।

মন্দাকিনীর তীরে যক্ষদের মেয়েরা খেলা করতে আসে। কেউ কেউ সোনার বালির মধ্যে মণি মাণিক এনে লুকিয়ে রাখে, আর বাদ বাকী যারা থাকে তারা খুঁজে খুঁজে বার করে। এই তাদের খেলা। মন্দার গাছের অমন স্নিগ্ধ ছায়া, আর মন্দাকিনীর ঠাণ্ডা মিঠে বাতাস গায়ে লাগ্‌লেই তাদের সকল শ্রান্তি দূর হ'য়ে যায়। আর কি রূপসী মেয়ে তারা ভাই, দেবতারাও তাদের বিয়ে কর্‌তে পেলে নিজেদের ধন্য মনে কর্‌বে।

এ অলকার মজা অনেক। ঘরে এসে যক্ষরা যাই দেখে তাদের তরুণী প্রেয়সীর বসন হয়ত শিথিল হ'য়ে পড়েছে, তারাও অমনি দুষ্টামি ক'রে কাপড়খানা ধ'রে তাড়াতাড়ি টেনে নেবার চেষ্টা করে। রূপসীরা তখন লজ্জায় রাঙা হ'য়ে গিয়ে কাছে যা পায়, হোক্ না সে কুঙ্কুম বা চন্দনের গুঁড়া সেই গুলিই প্রদীপের দিকে ছুঁড়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে লজ্জার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করে। কিন্তু বন্ধু, সে রত্ন-প্রদীপ কি আর এত সহজে নেভে?

এখানকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাততলা বাড়ীর উপরকার তলার সাজান ঘরের মধ্যে বাতাস যখন তোমার মত দু'একটা মেঘকে ব'য়ে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে আসে, তাদের জল লেগে মূল্যবান্ ছবি ভিজে খারাপ হ'য়ে যায়। মেঘেরা করে কি, তখন ভয়ে ভয়ে জান্‌লা দিয়ে এমন কায়দায় বেরিয়ে আসে, যে দেখলে মনে হয় যেন বাড়ী থেকে ধোঁওয়া বেড়িয়ে যাচ্ছে।

অলকায় দেখ্‌বে শোবার ঘরের জানালায় চন্দ্রকান্ত মণি ঝোলান

থাকে। গভীর রাতে আকাশে যখন মেঘ টেঘ কিছুই থাকে না, তখন চাঁদের কিরণ লেগে সেই চন্দ্রকান্ত মণি থেকে ফিন্ ফিন্ ক'রে অতি স্নিগ্ধ জল বার হয়। সেই জল ঘরের ভিতরে যে সব সুন্দরীরা আমোদ প্রমোদের পর প্রিয়তমের শিথিল আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে নিদ্রা যান, তাঁদের গায়ে লেগে সমস্ত শ্রান্তি যেন মুছিয়ে দেয়।

আবার দেখ্‌বে বন্ধু, সহরের বাহিরে 'বৈভ্রাজ' ব'লে সাধারণের বেড়াবার যে বাগান আছে, সেখানে রোজই কত বাবুর দল—ঘরে যাদের অফুরন্ত ধনরত্ন রয়েছে, তারা 'সখের' মেয়ে মানুষ নিয়ে এখানে বেড়াতে আর ফুর্ত্তি কর্‌তে আসে। যক্ষরাজের যশ গেয়ে বেড়ান যাদের কাজ সেই সুমিষ্ট-কণ্ঠ কিন্নররাও তাদের সঙ্গে এখানে কত গল্প করে।

রাত্তির বেলা এখানকার যে সব সুন্দরীরা লুকিয়ে তাদের নাগরদের বাসায় রাত কাটাতে যায় সকাল বেলা সুর্য্য উঠ্‌লে দেখ্‌বে রাস্তার উপর তাদেরই খোপা থেকে মন্দার ফুলের মালা, কিংবা হয়ত কানের সোনার পদ্মের দু'একটা ভাঙ্গা পাপড়ি কি মাথারই হয়ত মুক্তার জাল ছেঁড়া, কিংবা বক্ষ হ'তে ছেঁড়া খানিকটা সোণার হার পড়ে রয়েছে।

যক্ষপতির বন্ধু মহাদেব যে স্বয়ং এখানে বাস করেন, সে কথা ত তোমায় আগেই বলেছি, সেই জন্যই পুষ্পধনু নিয়ে আস্ফালন কর্‌তে মদন আর সাহস করে না। তাই ব'লে বন্ধু, মনে ক'রো না যেন, যে কামদেবটার কোনও প্রভাব নেই এখানে। সুন্দরীরা যখন কৃপা ক'রে প্রণয়ীদের দিকে কুটিল কটাক্ষ ক'রে নয়না হানে, তখন তাদের সে অপাঙ্গ শরেই পুষ্পধনুর কাজ হ'য়ে থাকে।

এখানকার কল্পবৃক্ষের অশেষগুণ ভাই, রূপসীদের সাজগোজের সব রকম জিনিষ এ একাই যুগিয়ে থাকে। এরই খুব সূক্ষ্ম তন্তু থেকে সুন্দরীদের রকমারি কাপড় তৈয়ারি হয়, সুন্দর সুন্দর ফুল যা ফোটে, তা' ফেলে আর কারো অন্য অলঙ্কার পরবার দরকার হয় না। উৎকৃষ্ট সুরা ফেলে দিয়ে এরই মধু তারা খায়; আর যা সুন্দর লাক্ষারস পাওয়া যায় এ থেকে, তরুণীরা পায়ে আল্‌তা দেবার সময় কেবল সেই লাক্ষারসই ব্যবহার ক'রে থাকে।

অলকায় গিয়ে যক্ষরাজের প্রাসাদ পার হ'য়ে একটু উত্তর দিকে গেলেই আমার বাড়ী দেখ্‌তে পাবে। দূর হ'তেই দেখ্‌তে পাবে ঠিক ইন্দ্রধনুর মত এর ফটক, ফটকের পাশে একটা মন্দার ফুলের গাছ স্তবকের ভারে নুয়ে পড়েছে, হাত দিয়ে তার ফুল পাড়তে পারা যায়। এই গাছটি ভাই, আমার প্রিয়া, নিজের হাতে তার ছেলের মত যত্ন ক'রে বড় ক'রেছে।

ফটকের ভিতর ঢুকলে আমার বাড়ীর পুকুর দেখ্‌তে পাবে। এই পুকুরের ঘাটের সিঁড়িগুলি ভাই, পান্না দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছি। এ পুকুরের পদ্ম দেখ্‌বে সোনার, তাদের আবার ডালগুলি হ'চ্ছে নীলার। যে রাজহংসেরা এখানে মনের সুখে খেলা করে, সাঁতার কাটে, তারা বন্ধু, এ পুকুর ছেড়ে অত কাছে যে মানসসরোবর সেখানেও যেতে চায় না, এমন কি তোমায় দেখ্‌লেও নয়। বুঝ্‌ছ, কি সুন্দর পুকুর ?

সেই পুকুরের ঠিক ওপারে আমাদের বেশ একটী চমৎকার ছোট্ট সাজান পাহাড় আছে, চুড়োটা তার বহুমূল্য নীলা দিয়ে তৈরী করিয়েছি। এরই চারিপাশে সোনার কলাগাছ বসান আছে ব'লে কি সুন্দর যে মানিয়েছে তার তুলনা তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না। দুঃখের কথা আর কি বল্‌ব বন্ধু, গিন্নীরই এই সব সখ। তোমার দেহের ওই কালো রূপ, আর সোনার কলাগাছের মত ঐ বিদ্যুৎ যতই চোখে পড়ছে, সেই পাহাড়টীই খালি মনে পড়ে যাচ্ছে।

এই পাহাড়ে কুরবকফুলের গাছে ঘেরা মাধবীলতার একটী মণ্ডপ আছে, তারই দু'পাশে—একদিকে একটী লাল অশোকের গাছ, আর পাশে একটী সুন্দর বকুলগাছ দাঁড়িয়ে আছে দেখ্‌বে। জানইত ভাই, যে, মেয়েমানুষের পায়ের স্পর্শ না পেলে অশোকগাছে শীঘ্র ক'রে ফুল ফোটে না, আর সুন্দরী তার শ্রীমুখের উচ্ছিষ্ট মদ গোড়ায় না ফেল্‌লে বকুলগাছও অসময়ে ফুল দেয় না। আমাদেরও এ অশোক বকুল এ বিষয়ে ঠিক আছে। অশোকগাছটী ঠিক আমারই মত প্রিয়ার সে লালটুক্‌টুকে বাঁ পা খানির পরশ বুকে রাখ্‌তে চায়, আর

বকুল গাছটী ? আমারই মত সেও প্রিয়ার মুখের একটুখানি মদ পাবার আশায় যেন লোলুপ হ'য়ে চেয়ে থাকে।

এই অশোক আর বকুলগাছ দু'টার মাঝে দেখ্‌তে পাবে একটী সোনার দণ্ড রয়েছে, তার উপরে ময়ূরের বস্‌বার জন্য বেশ একটী স্ফটিকের দাঁড় আছে, আর তলায় নূতন বাঁশের যেমন রং, ঠিক সেইরকম রংয়ের অতি সুন্দর পান্না বসান রয়েছে। আহা, এরই কাছে, ঠিক এরই কাছে, ভাই, প্রিয়া আমার রোজ ব'সে তোমারি বন্ধু ময়ূরকে হাততালি দিয়ে নাচাত, আর তার সে কোমল হাতের চুড়িগুলি যখন পরস্পরে ঠুকে বেজে উঠ্‌ত কি সুন্দর যে তালের কাজ হ'ত বন্ধু, কি বল্‌ব তোমায় !

বাড়ীর আশপাশের কথা এতক্ষণ যা বল্লাম, বুদ্ধিমান্ তুমি, নিশ্চয়ই তোমার মনে থাক্‌বে সে সব। এবার তোমায় বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ কর্‌তে হবে। বাড়ীর দরজার দু'ধারে দেখ্‌বে শঙ্খ আর পদ্ম আঁকা রয়েছে। ঘরের কথা আর কি বল্‌ব বন্ধু, আমিই নেই, ঘরগুলির সে পূর্ব্বের 'ছিরি' কি আর আছে এখন! জানইত সূর্য্য না থাক্‌লে পদ্মের কি 'ছিরি' হয়।

ঘরের ভিতর সহজে প্রবেশ কর্‌তে হ'লে, তোমার এ চেহারা ত চল্‌বে না, নিজেকে আরও ছোট ক'রে নিতে হবে তোমায়। তুমি ভাই, বেশ একটী ছোট্টখাট্ট হাতীর ছানার মত হ'য়ে পূর্ব্বে যে খেলার পাহাড়টার কথা ব'লেছি, প্রথমে সেই পাহাড়টায় খানিক বিশ্রাম ক'রে নিয়ে বাড়ীর ভিতরটা একবার তোমার ওই বিদ্যুৎরূপ দৃষ্টি দিয়ে ভাল ক'রে দেখে নেবে। সে অল্প অল্প বিদ্যুৎ যে দেখবে নিশ্চয়ই তার মনে হবে যেন জোনাকী পোকার ঝাঁক পাহাড়ের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একটা ঘরে দেখ্‌তে পাবে একটী কৃশাঙ্গী যুবতী—যেমন সুন্দর তার দাঁতগুলি, তেমনি সুন্দর তার পাৎলা রাঙা ঠোঁট দু'খানি, আর সে চোখের কি সুন্দর চাহনি, দেখ্‌লেই তোমার চকিতনয়না হরিণীর কথাই মনে প'ড়ে যাবে। মধ্যস্থল তার ক্ষীণ, অথচ নাভী বেশ সুগভীর,

"আজকাল সে একলা ব'সে হাতের উপর মুখটি রেখে সদাই যেন কি ভাবে"

সে যেন নিতম্বের ভারে চলিতে পারে না। এত সুপুষ্ট তার বক্ষের গড়ন তার জন্যে যেন তাকে সাম্‌নে দিকে কিছু নুয়ে থাকৃতে হয়। তুমি দেখ্‌লেই বুঝ্‌বে ভাই, বিধাতা যেন সংসারে যুবতী সৃষ্টি ক'রে পাঠাবেন ব'লে তাকেই সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মাণ ক'রেছিলেন।

বুঝ্‌ছ ত, সেই তরুণীটাই হ'চ্ছে আমার দ্বিতীয় প্রাণ। আমি তার সহচর, এখন এত দূরে রয়েছি ব'লে চক্রবাক্ পাখীর মত একাই থাকৃতে হ'য়েছে তাকে, তাই হয়ত কারো সঙ্গে তার কথা কইতেই ভাল লাগে না। আহা, বয়স তার বেশী নয়, বিরহের এ সুদীর্ঘ দিনগুলো কি উৎকণ্ঠায় যে কাট্‌ছে তার, কে জানে। পূর্ব্বের মত সে রূপও কি আর আছে তার, শীতের হিমে দলিতা কমলিনীর মত নিশ্চয়ই সেও আমার মুষড়ে পড়েছে, ভাই।

হয় ত, তুমি গিয়ে দেখ্‌বে কেঁদে কেঁদে বেচারীর চোখ দু'টোই ফুলে গেছে। তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফেলে অমন সরস অধরোষ্ঠের সে লাবণ্যও যেন শুকিয়ে গেছে। আজকাল সে একলা ব'সে হাতের উপর মুখটা রেখে সদাই যেন কি ভাবে। চুলেরও আর সে যত্ন নেই, এলোমেলো চুল মুখের উপর যেখানে সেখানে এসে প'ড়ে মুখের সে সৌন্দর্য্যও কমিয়ে দিয়েছে। তুমি ঢেকে ফেল্লে চাঁদের যে দশা হয়, আমায় হারিয়ে প্রিয়ারও দেখ্‌বে ঠিক তেমনই দশা হ'য়েছে।

না, হয় ত দেখ্‌বে প্রিয়া তার ঠাকুর দেবতার পূজা নিয়েই ব্যস্ত হ'য়ে রয়েছে, আমারি মঙ্গল কামনায় তার পূজা। নয় ত দেখ্‌বে, নিজের মনে মনে আমারও একটা বিরহের অবস্থা কল্পনা ক'রে নিয়ে আমারই একটা সেই রকম চিত্র আঁকবার চেষ্টা কর্‌ছে। কিংবা হয় ত দেখ্‌বে, খাঁচায় তার যে পোষা সুকণ্ঠী শুকপাখীটা আছে, তাকেই আগ্রহভরে জিগ্যেস্ করছে, "বল্ শারি, বল্ আমার প্রাণনাথকে কি তোর মনে পড়ে, তিনি যে তোকে বড়ই ভালবাসতেন, শারি!"

না, হয় ত দেখ্‌তে পাবে মলিন একখানি কাপড় প'রে কোলের উপর সেতারটা নিয়ে আমার নামে গান বেঁধে সে গাইতে যাচ্ছে আর আমারই কথা মনে প'ড়ে গিয়ে চোখের জলে তার বীণার তার ভিজে যাচ্ছে, বাজান

যাচ্ছে না। আবার হয়ত কোনও গতিকে সামলে নিয়ে গান ধরেছে, আর একটু গাইতে না গাইতেই নিজেরই তাল লয় সব কেবলই ভুল হ'য়ে যাচ্ছে, গান গাওয়া আর হ'চ্ছে না।

কিংবা দেখ্‌বে হয় ত, প্রিয়া আমার দরজার চৌকাঠের উপর এক দুই ক'রে এক একটা ফুল রেখে আর ক'দিন বাদে আমায় দেখ্‌তে পাবে, তারই একটা হিসেব কর্‌ছে। না, হয় ত একলাটা ব'সে বিয়ের পর আমরা দু'জনে কি সুখেই যে দিনগুলি কাটিয়েছি পূর্ব্বেকার সেই মিলনের আনন্দটুকু কল্পনাতেই সে ভোগ কর্‌ছে। বিরহিণী তরুণীরা কি আর করে বল, এই ক'রেই ত তাদের দিন কাটে, ভাই ?

সকালে যাহোক তবু পাঁচটা কাজ থাকে, আমার বিরহে সে তত কষ্ট পায় না, কিন্তু ভাই, রাত্তিরে যখন কাজকর্ম্ম সব ফুরিয়ে যায়, তখন তার কি অবস্থা হয় ভাব দেখি। সেই সময় বন্ধু, সেই রাত্তিরেই বারান্দায় গিয়ে প্রিয়ার সঙ্গে দেখা ক'রে আমার একটা কথা ব'লে তাকে সুখী ক'রো। রাত্তিরে তার ঘুম আছে কি চোখে ? দেখবে, হয় ত মেঝের উপরেই শুয়ে আমার জন্যে সে সারারাতটাই 'হা-হুতাশ', কর্‌ছে।

গিয়ে দেখ্‌বে, শরীর তার একেবারে মাটি হ'য়ে গেছে, ষোল কলার চাঁদ যখন এক কলায় ঠেকে তখন তার আর কি সৌন্দর্য্য থাকে, বল! আগেকার সেই রাতগুলা, তাতে আমাতে যখন ছাড়াছাড়ি হয় নি, কত আমোদ-আহ্লাদে সে কাটিয়েছে, তখন মনে হ'ত রাত বুঝি নিমেষের মধ্যে কেটে গেল। আর এখন সেই রাত—কি দীর্ঘ এই বিরহের রাত, একপাশ ফিরে শুয়ে কেঁদে কেঁদেই তাকে কাটাতে হয়।

ঘরের সেই জান্‌লাটা দিয়ে চাঁদের জ্যোৎস্না এখনও আসে, পূর্ব্বে যেমন আসত, ঠিক তেমনি ক'রে। জ্যোৎস্না তার খুব ভাল লাগ্‌ত ব'লে, প্রিয়া জানালার কাছে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না দেখ্‌তে যায়। আর সেই জ্যোৎস্না চোখে পড়্‌লেই সে এখন তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নেয়। আগের সে সুখের দিনগুলা মনে প'ড়ে চোখের জলে তার নয়নপল্লব আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়। বাদলার দিনে স্থলপদ্মের মত তার চৈতন্য আছে কি নেই—বুঝাই যায় না।

দেখ্‌বে বন্ধু, আজ কাল সে না দেয় চুলে তেল, না করে তার কোনও যত্ন, কাজেই সে কঠিন রুক্ষ চুলগুলা তার গালের উপর এসে পড়েছে। হাত দিয়ে সরিয়ে দেবে সে ইচ্ছাও তার হয় না ভাই, কেবল যখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, সেই সময়ই যা চুলগুলি নিঃশ্বাসের বাতাস লেগে একটু আধটু স'রে যায়। তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসে অমন সুকোমল তার অধর সে অধরেরও মাধুর্য্য কমে গেছে। স্বপ্নে আমার দেখা পাবে এই আশায় সে ঘুমোবার চেষ্টা করে, কিন্তু চোখের জলে যখন তার বিছানা ভিজে যায় ঘুম যে তখন কোথায় লুকিয়ে পড়ে, কিছুতেই আর আস্‌তে চায় না তার কাছে।

তাতে আমাতে যে দিন ছাড়াছাড়ি হ'ল, ওঃ, কি গভীর দুঃখেই সে ফুলের মালা মাথা থেকে ফেলে দিয়ে তার অমন কালো চুলের গোছা শিখার মত বেঁধে রাখলে, ভাই, আমি যতক্ষণ না গিয়ে নিজের হাতে তার সে চুল খুলে দেব, ততক্ষণ সে আর তার কোন সংস্কারই কর্‌বে না। হাতের নখগুলিও সে কাটা ছেড়ে দিয়েছে, অত বড় বড় নখ নিয়েই ভাই, তার নরম রাঙা গালের-উপর-এসে-পড়া রুক্ষ চুলগুলি সরিয়ে দেয়। নখের আঁচড় লেগে মুখের সৌন্দর্য্য যে নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে সে দিকেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

গহনা পরবার অত সাধ, কিন্তু এখন একখানা গহনাও সে পরে না ভাই, সমস্তই খুলে ফেলে রেখেছে। বিচ্ছেদের দারুণ দুঃখে শরীরেও আর কিছু নেই তার, এতদিনে হয়ত সে আমার শয্যাগতই হ'য়ে পড়েছে। তার এখনকার অবস্থা দেখলে তোমারও ভাই, নিশ্চয়ই চোখের জল পড়্‌বে। ভিতরটা যাদের কোমল, পরের দুঃখ দেখলে মন তাদের কেঁদে উঠ্‌বেই।"

এই পর্য্যন্ত ব'লে যক্ষের মনে হ'ল মেঘ হয় ত মনে কর্‌ছে বলাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ছে। তাই সে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌ল, "ভাই মেঘ, এই সব কথা শুনে তুমি হয় ত মনে ভাব্‌ছ, যে স্ত্রী আমায় কত ভালবাসে সেটা খুব বাড়িয়ে ব'লে নিজের পত্নীসৌভাগ্যটা জাহির কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি, কিংবা ঝোঁকের মাথায় যা খুসী তাই ব'লে চলেছি। তা নয়, ভাই তা নয়। আমার উপর প্রিয়ার যে কি স্নেহভালবাসা, কি টান ছিল, সে ত আমি খুবই জানি, সেই জন্যই এই প্রথমবিচ্ছেদের দিনে তার যে কি

অবস্থা হচ্ছে সেটা যেন আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি ত যাচ্ছই সেখানে, যা বল্‌ছি তা ঠিক কি না নিজের চোখে সবই এখনি দেখ্‌তে পাবে।

নিশ্চয়ই দেখ্‌বে চোখে সে আর কাজল দেয় না, আলুথালু চুল চোখের উপর এসে পড়েছে। পূর্ব্বে আমার সঙ্গে দু'এক চুমুক সুরাপানও তার চল্‌ত। আজকাল আমিই নেই, সেও সব ছেড়ে দিয়েছে, কাজেই সে বিলোলচাহনিও সে ভুলে গেছে। তবে তুমি যখন যাবে তার কাছে, তোমায় দেখ্‌তে পেলে বাঁ চোখটী তার কাঁপ্‌তে থাক্‌বে তখন প্রিয়ার সে মনোহর চোখটী দেখ্‌লে মনে হবে যেন পুকুরের মধ্যে মাছেরা খেলা করাতে পদ্মের কলি এদিক ওদিক নড়ে বেড়াচ্ছে।

বাঁ চোখের মত প্রিয়ার বাঁ উরুটীও স্পন্দিত হ'তে থাক্‌বে। আহা, তাহার সেই সরস কলাগাছের মত সুন্দর উরু—তাতে ত' এখন আর আমার নখের দাগ পড়ে না! মুক্তার চন্দ্রহার পরাও ত সে দৈবের বিড়ম্বনায় ছেড়ে দিয়েছে। আমার সঙ্গে রাত জেগে যখন সে শ্রান্ত হ'য়ে পড়্‌ত কতবার যে তার সেই রাঙা পা দু'খানির সেবা ক'রে তার শ্রান্তি দূর ক'রেছি, কে তার ইয়ত্তা করে ভাই?

দেখো ভাই মেঘ, যাচ্ছ তুমি রাত্তিরে, যদি দেখ্‌তে পাও প্রিয়া আমার ঘুমিয়ে পড়েছে, টুঁ শব্দটী ক'রো না, বন্ধু। কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রো, নইলে তার ঘুম ভেঙে যেতে পারে। বুঝে দেখ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যদি সে স্বপ্নই দেখে যে, সে আমার গাঢ় আলিঙ্গনে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, তোমার শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেলে আমাদের সে স্বপ্নের মিলন-মধুর কণ্ঠালিঙ্গন আর কোথায় সে পাবে, ভাই?

তাই বল্‌ছি খানিক অপেক্ষা ক'রে, তারপর শীতল বাতাসের সঙ্গে তোমার স্নিগ্ধ জলের কণা কিছু কিছু মিশিয়ে দিও, প্রিয়ার গায়ে লাগ্‌লেই সে উঠে পড়্‌বে। তোমার জল লাগ্‌লে মালতীফুল যেমন ক'রে ফুটে ওঠে ঠিক তেমনি ভাবেই ধীরে ধীরে প্রিয়ার যখন চোখের পাতা খুলে গিয়ে জানালার বাহিরে সে তোমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাক্‌বে, তখন তুমি ভাই, তোমার ও বিদ্যুৎ-টিদ্যুৎ বেশ ক'রে নিজের ভিতরে পূরে

রেখে বেশ গুছিয়ে ধীরে ধীরে এই কথাগুলি তাকে বল্‌তে আরম্ভ কর্‌বে।

বল্‌বে, 'হে সধবা নারী, আমি মেঘ, আপনার স্বামীর একজন প্রিয়বন্ধু। তিনি আপনাকে গুটি কয়েক কথা বল্‌বার জন্য আমায় আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রেয়সীদের বিরহবেণী খোলবার জন্য স্বামীরা তাদের প্রবাস হ'তে ফিরে আস্‌তে আস্‌তে পথে যখন শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে, আমিই তখন স্নিগ্ধমধুর ধ্বনি ক'রে তাদের উৎসাহ বাড়িয়ে থাকি।'

তুমি যাই এই কথা বল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌বে, সীতাদেবী যেমন হনুমানের মুখ থেকে শ্রীরামচন্দ্রের কথা উৎকণ্ঠিতা হ'য়ে শুনেছিলেন, প্রিয়াও আমার তোমার দিকে চেয়ে আমার কথা এক মনে শুন্‌তে থাক্‌বে। জানই ত ভাই, স্বামীর কথা তাঁর আপনার লোকের মুখ থেকে শুন্‌তে পেলে কি আনন্দ না হয় মেয়েদের! স্বামীকে কাছে পেলে যে আনন্দ হয়, এ আনন্দ না হয় তার চেয়ে কিছু কম হোক, আর কি!

আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হও, পরের উপকার কর্‌লে, তোমার নিজের মঙ্গলও হবেই, ভাই। যেমন ব'লে দিচ্ছি তুমি সেইভাবে প্রিয়াকে বল্‌বে, যে, 'আপনার স্বামী এখন রামগিরি পাহাড়ের আশ্রমে রয়েছেন, তিনি বেঁচেই আছেন, আপনার কাছছাড়া হ'য়ে বড় কষ্টেই তাঁর দিন কাট্‌ছে। তিনি প্রথমেই আপনার কুশল জিজ্ঞাসা ক'রেছেন।' মানুষের কখন্ যে কি বিপদাপদ্ হয় কিছুই বলা যায় না ত, তাই প্রথমে কুশল জিজ্ঞাসা করাই উচিত।

তারপর প্রিয়াকে আবার বল্‌বে, 'দৈবের বিড়ম্বনায় আজ আপনার স্বামী বহুদূরে রয়েছেন। আপনাকে দেখ্‌তে না পেয়ে শরীর তাঁর শীর্ণ হ'য়ে গেছে, নয়নে তপ্ত অশ্রু সর্ব্বদাই ঝ'রে পড়্‌ছে, মনের উৎকণ্ঠা যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস হ'য়ে বার হয়। তিনি যখন মনে মনে আপনার সঙ্গে মিলনের সুখ অনুভব করেন, তখন তিনি ভেবে নেন যে, আপনার দশাও ঠিক তাঁরই মত হ'য়ে পড়েছে।

সখীরা কাছে থাক্‌লে যে স্বামী আপনার যে কথা চেঁচিয়ে বলাও

চলে, কেবল আপনার মুখে একবার মুখ দেবার লোভেই কানে কানে সেই কথা বল্‌বার ছল ক'রে আপনার মুখের কাছে মুখ আনতেন, তাঁকে এখন এমন এক জায়গায় থাকৃতে হ'য়েছে, যেখানে মুখের একটা কথা কি চোখের একটা দৃষ্টিও পৌছতে পারে না। তাই তিনি আজ পরের মুখ দিয়ে নিতান্ত উৎস্থকভাবে আপনাকে এই কথা ক'টী ব'লে দিয়েছেন।

'প্রিয়ঙ্গুলতার দিকে যখনি আমার চোখ পড়েছে, প্রিয়তমে, তোমারই সেই স্থকোমল দেহলতাটীই আমার মনে পড়েছে, হরিণীর সে চকিতচাহনি—তার মধ্যে যে আমি তোমারই সে মোহন দৃষ্টি দেখ্‌তে পাই। আকাশের বুকে চাঁদের হাসি, তোমার—তোমারই সেই মিষ্টি হাসিটী আমার মনে পড়িয়ে দেয়; আর যখনি দেখেছি ময়ুর তার দীর্ঘ পুচ্ছ নিয়ে কাছে এসেছে, কেবল তোমারি দীর্ঘ কেশ মনে প'ড়ে গেছে। নদীর জলের পানে যখন চেয়ে দেখেছি, তারও সে তরঙ্গ-ভঙ্গের মধ্যে, তোমারি ভ্রূ-ভঙ্গি যেন মূর্ত্তি নিয়ে উঠে এসেছে। কিন্তু প্রিয়ে, কি দুঃখের কথা, এ জগৎসংসারের মধ্যে এমন একটা কোন জিনিষ দেখ্‌লাম না, যার মধ্যে একসঙ্গে তোমার সব সাদৃশ্যগুলি পাওয়া যেতে পারে।

আবার যখনি আমি চেষ্টা ক'রেছি যে, তুমি আমার, মান ক'রেছ, আর আমি তোমার পায়ে ধ'রে মান ভাঙাচ্ছি, এই রকম একটা ছবি পাহাড়ের গায়ে আঁক্‌ব, তখনি কি পোড়া চোখের জল এসে দৃষ্টি আমার ঢেকে দিয়েছে। ওঃ, কি নিদারুণ বিধাতা! আমাদের এ ছবির মিলনও কি সে সহ্য করতে পারে না!

এমন কি, স্বপ্নে তোমার দেখা পেয়ে প্রিয়ে, বক্ষে তোমায় চেপে জড়িয়ে ধর্‌ব ব'লে কত আশা নিয়ে শূন্যের দিকেই হাত দু'টী বাড়িয়েছি, কিন্তু হায়! কোথায় তুমি সে সময়? এ অভাগার সে ব্যর্থতা দেখে বনের দেবতাদেরও মনে দুঃখ হয়। বৃক্ষের পল্লবের উপর মনে হয় যেন, তাঁদেরই মুক্তার মত অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ছে।

যখনি প্রিয়ে, উত্তর বাতাস দেবদারু গাছের পল্লব ভেঙে তার রসের স্থবাস ব'য়ে এই দক্ষিণ দিকে নিয়ে আসে, আমার মনে হয় হয় ত সে তোমারি একটা অঙ্গের পরশ নিয়ে আমার কাছে দিতে এসেছে।

কি আকুল আগ্রহে তাকে আমি আলিঙ্গন করতে ছুটে যাই, কেবল তোমারি অঙ্গের একটা স্পর্শ পাব এই আশায়।

কবেই যে এই সুদীর্ঘ রাতগুলা নিমেষের মত ছোট হ'য়ে যাবে, আর কি ক'রেই যে দিনের বেলার এই বিরামহীন তাপ একেবারে কমে যাবে। আজ আমি বেশ বুঝতে পারছি প্রিয়ে, এ প্রার্থনা আমার কখনও পূরণ হবে না, যতদিন না তোমার আমার এ নিদারুণ বিচ্ছেদদুঃখের শেষ হচ্ছে।

অনেক ভেবেচিন্তে নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দিয়েছি ; তুমিও প্রিয়ে, অত কাতর হ'য়ো না। দেখ, এ সংসারে কেউই নিরবচ্ছিন্ন সুখ, কি নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করে না। সুখ দুঃখ ঠিক চাকার মত ঘোরে, একবার উপরে যায় একবার নীচে আসে।

শ্রীহরি যেদিন অনন্তশয্যা হ'তে গাত্রোত্থান করবেন, অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের উত্থান একাদশীর দিন আমার এই প্রভুর অভিশাপ শেষ হবে। এই চারটে মাস কোনও গতিকে চোখ বুঁজে কাটিয়ে দাও। তারপর দু'জনে এই বিরহদিনের সমস্ত সাধ, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা শরৎকালের জ্যোৎস্না রাতে মনের সুখে মিটিয়ে নেব।'

এই পর্য্যন্ত ব'লে যক্ষের মনে হ'ল মেঘের কথা প্রিয়া যদি তার বিশ্বাস না করে, তাই সে আবার বল্‌লে, "ভাই মেঘ, তুমি প্রিয়াকে আমাদের একটা লুকান কথা ব'লো। বল্‌বে যে একদিন আমার কণ্ঠ আলিঙ্গন ক'রে রাত্রে তুমি ঘুমুচ্ছিলে ; হঠাৎ তুমি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌লে, দুজনারই ঘুম ভেঙে গেল। আমি বারবার জিগ্যেস্ কর্‌তে লাগ্‌লাম, কেন কাঁদছ ? তুমি তখন মুখ টিপে হেসে বল্‌লে, "দুষ্টু, আমি স্বপ্নে দেখ্‌লাম যেন তুমি আর কাকে নিয়ে প্রেম কর্‌ছ।"

এই কথাটাই তার পক্ষে বেশ নিদর্শন হবে, এখন, কি বল ভাই ? এর থেকেই সে বুঝ্‌তে পারবে আমি ভালই আছি, তবে আরও তাকে বলো যে, লোকের কথা শুনে ভেবে নিও না যে, আমার একটা ভাল মন্দ কিছু হ'য়েছে। হয়ত আবার কেউ কেউ বল্‌বে যে, বিচ্ছেদ হ'লেই স্নেহটা কমে যায়। সে কথা মোটেই ঠিক নয় ; ভালবাসার জিনিষ ভোগ করতে না পেলে তার প্রতি স্নেহটা দিনে দিনে প্রগাঢ় প্রেমে পরিণত হয়।

এইটাই তোমার বান্ধবীর প্রথম বিরহ, কাজেই কি দারুণ মনকষ্টই না সে পেয়েছে। তুমি ভাই, কোন প্রকারে তাকে আশ্বাস দিয়ে তার কাছ থেকে তার কুশল-বার্ত্তা আর একটা অভিজ্ঞান নিয়ে কৈলাস ছেড়ে যতশীঘ্র পার আমার কাছে চলে এসো। আমার প্রাণটাও বাঁচিও, ভাই। দেখ্‌তেই পাচ্ছ আমার দশা, যেন ভোরের বেলার কুঁদফুলটীর মত নেতিয়ে রয়েছি।

বন্ধুর এ উপকারটুকু করবে কি ভাই? চাতক চাইলেই নিঃশব্দে যেমন তুমি তাকে জল দাও; তেমনি তোমার এ মৌনই সম্মতির লক্ষণ ব'লে মেনে নিচ্ছি। অবশ্য, একটা জবাব পেলে তোমায় ধীর ব'লে মোটেই মনে হ'ত না। মহৎ যিনি তাঁর কাছে একটা প্রার্থনা করলে মুখে তিনি কিছু বলেন না বটে, কিন্তু কাজে তার মনস্কামনা পূরণ ক'রে থাকেন।

যদিও তোমার কাছে এরকম একটা প্রার্থনা ক'রে বসা উচিত নয়, তবু হে মেঘ, আমায় বন্ধু ভেবেই হোক কিংবা আমার দুঃখ দেখে সহানুভূতিতেই হোক আমার এ প্রিয়কার্য্যটি ক'রে দিও ভাই; তোমায় একান্তভাবে মিনতি করছি। প্রার্থনা করি—তুমিও যেন ইচ্ছামত নানা দেশে বর্ষার সৌন্দর্য্য নিয়ে গিয়ে ঘুরে বেড়াও, আর তোমার প্রিয়া বিদ্যুতের সঙ্গে একটী মুহূর্ত্তের জন্যও যেন তোমার বিচ্ছেদ না ঘটে।"

বিক্রমোর্ব্বশী

প্রথম পরিচ্ছেদ

তখনকার দিনে প্রতিষ্ঠানপুরের খুব নাম ছিল। প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা পুরূরবা ছিলেন যেমন সাহসী তেমনি যোদ্ধা।

একবার তিনি হিমালয় পর্ব্বতের সূর্য্যমন্দিরে সূর্য্যদেবের পূজা করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে উপাসনাদি সারিয়া হিমালয়ের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে আসিতেছিলেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, যেন কয়েকটী নারী আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছেন, "ও গো, কে কোথায় আছ, রক্ষা করো।"

পুরূরবা তখনই যেখান হইতে চীৎকারের শব্দ আসিতেছিল, সেখানে গিয়া দেখিলেন, কতকগুলি অপ্সরা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছেন, আর 'রক্ষা করো গো', 'রক্ষা করো গো', বলিয়া সভয়ে চীৎকার করিতেছেন। পুরূরবা তাঁহাদের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের কি হয়েছে, অমন :করছেন কেন?" তখন অপ্সরাদের মধ্যে রম্ভা বলিলেন, "মহারাজ, আমরা যক্ষপতি কুবেরের ভবনে নৃত্যগীত করিয়া এই পথ দিয়া যাইতেছিলাম, এমন সময় একটা হতভাগা দৈত্য আসিয়া আমাদের প্রিয়সখী উর্ব্বশীকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।"

"বটে! কোন্ পথ দিয়া গিয়াছে বল ত?" বলিয়াই পুরূরবা ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিলেন। রম্ভা হাত দেখাইয়া বলিলেন, "ঈশান দিক দিয়া।"

"আচ্ছা, তোমরা হেমকূট শিখরে অপেক্ষা কর, আমি এখনই তোমাদের সখীকে উদ্ধার করিয়া আনিতেছি", এই বলিয়া পুরূরবা সারথিকে ঈশানদিকে রথ ছুটাইতে বলিলেন। অতিবেগে তাঁহাদের রথ চলিতে লাগিল। খানিক দূরে গিয়াই পুরূরবা দেখিতে পাইলেন কেশী নামক এক দৈত্য উর্ব্বশী ও তাঁহার এক সহচরী চিত্রলেখাকে লইয়া

পলায়ন করিতেছে। পুরূরবা তখনই দৈত্যের সম্মুখে গিয়া তাহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন, দৈত্যও গতিক সুবিধা নয় বুঝিয়া উর্ব্বশী ও চিত্রলেখাকে ছাড়িয়া যেদিকে পাইল পলাইয়া গেল। পুরূরবা তাঁহাদিগকে আপনার রথে উঠাইয়া হেমকূটশিখরে তাঁহাদের সখীদের নিকটে লইয়া চলিলেন।

এদিকে রম্ভা, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরারা উৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন, কখন পুরূরবা তাঁহাদের সখীকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিবেন। তার পর যখন তাঁহারা দূরে পুরূরবার হরিণচিহ্নিত 'সোমদত্ত' নামক রথ দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের মনে হইল নিশ্চয়ই মহারাজ অকৃতার্থ হইয়া অসিতেছেন না; তাঁহারা নানারূপ কল্পনা জল্পনা করিতে লাগিলেন।

উর্ব্বশীকে যখন পুরূরবা দৈত্যের কবল হইতে উদ্ধার করেন, তিনি তখন ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন; চিত্রলেখার যত্নে যখন তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, সম্মুখে রতিপতির মত সুন্দর পুরূরবাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, মনে মনে ভাবিলেন, 'দৈত্যপতি তাঁহাকে হরণ করিয়া তাঁহার উপকারই করিয়াছে,' তিনি তখন তাঁহাদের আর সব সখীরা কোথায় আছে চিত্রলেখাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। চিত্রলেখা নিজেই জানিতেন না, কাজেই পুরূরবা বলিলেন, "সুন্দরি, সাম্‌নে ওই হেমকূট দেখা যাইতেছে, ওই হেমকূটের শিখরে আপনার বন্ধুরা আপনাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিয়াছে; আমরা এখনই হেমকূটে পৌঁছুছিব।" তাঁহাদের রথ হেমকূটে আসিতেছে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া উর্ব্বশীর সখীরা তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি রথের কাছে আসিলেন। সখীকে যে পুনরায় দেখিতে পাইবেন এমন ভরসা অনেকেরই ছিল না, তাঁহারা উর্ব্বশীর নিকট গিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, উর্ব্বশী চিত্রলেখার হাত ধরিয়া রথ হইতে নামিয়া সকলকে একে একে আলিঙ্গন করিলেন, সকলেরই চোখে জল, আনন্দ যেন আর কেহই চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। সেই সময় গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ সেখানে আসিলেন। চিত্ররথ ছিলেন পুরূরবার বন্ধু, তাই পুরূরবা

তাঁহাকে দেখিয়া রথ হইতে নামিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন।

চিত্ররথ বলিলেন, "বন্ধু, উর্ব্বশীকে কেশী দৈত্য ধরিয়া লইয়া গিয়াছে শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার উদ্ধার করিবার জন্য আমায় আদেশ করেন; পথে শুনিলাম আপনিই সে কাজ সারিয়া দিয়াছেন। চলুন, মহেন্দ্রের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসি, আপনি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়কার্য্য করিয়াছেন।"

পুরূরবা বলিলেন, "আমি আর ক'রেছি কি? দেবরাজের সহচরেরা যে সব যুদ্ধে জেতেন, তা'তে মহেন্দ্রেরই মহিমা প্রকাশ পায়, এখন আমার অমরাবতী যাইবার অবসর নাই। আপনি বরং উর্ব্বশীকে ইন্দ্রের নিকট লইয়া যান।"

পুরূরবার কথায় চিত্ররথ আপনার রথে উর্ব্বশী ও চিত্রলেখা প্রভৃতি অপ্সরাদিগকে উঠিতে বলিলেন।

রথে উঠিতে উঠিতে উর্ব্বশী চিত্রলেখাকে বলিলেন, "আমার ওড়নাটা গাছের লতায় আট্‌কে গেছে খুলে দে না, ভাই।" উর্ব্বশী কথা কহিতেছিলেন বটে চিত্রলেখার সঙ্গে, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ছিল পুরূরবার দিকে, ওড়নাটা ছাড়াইতে গিয়া চিত্রলেখা উর্ব্বশীর এ ছলটুকু ধরিয়া ফেলিলেন, তাই হাসিয়া বলিলেন, "তাই ত, ভয়ানক আট্‌কে গেছে দেখছি, এ খোলা ত আমার কর্ম্ম নয়।"

উর্ব্বশীও ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "আর জ্বালাস্ কেন? নিজের কথাগুলো ভুলে গেছিস্ বুঝি?"

"খুল্‌ছি গো, খুল্‌ছি," বলিয়া চিত্রলেখা উর্ব্বশীর ওড়নাটা খুলিয়া দিলেন; তার পর সকলে চিত্ররথের রথে উঠিয়া স্বর্গে ইন্দ্রের নিকট চলিয়া গেলেন, যতক্ষণ দেখা যায় উর্ব্বশী নির্ণিমেষ নয়নে পুরূরবাকে দেখিতে লাগিলেন, তার পর এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উদাসভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পুরূরবাও আপনার রথে উঠিয়া সারথিকে রথ চালাইবার আদেশ দিলেন।

রথ চলিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া রহিল সেই অপ্সরার কাছে। নিজের রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াও পুরূরবা মনে শান্তি পাইলেন না, উর্ব্বশীর সুন্দর মুখখানি সদাই তাঁহার মনে পড়ে, কেবলই মনে হয় আবার কবে উর্ব্বশীকে একবার দেখিতে পাইবেন। তিনি কাহারও সহিত আর ভাল করিয়া কথা কহেন না, রাজকার্য্যেও তেমন মন লাগে না, সদাই যেন অন্যমনস্ক ভাব। এমন কি মহিষী ঔশীনরীর কাছেও আর তেমন আসেন না, তাঁহার খোঁজখবরও নেন না। রাজার এ ভাব দেখিয়া রাণী ঔশীনরী ভাবনায় পড়িলেন; রাজা ত পূর্ব্বে এমন ছিলেন না, হঠাৎ কেন এমন হইল। সূর্য্যপূজা করিবার জন্য সেই যে হিমালয় পর্ব্বতে গিয়াছিলেন, তার পর হইতেই রাজা যেন মনমরা হইয়া গিয়াছেন। শরীরে কোনও ব্যায়রামও ত নাই তবে—তখন তাঁহার সন্দেহ হইল নিশ্চয়ই এর মধ্যে গোপনীয় ব্যাপার কিছু আছে। তাঁহার একটী বেশ চালাকচতুর তরুণী দাসী ছিল, তিনি তাহাকে ডাকিয়া একবার মহারাজের বিদূষকের নিকট গিয়া কৌশলে এর মধ্যে যদি কোনও গোপনীয় কথা কিছু থাকে জানিয়া আসিতে বলিলেন। তখনকার দিনে রাজারাজরাদের একটী করিয়া বিদূষক থাকিত, তাহারা কেবল যে ভাঁড়ামি করিয়া রাজার মন প্রফুল্ল রাখিত তাহা নহে, অনেক সময়ে বন্ধুর মত নিভৃতে গল্পও করিতে পাইত, তাই রাজাদের অনেক গুপ্ত কথাও তাহাদের অজানা থাকিত না।

মহারাণী যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক। পুরূরবা একমাত্র বিদূষকের কাছেই উর্ব্বশীর গল্প করিয়াছিলেন আর বলিয়া দিয়াছিলেন যেন একথা কোনো মতেই প্রকাশ না পায়। এমন মজাদার ব্যাপারটা কাহাকেও বলিতে পাইবে না ভাবিয়া বিদূষক অস্থির হইয়া পড়িতেছিল, তাহার মনে হইতেছিল, যে, রাজার এ কি অন্যায়, বলিতেই যদি নিষেধ তবে শোনান কেন? নিমন্ত্রিত লোকের মুখে সুস্বাদু পরমান্ন দিয়া তাহাকে সে পায়স খাইতে নিষেধ করিলে তাহার অবস্থা যে রকম হয়, বিদূষকের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপই হইয়া উঠিল। কি করা যায় কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া, বিদূষক সেদিন মহারাজের 'দেবচ্ছন্ন প্রাসাদে' একেলা পায়চারি করিতেছিল; পুরূরবা তখন বিচার করিতে-

ছিলেন, বিচার-কার্য্য শেষ করিয়া প্রায়ই তিনি দেবচ্ছন্ন প্রাসাদে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে আসিতেন। বিদূষকও রাজার প্রতীক্ষায় ছিলেন। মহারাণীর দাসী নিপুণিকা আসিয়াছিল বিদূষকের খোঁজে, দেবচ্ছন্ন প্রাসাদে বিদূষক একেলা আছে দেখিয়া সে মনে মনে খুবই সন্তুষ্ট হইল, ভাবিল, এ বানরটার দ্বারায় কাজ উদ্ধার করিয়া লইবই। তাহার প্রথম হইতেই সন্দেহ হইতেছিল যে, রাজার এ সদাই অন্যমনস্কভাব প্রেমের লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে তখন বিদূষকের নিকট গিয়া বলিল, "আর্য্য, প্রণাম।"

"মঙ্গল হউক।" বলিয়া বিদূষক বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। এমন নির্জ্জন স্থানে সুরসিকা নিপুণিকাকে পাইয়া বিদূষকের কেবলই মনে হইতেছিল, যে, এ মজার ব্যাপারটা তাহাকে বেশ একবার রং ফলাইয়া শুনাইয়া দেয়। কিন্তু রাজার নিষেধ, জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন, তাই প্রথমে অন্য কথা পাড়িল, বলিল, "কিগো, নিপুণিকে, কি খবর? গান বাজনা ছেড়ে যাওয়া হ'চ্ছে কোথা?"

নিপুণিকা বলিল, "এই আপনার কাছেই এসেছি, রাণীমা পাঠিয়েছেন।"

"মহারাণী পাঠিয়েছেন। কি আজ্ঞা দেবীর?" বলিয়া বিদূষক উৎসুক হইয়া উঠিল।

নিপুণিকা বলিল, "দেবী বলেছেন, যে, আপনি আর তাঁর কাছে যান না, তাঁহার এত কষ্ট, আর আপনার খোঁজও নেই, খবরও নেই।"

বিদূষক বলিয়া উঠিল, "বটে? নিশ্চয়ই বন্ধু তাঁর মনে কোনও কষ্ট দিয়েছেন, কি হ'য়েছে তুমি কিছু জান?"

"জানি না আবার?" বলিয়া একটু মৃদু হাসিয়া বিদূষকের পানে চাহিয়া নিপুণিকা আবার বলিল, "মহারাজ যাঁর রূপে পাগল, তারই নাম ক'রে ভুলে মহারাণীকেই ডেকে ফেলেছেন।"

বিদূষক ভাবিল, 'যাঃ, শেষটা নিজেই বলে ফেলেছে, তবে আর আমার গরজ কিসের।' তাই বলিয়া উঠিল, "দেখ নিপুণিকা, সেই অপ্সরা ছুঁড়ি উর্ব্বশীটাকে দেখে এসে অবধি রাজা যে কেবল রাণীমার মনেই

কষ্ট দিয়েছেন, তা নয়, আমার সঙ্গেও ভাল ব্যবহার করেন না, খাওয়ান না, কিছু না।"

নিপুণিকার যাহা জানিবার ছিল, তাহা যে এত সহজেই জানা যাইবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই, সে তাড়াতাড়ি বিদায় লইয়া মহারাণীর কাছে চলিল, যাইবার সময় বিদূষক আবার বলিয়া দিল, "আমি ত' এ মৃগতৃষ্ণা থেকে বন্ধুকে নিরস্ত করবার খুবই চেষ্টা করেছি, পেরে উঠিনি, দেখ, যদি মহারাণীর মুখ চেয়েও তাঁর এ মতিচ্ছন্ন ঘোচে।"

"তাই বল্‌ব।" ব'লে নিপুণিকা চলিয়া গেল।

এদিকে বিচারকার্য্য শেষ করিয়া পুরূরবা অন্যদিনের মত সেদিনও দেবচ্ছন্ন প্রাসাদে বিশ্রাম করিবার জন্য আসিতেছিলেন, রাজাকে দূর হইতে দেখিয়াই বিদূষক অমনি তাঁহার কাছে গিয়া বলিয়া উঠিল, "বন্ধু, শুনিলাম নাকি মহারাণীর মনে সুখ নাই।" কথাটা শুনিয়া পুরূরবার সন্দেহ হইল, এ মূর্খটা সে গুপ্তব্যপার রাণীর কর্ণগোচর করে নাই ত? তাই বিদূষকের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় যে রহস্য গোপন করিতে বলিয়াছিলাম, সে কথা কাহাকেও বল নাই ত?"

'এ্যাঁ, রাজা বলে কি? তাহ'লে দেখ্‌ছি, হতভাগিনী নিপুণিকাটা ত চালাকী ক'রে সব কথা জেনে গেল, করি কি?' এই ভাবিয়া বিদূষক কথার উত্তর না দিয়া মৌন রহিল।

পুরূরবা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি? উত্তর দিচ্ছ না যে?" বিদূষক আর কি বলে, সে বলিল, "বন্ধু, পাছে কথা কইলে, সে কথা বেরিয়ে পড়ে, তাই আমি কথা বলাই বন্ধ ক'রে দিয়েছি।"

ব্যাপারটা তা'হ'লে গোপন আছে, প্রকাশ হয় নাই জানিয়া পুরূরবা খুব সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তখন বিদূষককে বলিলেন, "এখন কি করা যায়?" বিদূষক অমনি মহা উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "কেন, চল না পাকশালায় যাওয়া যাক, মেঠাই, মণ্ডা, গরম গরম পাঁপর ভাজা খাওয়া যাবে।" পুরূরবা হাসিয়া বলিলেন, "পাঁপর ভাজা খেয়ে আমার আর কি হবে? তার চেয়ে চল, উপবনে ব'সে খানিক গল্প করা যাক।"

তখন দুইজনে দেবচ্ছন্ন প্রাসাদের সংলগ্ন উপবনে মাধবীলতার কুঞ্জের মধ্যে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। পুরূরবার এখন আর উর্ব্বশী ছাড়া কথা নাই, তিনি বিদূষককে বলিলেন, "বন্ধু, এমন কোনও উপায় বাহির করিতে পার যা'তে আবার একবার তাকে দেখ্‌তে পাই।"

কিন্তু উপায় বাহির করা ত সোজা নয়, উর্ব্বশী থাকেন স্বর্গে, ইন্দ্রের সভায় নৃত্য করেন, তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া একরকম অসম্ভব। বিদূষক অনেক ভাবিয়াও কোন উপায়ই বাহির করিতে পারিল না; তখন পুরূরবা বলিলেন, "দেখ বন্ধু, যদিও জানি যে উর্ব্বশীকে পাওয়া সম্ভব নয়, তবু ভাই, মনে আমার এমন একটা আনন্দের ভাব আস্‌ছে, যে ভাবটা কেবল মনস্কামনা সিদ্ধি হ'বার সময়টাতেই আসে, কি জানি কেন যে এমন হ'চ্ছে বল্‌তে পারি না।"

এখন, সে দিন উর্ব্বশী আর চিত্রলেখা দুইজনে তাঁহাদের একখানি বিমানে আরোহণ করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। বিমানখানি চালাইতেছিলেন স্বয়ং উর্ব্বশী। সচরাচর তাঁহারা আর অন্যান্য অপ্সরারা যেসব জায়গায় বেড়াইতে যান, সেখানে না গিয়া কেন যে উর্ব্বশী ক্রমাগতই নীচে নামিতেছিলেন, চিত্রলেখা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না; শেষে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যাওয়া হচ্ছে কোথা? এসব জায়গায় কখন আসিনি ত'।"

কেন যে নীচে বিমান নামাইতেছিলেন সে কথা বলিতে উর্ব্বশীর অত্যন্ত লজ্জা করিতেছিল, কিন্তু আর না বলিয়া উপায় নাই দেখিয়া উর্ব্বশী বলিতেছিলেন, "সেই যে সেদিন হেমকূট পর্ব্বতে লতায় আমার ওড়না আট্‌কে গেছল, মনে নাই? তুই ত সেদিন নিজেই উপহাস ক'রে বলেছিলি, যে, বেজায় শক্ত হ'য়ে আট্‌কে গেছে। সবই ত জানিস্ তবে আবার জিগ্যেস্ করছিস্ কেন কোথায় যাচ্ছি?"

"সে কি রে, তুই তবে কি মহারাজ পুরূরবার কাছেই যাচ্ছিস্ না কি?" বলিয়া চিত্রলেখা উর্ব্বশীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

উর্ব্বশী বলিলেন, "হৃদয় যে বাধা মানে না, কাজটা নেহাৎ নির্লজ্জার মত হ'য়ে পড়ল, না?"

চিত্রলেখা বলিলেন, "নেহাৎ যদি তাকে না দেখে থাক্‌তে না পারিস্, তবে চল্। আমি তিরস্করিণী জানি, সে বিদ্যার বলে আমরা সবাইকে দেখ্‌তে পাব, অথচ আমাদেরকে কেউই দেখ্‌তে পাবে না।"

ক্রমে তাঁহারা গঙ্গাযমুনার সঙ্গমের নিকট আসিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এইবারে তাঁহারা প্রতিষ্ঠানপুরে আসিয়াছেন। তখন তাঁহারা একেবারে নীচে নামিয়া দেখিলেন, যেস্থানে তাঁহারা আসিয়াছেন, সেটী পুরূরবারই প্রমোদবন। পুরূরবার রাজধানী ও উদ্যানের শোভা দেখিয়া উর্ব্বশীর মনে হইল যেন স্বর্গই পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে। তখন তাঁহারা দুইজনে উদ্যানের একপার্শ্বে বিমানখানি রাখিয়া ধীরে ধীরে লতাকুঞ্জের নিকটে গিয়া দেখিলেন পুরূরবা বিদূষকের সহিত গল্প করিতেছেন। তাঁহারা জানিতেন কেহই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবে না, তাই তাঁহারা আরও নিকটে গিয়া শুনিতে লাগিলেন দুইজনে কিসের কথাবার্ত্তা হইতেছে।

বিদূষক তখন বলিতেছিলেন, "দেখ, এইবার আমি একটা খুব চমৎকার উপায় ঠাওরেছি। হয় তুমি দিনরাত খালি নিদ্রা যাও, স্বপ্নে উর্ব্বশীর সঙ্গে মিলন হবেই, আর তা' যদি না পার, তবে তা'র একটা ছবি আঁক, সব সময়েই তা'কে দেখ্‌তে পাবে। কেমন, ঠিক নয়?" পুরূরবা বলিতেছিলেন, "তা' কখনও হয়, যে দিন থেকে উর্ব্বশীকে দেখেছি, চোখে কি আর আমার ঘুম আছে, যে স্বপ্ন দেখ্‌ব? আর ছবি আকার কথা যা বল্লে, সেও হয় না; মনের অবস্থা এত খারাপ যে, এতে আর ছবি আঁকা চলে না।"

উর্ব্বশী পুরূরবার সকল কথাই শুনিতেছিলেন; পুরূরবা আবার বলিলেন, "আচ্ছা ভাই, আমি তার বিরহে এত কাতর, আর সে কি আমার কথা একবারও ভাবে না? আমার এত ভালবাসা সবই কি ব্যর্থ হবে?"

উর্ব্বশী ত জানিতেন না যে, পুরূরবা তাঁহাকে একবার দেখিয়াই এত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন; তাই পুরূরবার কথাগুলি শুনিয়া তাঁহার

অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছিল যে, একবার তাঁহার সম্মুখে গিয়া বলেন, "আমি তোমারই, আমি তোমারই।" কিন্তু সহসা দেখা দিতে তাঁহার কেমন লজ্জা হইতে লাগিল, তিনি চিত্রলেখাকে বলিলেন, "এক কাজ করলে হয় না? ভূর্জ্জপত্রে মনের কথা লিখে রাজাকে জানান যাক্, তার পর না হয় দেখা দেব, কি বলিস?" "সেই ঠিক হবে।" বলিয়া চিত্রলেখা উর্ব্বশীকে একখানি ভূর্জ্জপত্র দিলেন, উর্ব্বশী তাহাতে বেশ গুছাইয়া দুই চারি কথায় আপনার প্রেম জানাইয়া সেখানি পুরূরবার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। পুরূরবা ভূর্জ্জপত্রখানি দেখিয়াই তুলিয়া লইলেন, পড়িয়া ভাবিলেন, এ কি? এ স্বপ্ন না সত্য? উর্ব্বশী—যাঁহার সে একবার-দেখা মুখখানি তিনি শয়নে স্বপনে অনবরতই ধ্যান করিতেছেন, সেই—সেই উর্ব্বশী আজ অযাচিত ভাবে তাঁহাকে প্রেম নিবেদন করিয়াছেন, এও কি সম্ভব?

বিদূষক ছিলেন পাশেই, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি সখা, ব্যাপার কি? একি উর্ব্বশীর প্রেমপত্র যে এমন তন্ময়ভাবে পড়ছ?"

"তাই হে, তাই, এ প্রিয়ারই প্রেমপত্র।" বলিয়া পত্রখানি পুরূরবা বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

বিদূষক অস্থিরভাবে বলিলেন, "পড়, পড়, শুনি।" পুরূরবা বলিলেন, 'শোন', এই বলিয়া পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে লেখা ছিল, "স্বামিন্, আমি না জেনে তোমার সম্বন্ধে যা ধারণা করেছি, তুমিও দেখছি আমায় সেই রকম ভাবছ। তোমার এ ধারণা ঠিক নয়, প্রিয়তম। পারিজাত কুসুমের কোমল শয্যায় শুয়েও আমার সুখ নাই, নন্দনকাননের বাতাস মনে হয় যেন অগ্নি।"

পত্রখানি পড়িয়া পুরূরবা আবার সেখানি বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বিদূষককে বলিলেন, "প্রিয়ার এ অবস্থাগুলি যেন আমি চোখের সাম্‌নে দেখতে পাচ্ছি, আর মনে হ'চ্ছে যেন তাঁর মুখখানি আমার মুখের উপর এসে পড়েছে।" একথা শুনিবার পর উর্ব্বশী আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি চিত্রলেখাকে বলিলেন, "ভাই, তুই একবার মহারাজের সাম্‌নে গিয়ে সব কথা খুলে বল্।" চিত্রলেখা সম্মুখে আসিতেই পুরূরবা তাঁহাকে খাতির দেখাইয়া বলিলেন, "আসুন, আসুন, ভাল আছেন ত?"

তারপর একবার এদিক ওদিক চাহিয়া আবার বলিলেন, "গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের মত সেদিন আপনাদের দুই সখীকে এক সঙ্গে দেখে-ছিলাম। আজ আপনার সে সখীটী আসেন নি ব'লে আমার আর তত আনন্দ হ'চ্ছে না।"

চিত্রলেখা বলিলেন, "প্রথমে মেঘ দেখা দেয়, তারপর ত' বিদ্যুৎ চম্‌কায়। সখীর কথাইত বল্‌তে এসেছি, তিনি এখন আপনারই।"

পুরূরবা উৎসুক কণ্ঠে বলিলেন, "কৈ তিনি?"

"এই আস্‌ছেন" বলিয়া চিত্রলেখা উর্ব্বশীকে পুরূরবার কাছে আনিলেন, পুরূরবা উঠিয়া উর্ব্বশীর হাত ধরিয়া আপনার পার্শ্বে তাঁহাকে বসাইলেন। তারপর বিদূষক দু'একটী পরিহাস করিতে যাইবেন, এমন সময় তাঁহারা শুনিলেন যেন এক দেবদূত অলক্ষ্যে থাকিয়া বলিতেছে, "চিত্রলেখা, দেবরাজ ইন্দ্র নাটক দেখিবেন, তাই ভরত মুনি আদেশ করিয়াছেন, তুমি উর্ব্বশীকে লইয়া এখনই স্বর্গে যাও।"

এ যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত, দুজনের কত কথাই যে বলিবার ছিল, কিছুই বলা হইল না; এতদিন পরে ক্ষণেকের সাক্ষাৎ, আবার যে কবে দেখা হবে কে জানে। স্বয়ং ইন্দ্র নাটক দেখিবেন, না যাইয়া উপায় নাই। দুঃখিতমনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে দুজনে দুজনকার নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

উর্ব্বশী নাই—পুরূরবার তাই আর কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, তাই উর্ব্বশীর নিজের হাতে লেখা প্রেমপত্রখানি বারবার পড়িয়া মনে কিঞ্চিৎ শান্তি পাইবার আশায় পুরূরবা বিদূষককে সেখানি তাঁহার হাতে দিতে বলিলেন। বিদূষক পড়িল মুস্কিলে, পত্রখানি তাহারই হাতে ছিল বটে তবে অসাবধান বশত কখন যে কোথায় পড়িয়া গিয়াছে জানিতে পারে নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখে কোথাও নাই, বাতাসে নিশ্চয় উড়িয়া গিয়া থাকিবে। কি আর বলে, বলিল, "সখা, পত্রখানি ত নাই, সেটাও স্বর্গের জিনিষ, উর্ব্বশীর সঙ্গেই হয়ত স্বর্গের দিকে চ'লে গেছে।"

এমন জিনিষটাও হারাল দেখে পুরূরবার অত্যন্ত রাগ হইল তিনি বলিলেন, "মুর্খ হ'লে এইরকমই হয়।"

বিদূষক অমনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রেমপত্রখানি খুঁজিতে লাগিল।

এদিকে এমন অসময়ে মহারাজ বিদূষককে সঙ্গে লইয়া প্রমোদ-বনে লতাকুঞ্জে বসিয়া আছেন শুনিয়া মহারাণী ঔশীনরী অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন, তিনি আপনার এক দাসীকে সঙ্গে লইয়া মহারাজ যেখানে বিদূষকের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন, সেই কুঞ্জের নিকটে আসিয়া ভিতরে দুজনের কিসের গল্প হইতেছে শুনিবার জন্য আড়ালে দাঁড়াইলেন; এমন সময় সহসা বাতাসে উড়িয়া আসিয়া একখানি ভূর্জ্জপত্র তাঁহার চরণের নূপুরে আটকাইয়া গেল; তিনি সেখানি হাতে উঠাইয়া লইয়া তাহাতে কি লেখা আছে পড়িবার জন্য তাঁহার দাসী নিপুণিকার হাতে দিলেন। নিপুণিকা কেবল যে সেখানি মহারাণীকে পড়িয়া শুনাইল তাহা নহে, সব কথাগুলির বেশ করিয়া অর্থ করিয়াও দিল।

ঔশীনরী নিপুণিকার হাত হইতে পত্রখানি নিজের হাতে লইয়া পুরূরবা ও বিদূষকের আরও কি কি কথা হয় শুনিবার জন্য আবার সেই কুঞ্জের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন, পুরূরবা তখন বিদূষককে বলিতে-ছিলেন, "প্রিয়ার পত্রখানা হারিয়ে ফেল্লে? আমি এখন কি ক'রে সময় কাটাই? কি উপায় হবে আমার?" পুরূরবার কথা শেষ হইতে না হইতেই ঔশীনরী অমনি লতাগৃহের ভিতরে আসিয়া পুরূরবার সম্মুখে উর্ব্বশীর প্রেমপত্রখানি ধরিয়া বলিলেন, "এই নাও সেই পত্র, এবার তোমার উপায় হ'য়েছে ত?"

এমন অসময়ে সহসা যে ঔশীনরী এখানে আসিয়া পড়িবেন, পুরূরবা তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি বলিলেন, "রাণী, এমন সময় এখানে?"

ঔশীনরী বলিলেন, "চম্‌কে উঠলে যে? এসময় এসে ভাল করি নাই, না?"

"না না, সে কি, এস, তুমি এসে ভালই ক'রেছ।" বলিয়া পুরূরবা যেন আবার কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন।

ঔশীনরী বলিলেন, "থাক্, আমি এসে ভাল করেছি, কি না এলে তোমার ভাল হ'ত সে আমিই বুঝছি।" তারপর, তাঁহার দাসীকে

বলিলেন, "নিপুণিকে চল আমরা এখান থেকে চ'লে যাই, আমরা আছি ব'লে আর্য্যপুত্রের অসুবিধা হচ্ছে।"

পুরূরবা ঔশীনরীর মনে কখনও কষ্ট দেন নাই। তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন, "রাগ করো কেন রাণী? শোন আমি কি বলি!"

কিন্তু ঔশীনরী তাঁহার কোনও কথাই শুনিলেন না দেখিয়া পুরূরবা একেবারে তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িলেন।

"কর কি, কর কি, পা ছাড়; ওসব ভণ্ডামী আমি বুঝি, তবে দেখো, তুমি সরল মানুষ, শেষে না অনুতাপ করতে হয়!" এই বলিয়া ঔশীনরী চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বর্গে সেদিন মহাধুম—দেবরাজ স্বয়ং নাটক দেখিবেন, কাজেই অনুষ্ঠানের কোথাও কোন ত্রুটী নাই। ভরতমুনি মহা উৎসাহে অভিনয়ের পাত্র পাত্রী ঠিক করিতেছিলেন। তিনিই নাট্যকার আবার তিনিই অভিনয়-শিক্ষক। ইন্দ্রের 'বৈজয়ন্ত' প্রাসাদের নাট্যশালায় সপরিষদ্ দেবরাজ যে যাহার নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন; যথাসময়ে অভিনয় আরম্ভ হইল। সে দিনকার পালা ছিল "লক্ষ্মী-স্বয়ংবর।" নটনটীরা আপনাপন ভূমিকা বেশ সুন্দর ভাবেই করিয়া যাইতেছিলেন। উর্ব্বশীর ছিল লক্ষ্মীর ভূমিকা, তিনি আপনার অংশ অভিনয় করিয়া যাইতেছিলেন, তাহাতে কোনও দোষ ছিল না বটে, তবে ভরতমুনির কেবলই মনে হইতেছিল যেন উর্ব্বশীর আজিকার অভিনয়ে সে প্রাণের সাড়া নাই, অভিনয় করিতে হয় বলিয়াই যেন অভিনয় করা। পরপর কয়েকটী দৃশ্য হইয়া গেল। তারপর একটী দৃশ্যে লক্ষ্মীর ভূমিকায় উর্ব্বশীকে বারুণীবেশী মেনকা সম্মুখে কেশব আর অন্যান্য দেবতাদিগকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "লক্ষ্মী, এত সব দেবতারা র'য়েছেন, স্বয়ং পুরুষোত্তম বিষ্ণু র'য়েছেন, তোর কাকে পছন্দ হয় বল্ দেখি।"

লক্ষ্মীর বলিবার কথা ছিল 'পুরুষোত্তমকে' কিন্তু উর্ব্বশী পুরুষোত্তমকে না বলিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিয়া ফেলিলেন, 'পুরূরবাকে'। পুরুষোত্তমের স্থানে পুরূরবার নাম শুনিয়া সভায় বিষম গণ্ডগোল আরম্ভ হইল; ভরতমুনি প্রথম হইতেই উর্ব্বশীর অভিনয়ে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাহার উপর এই কেলেঙ্কারী, তিনি মহাক্রুদ্ধ হইয়া তখনি নাটক বন্ধ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন, আর উর্ব্বশীকে শাপ দিলেন, 'তোমার জন্য আমার এই অপমান, আমার শাপে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি যেন লোপ পায়।'

দেবরাজ ইন্দ্রের কিন্তু অভিনয়টা মন্দ লাগিতেছিল না, তাহার উপর উর্ব্বশীর লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইল দেখিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত দয়া হইল। তিনি উর্ব্বশীকে নিকটে ডাকিলেন, উর্ব্বশী লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া

চন্দ্রদেবের পূজারিণী। ঐশীনবী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন দেখিয়া দেবরাজ বলিলেন, "তুমি যাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছ, সেই রাজর্ষি আমার পরমবন্ধু, অসুরযুদ্ধে তিনি অনেকবার আমার সহায় হইয়াছেন। তাঁহার প্রিয়কার্য্য করাও আমার উচিত। তুমি পৃথিবীতে গিয়া তাঁহার স্ত্রীরূপে যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পার। তবে, যেদিন রাজা তোমার সন্তানের মুখ দেখিবেন সেই দিনই আবার তোমায় স্বর্গে ফিরিয়া আসিতে হইবে।" সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল।

পুরূরবা যেদিন ঔশীনরীর পায়ে পড়িয়া তাঁহার মান ভাঙাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, অথচ রাণী তাঁহার অনুনয় উপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে ঔশীনরীর মন অনুশোচনায় ভরিয়া গিয়াছিল। স্বামীর একটা অপরাধ তিনি ক্ষমা করিতে পারিলেন না! তাহার উপর স্বামীর সদাই অন্যমনস্কভাব, আহার নাই, নিদ্রা নাই, মুখে হাসি নাই। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না; স্বামীকে সুখী করিবার জন্য এক ব্রতের ব্যবস্থা করিলেন। এক শুভদিনে তিনি পুরূরবার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, যে, সেইদিন সন্ধ্যায় তিনি এক ব্রত পালনের জন্য চন্দ্রদেবের উপাসনা করিবেন, মহারাজ যেন সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া 'মণিহর্ম্ম্য প্রাসাদের' ছাদে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করেন।

পুরূরবা তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া, সেদিন সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া বিদূষককে লইয়া 'মণিহর্ম্ম্য প্রাসাদের' ছাদে মহারাণীর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; মহারাণী তখনও ছাদে আসেন নাই, অথচ করিবারও কিছুই নাই দেখিয়া দুইজনে একজায়গায় বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা উর্ব্বশী স্বর্গ হইতে বিদায় লইয়া পুরূরবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রতিষ্ঠানপুরে আসিতেছিলেন। সঙ্গে তাঁহার প্রিয়সখী চিত্রলেখাও ছিলেন। বিমানে বসিয়া দুই সখীতে গল্প হইতেছিল, উর্ব্বশী বলিতেছিলেন, "আজ আমায় এই অভিসারিকার বেশে কেমন মানাচ্ছে বল্ দেখি?"

চিত্রলেখা বলিলেন, "সত্যি বল্‌ব? তোকে যা মানিয়েছে, খালি মনে হ'চ্ছে আমি যদি পুরূরবা হ'তাম।" তারপর একবার নীচের দিকে

চেয়ে, চিত্রলেখা বলিলেন, "আমরা যে প্রতিষ্ঠানপুরে এসে পড়েছি। ওই দেখ্, তোর প্রিয়তমের প্রাসাদের আলো যমুনার জলে কেমন প্রতিবিম্বিত হ'চ্ছে।"

উর্ব্বশী অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন,- "দেখ ত, ভাই, আমার হৃদয়েশ্বর এখন কোথায় আছেন।"

চিত্রলেখা একটু দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিলেন, "দেখ্তে পাচ্ছিস্নি, রাজা যে এখন রাণীদের নিয়ে ফুর্ত্তি করছেন।"

"দুর মিথ্যাবাদী" বলিয়া উর্ব্বশী চিত্রলেখাকে ঠেলিয়া দিয়া আবার বলিলেন, "তোর সব কথা মিথ্যা। আমার মন যে এখন তাঁর, আমি মনে মনে বেশ বুঝতে পারি তিনি কখন কি করেন।"

তারপর তাঁহারা দুইজনে মণিহর্ম্ম্য-প্রাসাদের ছাদে নামিয়া দেখিলেন, পুরূরবা আর বিদূষক গল্প করিতেছেন ; তাঁহারা তিরস্করিণী বিদ্যার বলে এমনভাবে রহিলেন, যে, তাঁহারা সকলকে দেখিতে পাইবেন অথচ তাঁহাদিগকে কেহই দেখিতে পাইবে না। পুরূরবার তখন বিদূষকের সহিত উর্ব্বশীর কথাই হইতেছিল ; দুই সখীতে নির্ব্বিঘ্নে শুনিতে লাগিলেন। এমন সময় সেখানে মহারাণী ঔশীনরী আসিলেন, তাঁহার পরিচারিকারা পূজার সমস্ত উপকরণ লইয়া তাঁহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পুরূরবা উঠিয়া ঔশীনরীর হাত ধরিয়া আপনার পার্শ্বে তাঁহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্রতের কি নাম ?"

রাণীর হইয়া তাঁহার এক পরিচারিকা বলিল, "এ ব্রতের নাম 'প্রিয়প্রসাধন'।"

পুরূরবা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এসবের কি দরকার, রাণী ? তোমার শরীর ভাল নয়, এসব ব্রত-উপবাস সহ্য হবে কেন ?"

ঔশীনরী কোনও কথা কহিলেন না, তিনি উঠিয়া পরিচারিকাদের হাত হইতে পুষ্প, মাল্য, নৈবেদ্য প্রভৃতি লইয়া ভক্তিভরে চন্দ্রদেবের পূজা করিতে লাগিলেন। পূজা সমাপন হইলে প্রথমেই পূজার প্রসাদ এক শরা মিষ্টান্ন বিদূষককে খাইতে দিলেন ; তারপর পুরূরবার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জোড়হস্তে বলিলেন, "এই চন্দ্রদেব সাক্ষী রহিলেন, আপনি যাহাতে সন্তুষ্ট হয়েন, তাহাই করুন। যে নারীকে আপনি ভাল-

উর্ব্বশী রাজার চোখ টিপিয়া ধরিলেন

বাসেন, বা যে নারী আপনাকে ভালবাসে, আপনারা চন্দ্রদেবের আশীর্ব্বাদে যেন শীঘ্রই মিলিত হয়েন।”

মহারাণীর কথা শুনিয়া উর্ব্বশী ত অবাক। এরূপ স্বার্থত্যাগ, এরূপ আত্মত্যাগ যে কেহ করিতে পারে, তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন না। পুরূরবা নিজেও আশ্চর্য্য হইলেন কম না, এরূপ অদ্ভুত পতিভক্তির জন্য তিনি মনে মনে রাণীকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। মুখে বলিলেন, “আমি ত তোমারই আছি, কেন আমায় অযথা সন্দেহ কর, রাণি ?”

ঔশীনরী বলিলেন. “আমার যা কর্ত্তব্য, করে গেলাম।” এই বলিয়া রাণী তাঁহার পরিচারিকাদিগকে লইয়া ছাদ হইতে নামিয়া গেলেন।

ঔশীনরী চলিয়া যাওয়াতে পুরূরবা মনে মনে সন্তুষ্টই হইলেন; তখন বিদূষক বলিল, “সখা, ভেজাল ত' সব মিটল, এখন কি করা যায় ?”

পুরূরবা বলিলেন, “উর্ব্বশীই নাই, আমার কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না।”

বিদূষক আবার বলিল, কিছুই যে আর ভাল লাগবে না, সে ত জানি। তবু শুনিই না, কি হ'লে তুমি এখনও খুব খুসী হও ?”

“খুব খুসী হই কি হ'লে বল্‌ব ? এই যদি, উর্ব্বশী আমার পিছনে দাঁড়িয়ে তার কোমল হাতদুটী দিয়ে আমার চোখ দুটী টিপে ধরে, তাহ'লে ভাই, আমি খুব খুসী হই।”

এখন, উর্ব্বশী ও চিত্রলেখা তাঁহাদের সব কথাই শুনিতেছিলেন। পুরূরবার কথায় চিত্রলেখার একটা কৌতুক করিবার ইচ্ছা হইল, তিনি পুরূরবা যেমনটী চাহেন ঠিক সেই ভাবে উর্ব্বশীকে পুরূরবার চোখদুটী টিপিয়া ধরিতে বলিলেন। উর্ব্বশীর প্রথমটা কেমন লজ্জা হইতেছিল, তবু তিনিও কৌতুকের আশায় পুরূরবার পিছনে আসিয়া তাঁহার চোখের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার বক্ষঃস্থল পুরূরবার পৃষ্ঠের উপর আসিয়া পড়িল। উর্ব্বশীর কোমল স্পর্শে পুরূরবা শিহরিয়া উঠিলেন, তিনি আপনার অজ্ঞাতে সহসা বলিয়া ফেলিলেন, “নিশ্চয়ই উর্ব্বশী !”

উর্ব্বশী তখন পুরূরবার চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পুরূরবা প্রথমটা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন, তারপর

তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া উর্ব্বশীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া আপনার পার্শ্বে বসাইলেন। চিত্রলেখা বলিলেন, "আপনাকে আর মহারাজ বলিব না, আপনি এখন আমার বন্ধু। দেখিবেন যেন সখী আমার সুখে থাকে।" তারপর তিনি উর্ব্বশীর নিকট হইতে বিদায় চাহিলেন; উর্ব্বশী চিত্রলেখাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আবার কবে আমাদের দেখা হবে? আমায় ভুলে যাবিনি ত?"

"মহারাজকে পেয়ে তুইই হয়ত আমায় ভুলে যাবি," বলিয়া চিত্রলেখা মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উর্ব্বশী ও পুরূরবার পরম সুখেই দিন কাটিতে লাগিল। তারপর কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহারা রাজ্যের সমস্ত ভার মন্ত্রীদের উপর অর্পণ করিয়া দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। একদিন তাঁহারা দুইজনে কৈলাস পর্ব্বতের গন্ধমাদন বনে মন্দাকিনী নদীর তীরে বসিয়া হাস্যপরিহাস করিতেছিলেন, এমন সময় সেখানে বিদ্যাধরদের কতকগুলি যুবতী মেয়ে বেড়াইতে আসিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া পুরূরবার কেমন মতিচ্ছন্ন ধরিল, তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজনের দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিলেন। উর্ব্বশী এ হাসি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না, দারুণ অভিমানে তিনি পুরূরবাকে ত্যাগ করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন, পুরূরবাও তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ভরত মুনির শাপ এত দিনে ফলিল, উর্ব্বশীর যেন জ্ঞানবুদ্ধি সব লোপ পাইয়াছিল। তিনি জানিতেন, যে ইহার পরই চিরকুমার কার্ত্তিকের উদ্যান, আর এ উদ্যানে কোনও নারীরই প্রবেশের অধিকার নাই, তথাপি তখন আর সে সব কথা তাঁহার মনে পড়িল না; তিনি যেমন কার্ত্তিকের উদ্যানে পা দিলেন অমনি তাঁহার অমন সুন্দর দেহখানি একটি পুষ্পিতা লতায় পরিণত হইয়া গেল। পুরূরবা যেন চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন, তিনি জাগ্রত কি নিদ্রিত তাহাই ভাবিয়া পাইলেন না, চোখের নিমেষে যে এক রক্তমাংসের শরীরধারী জীব সহসা লতায় রূপান্তর হইতে পারে, এ যে চোখে দেখিয়াও বিশ্বাস করা যায় না! দুঃখের তাঁহার সীমা রহিল না, তিনি ব্যাকুল ভাবে লতাটিকে জড়াইয়া ধরিলেন, 'উর্ব্বশী' 'উর্ব্বশী' করিয়া কতবার ডাকিলেন, কিন্তু সবই নিষ্ফল হইল, উর্ব্বশী যে লতা সে লতাই রহিয়া গেল।

পুরূরবা উর্ব্বশীকে প্রাণের অপেক্ষাও ভালবাসিতেন, তাই তাঁহাকে হারাইয়া তিনি উন্মাদের মত হইয়া উঠিলেন। কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখনও বা শূন্যে চাহিয়া রাগিয়া উঠেন; মাথার ঠিক নাই, কেবল

উর্ব্বশীর লতায় রূপান্তর

এদিকে সেদিকে ঘুরিয়া বেড়ান, মাঝে মাঝে 'উর্ব্বশী' 'উর্ব্বশী' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন, লতাটীকে বক্ষে জড়াইয়া ধরেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, বেশভূষার না আছে শোভা না আছে পারিপাট্য, এই ভাবেই তাঁহার দিন যায়। একে সখী উর্ব্বশী লতা হইয়া গিয়াছেন, তাহার উপর আবার পুরূরবার এই দুরবস্থা তাই চিত্রলেখা প্রভৃতি অপ্সরাদের কাহারও মনে সুখ নাই ; নিজেদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হইলেই তাঁহারা কেবল উর্ব্বশী-পুরূরবার কথা কহিতেন, আর দুঃখ করিতেন। একদিন উর্ব্বশীর সব অপ্সরা বন্ধুরা এক সঙ্গে মিলিত হইয়া ভগবান্ সূর্য্যদেবের মন্দিরে গিয়া রীতিমত পূজা উপাসনাদি করিয়া এক মনে তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিলেন।

তারপর, একদিন পুরূরবা অন্যদিনের মত সেদিনও পাগলের ন্যায় আপনমনে গান গাহিয়া, কখনও হাসিয়া, কখনও বা কাঁদিয়া বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন সম্মুখে পথের উপর একটা মণি পড়িয়া রহিয়াছে, তিনি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন সেটা কি। সহসা তাঁহার মনে হইল কে যেন অন্তরীক্ষে থাকিয়া বলিতেছে, 'বৎস, তুলে নাও, তুলে নাও, এই সঙ্গমনীয় মণি, মা ভগবতীর শ্রীচরণ হইতে ইহার জন্ম, এটী কাছে থাকিলে শীঘ্রই প্রিয়জনের সহিত মিলন হয়।' পুরূরবার বোধ-শক্তি কমিয়া গিয়াছিল বটে, তবু 'প্রিয়জনের সহিত মিলন হয়,' এই কথাটা শুনিয়া তিনি অমনি তাড়াতাড়ি মণিটি হাতে তুলিয়া লইলেন, তারপর আবার পূর্ব্বের মত গান গাহিতে গাহিতে উর্ব্বশী যে লতায় পরিণতা হইয়া গিয়াছিলেন, সেই লতাটীর কাছে গিয়া যেমন রোজ করেন,তেমনি সেদিনও 'উর্ব্বশী, আমার উর্ব্বশী,' বলিয়া বক্ষে লতাটীকে জড়াইয়া ধরিলেন। অন্যদিনও জড়াইয়া ধরেন, কিন্তু সেদিন তাঁহার নিকট সঙ্গমনীয় মণি ছিল বলিয়া, তাহারই সংস্পর্শে উর্ব্বশী আবার তাঁহার পূর্ব্বরূপ ফিরিয়া পাইলেন। পুরূরবার মনে হইল যেন তিনি বক্ষের মধ্যে উর্ব্বশীরই স্পর্শ অনুভব করিতেছেন, কিন্তু চক্ষু খুলিলে যদি উর্ব্বশীকে দেখিতে না পান সেই ভয়ে চক্ষু মুদিয়া রহিলেন, উর্ব্বশীর নিঃশ্বাস তাঁহার মুখের উপর পড়িতে লাগিল, তিনি ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া দেখেন, একি! এযে সত্যই

তাঁহার উর্ব্বশী। "এ কি, সত্যই কি তুমি উর্ব্বশী ?" বলিতে বলিতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমির উপর পড়িয়া গেলেন। উর্ব্বশীও তখুনি ভূমির উপর বসিয়া পুরূরবার মস্তক সযত্নে আপনার ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া কিছুক্ষণ সেবা করিতে করিতেই পুরূরবার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল; তিনি বলিলেন, "প্রিয়ে, আবার তোমায় দেখিতে পাইয়া যেন মৃতপ্রায় প্রাণ ফিরিয়া পাইলাম।"

উর্ব্বশীর মন তখন অনুশোচনায় ভরিয়া গিয়াছিল, তিনি বলিলেন, "আমায় ক্ষমা করতে হবে, কেবল আমারই দোষে দুজনে এতদিন কষ্ট পেলাম।" কিন্তু কেমন করিয়া যে উর্ব্বশী সহসা একটা লতা হইয়া গিয়াছিলেন, পুরূরবা তাহা কিছুতেই ভাবিয়া পাইতেছিলেন না, তিনি উর্ব্বশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যদি তিনি এর কারণ কিছু বলিতে পারেন। উর্ব্বশী সমস্তই জানিতেন, তিনি বলিলেন, "দেবসেনাপতি কার্ত্তিক যখন চিরকৌমারব্রত গ্রহণ করেন, তখন তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, তাঁহার এই উদ্যানে কোনও স্ত্রীলোক আসিতে পারিবে না, যদি কেহ কখনও তাঁহার নিষেধসত্ত্বেও কুমার বনে প্রবেশ করে, তবে সে তখনই লতা হইয়া যাইবে। আমি এ নিয়ম জানিতাম, তবু কেন যে সেদিন আপনার উপর রাগ করিয়া কার্ত্তিকের উদ্যানে প্রবেশ করিতে গিয়াছিলাম জানি না। বোধ হয়, ভরত-মুনির অভিশাপেই সেদিন আমার জ্ঞানবুদ্ধি সব লোপ পাইয়াছিল।"

"বনের আবার এত মাহাত্ম্য ? আর এখানে থাকা নয়।" বলিয়া পুরূরবা উর্ব্বশীকে লইয়া প্রতিষ্ঠানপুরে যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেদিন কি একটা পুণ্যতিথি ছিল, মহারাণী ঔশীনরীর অনুরোধে পুরূরবা তাঁহার সহিত গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। স্নান করিবার সময় তিনি সঙ্গমনীয় মণিটি একটা তালের খোলার মধ্যে রাখিয়া জলে নামিয়াছিলেন, স্নান সারিয়া বেশপরিবর্ত্তন করিতেছেন এমন সময় কোথা হইতে একটা শকুনি আসিয়া সেটাকে মাংস মনে করিয়া মুখে করিয়া লইয়া নিমেষের মধ্যে একেবারে আকাশে উড়িয়া গেল। সকলে 'হাঁ হাঁ' করিয়া উঠিল, পুরূরবা ধনুর্ব্বান আনিতে বলিলেন। তাঁহার এক যবনী পার্শ্বচরী যখন ধনুর্ব্বান লইয়া আসিল শকুনি তখন মণিটি লইয়া একেবারে চক্ষুর অন্তরাল হইয়া গিয়াছে, তাহাকে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া গেল না। মণি ফিরিয়া পাইবার আশা অতি অল্প দেখিয়া পুরূরবার মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। মণিটি যে বহুমূল্য তা নয়, তবে ইহারই জন্য তিনি আবার তাঁহার প্রেয়সী উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়াই ইহা তাঁহার এত আদরের বস্তু। তিনি তখুনি আদেশ করিলেন যে নগরের মধ্যে প্রচার করিয়া দেওয়া হউক যে, যে কেহ পাখীটি মারিয়া এই মণি তাঁহার নিকট আনিতে পারিবে তাহাকে রীতিমত পুরস্কার দেওয়া হইবে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কঞ্চুকী সেই মণিটি লইয়া পুরূরবার নিকটে আসিলেন। পুরূরবা উৎসুকভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণি কি করিয়া পাওয়া গেল ?"

কঞ্চুকী বলিলেন, "মহারাজ, পাখীটা সহরের বাহিরে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, কে যে এই বাণ দিয়া উহাকে মারিয়াছে বলিতে পারি না।"

এমন উপকারী বন্ধুটি কে তাহা জানিবার জন্য পুরূরবা ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন, তিনি বলিলেন, "বাণটি দেখি, ইহাতে কি কাহারও নাম লেখা নাই ?"

কঞ্চুকী বাণটি রাজার হাতে দিলেন, তিনি পড়িলেন, "উর্ব্বশীর গর্ভজাত ঐলরাজের পুত্র কুমার আয়ুর বাণ।"

'উর্ব্বশী ও পুরূরবার পুত্র,' শুনিয়া সকলেই খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ; বিদূষকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন "বন্ধু, এমন সুখবরটা এতদিন দাও নাই ?"

পুরূরবা বলিলেন, "আমিত ইহার কিছুই জানিনা, উর্ব্বশীর পুত্র! কবে আবার উর্ব্বশী পুত্র প্রসব করিল ? তাহাতে আমাতে ত এক মুহূর্ত্তও কখন ছাড়াছাড়ি হয় নাই। সমস্তই যেন রহস্যময় বলিয়া বোধ হইতেছে।"

উর্ব্বশীর বাস্তবিকই একটী সন্তান হইয়াছিল। দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশমত পাছে পুত্রের মুখ দেখিলে পুরূরবাকে ছাড়িয়া আবার তাঁহাকে স্বর্গে চলিয়া যাইতে হয় সেই ভয়ে উর্ব্বশী সন্তান প্রসব করিয়া তাহাকে চ্যবন মুনির আশ্রমে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা অপ্সরা বলিয়া পুরূরবা তাঁহার গর্ভলক্ষণও তেমন বুঝিতে পারেন নাই। চ্যবন মুনি শিশুটীকে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় লালন পালন করিতেছিলেন। তারপর শিশু পুত্রটী বড় হইয়া একদিন তীরধনুক লইয়া খেলা করিতে করিতে একটা শকুনির মুখে কি একটা চক্চক্ করিতেছে দেখিতে পাইয়া বাণ মারিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে, প্রাণীহত্যা আশ্রমবিরুদ্ধ কাজ। চ্যবন মুনি সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ আপনার ভগিনী ভার্গবীকে ডাকিয়া আয়ুকে উহার জনক জননীর নিকট রাখিয়া আসিতে বলিয়া দিলেন। যে প্রাণীহত্যা করে তপোবনে তাহাকে কোনও মতেই স্থান দেওয়া চলে না।

তাপসী ভার্গবী বালককে লইয়া পুরূরবার সভায় আসিলেন। রাজা আপনার আসন ছাড়িয়া উঠিয়া তাঁহাকে রীতিমত সম্মান দেখাইয়া বিনীত ভাবে তাঁহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভার্গবী তখন কুমার আয়ুকে দেখাইয়া উর্ব্বশীর আশ্রমে রাখিয়া আসিবার সময় হইতে বালকের আশ্রমবিরুদ্ধ কাজ প্রভৃতি সমস্তই উল্লেখ করিলেন, এবং আরও বলিলেন, যে তিনি চ্যবন মুনির আদেশে তাঁহারই পুত্রকে তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে আসিয়াছেন।

উর্ব্বশী তখন রাজসভায় ছিলেন না, মহারাজের আদেশে কঞ্চুকী গিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলেন। তাপসী যাহা বলিয়াছিলেন উর্ব্বশী সমস্তই স্বীকার করিলেন। বালকটীকে দেখিয়া অবধি পুরূরবার তাহাকে

অত্যন্ত ভাল লাগিতেছিল, এখন সেই বালক তাঁহারই সন্তান জানিয়া তাহাকে নিকটে ডাকিয়া বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। অপুত্রক পিতার পুত্রস্নেহ আজ যেন উথলিয়া উঠিল।

উর্ব্বশীও উপযুক্ত পুত্র পাইয়া প্রথমে খুব সুখী হইয়াছিলেন। তারপর তাপসী ভার্গবী যখন বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন তখন তাঁহার মনে পড়িল, তাঁহাকেও এখনই বিদায় লইয়া স্বর্গে চলিয়া যাইতে হইবে। পুরূরবা তাঁহার পুত্রের মুখ দেখিয়াছেন, মহেন্দ্রের আদেশ মত আর ত তিনি তাঁহার প্রিয়তমের কাছে থাকিতে পারিবেন না। ভয়ে তাঁহার বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল, রুদ্ধ অশ্রু বাধা মানিল না, তিনি অস্ফুট স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। ক্রন্দনের স্বরে পুরূরবার চমক ভাঙ্গিল, তিনি ভাবিলেন 'একি ? আজ এ পরিপূর্ণ সুখের দিনে উর্ব্বশী কাঁদে কেন ?' বলিলেন, "প্রিয়ে আজ আমরা এমন সুন্দর পুত্র পেলাম, এমন আনন্দের দিনে কাঁদ কেন ?"

উর্ব্বশী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বলিলেন, "পুত্র পেলাম আনন্দের দিন বটে, তবে আজই আমায় স্বর্গে চলিয়া যাইতে হইবে।"

পুরূরবা উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "স্বর্গে চলে যেতে হবে ? কেন ?" উর্ব্বশী তখন ভরত মুনির নিকট আপনার অপরাধ, মুনির শাপ ও পরে দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশ সমস্তই বলিলেন। পুরূরবার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল, তাঁহার প্রাণের উর্ব্বশীকে তিনি আর দেখিতে পাইবেন না, গভীর দুঃখে তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সভাসদ্গণ সকলেই তাঁহার সহিত সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "ওঃ দৈবের কি বিড়ম্বনা! ছিলাম নিঃসন্তান আর আজ যাই পুত্রের মুখ দেখিলাম, অমনি প্রাণের চেয়ে প্রেয়সী উর্ব্বশীকে চিরকালের জন্য বিদায় দিতে হবে ? অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস।"

তিনি আবার বলিলেন, "আমি রাজ্যও চাহি না, কিছুই চাহি না, সংসারসুখ আমার শেষ হ'য়ে গেছে। আয়ুকে রাজ্য দিয়ে কালই আমি বনে চলে যাব, আমার অদৃষ্ট মন্দ, এত সুখ আমার ভাগ্যে সইবে না।"

রাজার কথা শুনিয়া সকলেই দুঃখিত হইলেন, উর্ব্বশীও নীরবে

তাপসী ভার্গবীর আয়ুকে লইয়া সভায় আগমন

ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এমন সময় সেই সভায় দেবর্ষি নারদ আসিলেন। নারদকে দেখিয়া উর্ব্বশী ও পুরূরবা তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া প্রণাম করিলেন।

দেবর্ষি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "দম্পতীর জয় হউক, আপনাদের কখনও বিচ্ছেদ যেন না হয়।"

উর্ব্বশী ও পুরূরবা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হে ভগবান্, দেবর্ষির কথাই যেন সত্য হয়।"

সকলে যে যার আসন গ্রহণ করিলে নারদ ঋষি বলিলেন, "মহারাজ! দেবরাজ ইন্দ্র আমায় পাঠিয়েছেন, অসুরদের মধ্যে এখন যেরূপ উত্তেজনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় দেবাসুরে শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিবে। আপনি বহুবার অসুরযুদ্ধে দেবতাদের সাহায্য করিয়াছেন, এবারও আপনাকে সাহায্য করিতে হইবে। দেবরাজ স্বকীয় মহিমাবলে জানিতে পারিয়াছেন যে, আপনি নাকি পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়া বনে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাই তিনি আমায় আদেশ দিয়া পাঠাইয়াছেন যে, এমন সময় আপনার ন্যায় যোদ্ধাকে হারাইলে দেবতাদের বিশেষ ক্ষতি হইবে। আপনি যতদিন জীবিত থাকিবেন উর্ব্বশী আপনার স্ত্রীরূপে আপনার সেবা করুক। আপনি বনে যাইবেন না।"

দেবর্ষির কথায় পুরূরবার মৃতপ্রায় শরীরে যেন অমৃত সিঞ্চিত হইল, তিনি আগ্রহ ভরে বলিয়া উঠিলেন, "দেবরাজের কৃপায় অত্যন্ত অনুগৃহীত হইলাম।" উর্ব্বশীও বাঁচিয়া গেলেন। দেবর্ষি নারদ নিজেই উদ্যোগী হইয়া কুমার আয়ুকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। স্ত্রীপুত্র লইয়া পরম সুখেই পুরূরবার দিন কাটিতে লাগিল।

মালবিকাগ্নিমিত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিদিশা আর বিদর্ভ এই দুই রাজ্যে বিবাদ যেন লাগিয়াই ছিল। একবার বিদর্ভদেশের প্রধান মন্ত্রীকে সুবিধা পাইয়া বিদিশার রাজা বন্দী করিয়া রাখেন, তাই বিদর্ভ-রাজও এর প্রতিশোধ দিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। সেই সময় এক ক্ষুদ্র রাজা মাধবসেন বিদিশার রাজা অগ্নিমিত্রের সহিত আপনার রূপসী ভগ্নী মালবিকার বিবাহ দিবার জন্য বিদিশায় আসিতেছিলেন, পথে বিদর্ভ-রাজের আদেশ পাইয়া তাঁহার এক সামন্ত রাজা মাধবসেনকে যুদ্ধে হারাইয়া বন্দী করিয়া ফেলিলেন। মাধবসেনের মন্ত্রী সুমতি যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই ব্যাপার বড় সুবিধা নয় বুঝিতে পারিয়া নিজের ভগ্নী কৌশিকী ও মাধবসেনের ভগ্নী মালবিকাকে লইয়া পলাইয়া যান। একে অজানা পথ, তায় আবার সঙ্গে নারী, কাজেই সুমতি মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি কোনও গতিকে একদল বণিকের দেখা পাইয়া তাঁহাদেরই সঙ্গে দেশের দিকেই যাইতেছিলেন; কিন্তু দৈবের কি বিড়ম্বনা! দুই এক দিন যাইতে না যাইতেই, বণিকেরা পড়িলেন এক দস্যুদলের হাতে। তাহারা বণিকদের মধ্যে অনেককে মারিয়া ফেলিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুটপাট করিয়া লইয়া পলাইয়া গেল। কৌশিকী ও মালবিকা—তাঁহারা একেবারে অসহায় হইয়া পড়িলেন। কোথায় যাইবেন কিছুই ঠিক রহিল না। তাঁহারা যখন নর্ম্মদার তীরে বসিয়া আপনাদের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিলেন, সেই সময় বীরসেন নামক এক দুর্গরক্ষক তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া আপনার দুর্গে লইয়া গেলেন। তারপর তিনি আপনার ভগিনী, অগ্নিমিত্রের পাটরাণী, ধারিণীর নিকট মালবিকাকে উপহার পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে গ্রহের ফেরে মালবিকা অগ্নিমিত্রের বিবাহিতা পত্নী হইবার জন্য দেশ হইতে বাহির হইয়া তাঁহারই এক রাণীর পরিচারিকা হইয়া রহিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই মহারাণী ধারিণী বুঝিতে পারিলেন যে, মালবিকা যে কেবল রূপে অদ্বিতীয়া, তাহা নহে, তাঁহার কতকগুলি অসাধারণ গুণও আছে। তাঁহার ন্যায় মেধাবিনী নারী ধারিণী সে পর্য্যন্ত আর একটিও দেখেন নাই, তাই মালবিকা যাহাতে ভবিষ্যতে খুব উন্নতি করিতে পারে, তিনি সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলেন। রাজবাড়ীর বেতনভোগী সঙ্গীত ও নাট্যাচার্য্য বৃদ্ধ গণদাসের উপর মালবিকার শিক্ষার ভার দেওয়া হইল। মহারাণী এতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি নিজের চিত্রকরকে মালবিকার একখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়া দিবার আদেশ দিলেন।

একদিন মহারাণী ধারিণী মালবিকার চিত্রখানি কতটা আঁকা হইয়াছে দেখিবার জন্য একজন পরিচারিকাকে সঙ্গে লইয়া চিত্রশালায় গমন করিলেন। চিত্রকর ছবিখানি মহারাণীর হাতে দিয়া তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারাণী একখানি সোফার উপর বসিয়া মালবিকার চিত্রখানি তন্ময় হইয়া দেখিতেছেন, আর মনে মনে চিত্রকরের প্রশংসা করিতেছেন, এমন সময় মহারাজ অগ্নিমিত্র চিত্রশালায় আসিয়া পড়িলেন। মহারাণী এমন একমনে ছবি দেখিতেছিলেন যে, গৃহের ভিতরে যে রাজা আসিয়াছেন, তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না, যেমন ছবির দিকে চাহিয়াছিলেন তেমনি ভাবেই চাহিয়া রহিলেন। রাণীর ব্যাপার দেখিয়া অগ্নিমিত্রের অত্যন্ত কৌতূহল হইল, তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া সোফার উপর একেবারে রাণীর পাশে বসিয়া পড়িয়া রাণীর হাত হইতে চিত্রখানি যথাসম্ভব ক্ষিপ্রহস্তে গ্রহণ করিয়া একেবারে নিজের মুখের কাছে লইয়া গিয়া দেখিতে লাগিলেন। নারীর সৌন্দর্য্য অগ্নিমিত্র অবশ্য অনেক দেখিয়াছেন, কিন্তু এইখানিতে যে সুন্দরীর সুকুমার তনু চিত্রিত রহিয়াছে তাহার তুলনা?—তিনি ভাবিলেন, এ রূপের তুলনা নাই, কে এ সুন্দরী? তাঁহার প্রাসাদে তিনি ত ইহাকে কখনও দেখেন নাই। তাই রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কার ছবি, প্রিয়ে?"

মালবিকা কিম্বা তাঁহার চিত্র রাজার চোখে যেন কখনও না পড়িয়া যায় ধারিণীর ইহাই ছিল মনের ইচ্ছা, সেইজন্যই তিনি এতদিন মালবিকাকে এমন ভাবে রাখিয়া ছিলেন, যে, রাজা একমুহূর্ত্তের জন্যও

তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। আজ যে তাঁহার সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও রাজা মালবিকার ছবিখানি দেখিয়া ফেলিবেন, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাই রাজার কথার কোনও উত্তর না দিয়া যেমন বসিয়াছিলেন তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিলেন। রাজা তখন সস্নেহে একহাত দিয়া রাণীর কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া আদরের সুরে আবার বলিলেন, "এ ছবিখানি কার রাণি?"

রাণী কিন্তু এবারও কোন উত্তর দিলেন না, তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াই রহিলেন। রাজা পড়িলেন সমস্যায়; রাণী যে হঠাৎ কথার উত্তর দেওয়া কেন বন্ধ করিলেন, তিনি ত ভাবিয়া পাইলেন না, কি আর করেন, জিজ্ঞাসু নয়নে রাণীর দিকেই আবার একবার চাহিলেন। রাণী তখনও নীরব, এ কথার উত্তর দিলেন কুমারী বসুলক্ষ্মী। তিনি বলিলেন,"বাবা, এ কার ছবি জান না? এ ছবি যে আমাদের মালবিকার।" "বটে? বেশ এঁকেছে ত, বেশ এঁকেছে ত!" বলিয়া অগ্নিমিত্র চলিয়া গেলেন। মহারাণী পড়িলেন ভাবনায়, তিনি যে কত যত্নে ও কত চেষ্টায় মালবিকাকে গোপনে রাখিয়াছিলেন, সে কেবল তিনি জানিতেন আর জানিতেন সেই সর্ব্বজ্ঞপুরুষ যাঁহার নিকট কোন কিছুই অজানা থাকে না। আজ যে এভাবে রাজার চোখে তাঁহার ছবি পড়িয়া যাইবে, সে আর কে ভাবিয়াছিল! তিনি তখন কিছু দিনের জন্য মালবিকাকে প্রাসাদ হইতে সরাইবার ব্যবস্থা করিলেন। মালবিকার এখন স্থান হইল আচার্য্য গণদাসের বাটী, রাণীর আদেশে সেইখানে থাকিয়াই মালবিকা গীত, বাদ্য, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি শিখিতে লাগিলেন, রাণীও যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

মালবিকাকে সরাইয়া রাণী ত নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু অগ্নিমিত্রের এদিকে চিন্তার উপর চিন্তা আসিয়া জুটিল। আহাঃ, কি সুন্দর ছবিখানি, কি সুন্দর তার রূপ, ছবিতে যাকে এত সুন্দরী দেখায়, না জানি নিজে সে কেমন! অগ্নিমিত্র ত আহার নিদ্রা ভুলিলেন, একবার-অন্তত একবার এই অজানা রূপসীকে না দেখিলে তিনি যে আর থাকিতে পারিতেছেন না। কিন্তু উপায় কি? অন্দরমহলে রাণীর প্রভাব অসীম, রাজার সাধ্য নাই যে,

রাণীর বিনা অনুমতিতে কিছু করেন। অগ্নিমিত্র শেষে নিরুপায় হইয়া বিদূষকের শরণাপন্ন হইলেন। বিদূষকের বুদ্ধিশুদ্ধি বিশেষ কিছু থাক আর নাই থাক, এসব বিষয়ে সে খুব মাথা খাটাইতে পারিত। অগ্নিমিত্র সে সব জানিতেন, তাই তিনি বিদূষককে বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিলেন যেমন করিয়াই হউক, অন্তত একবারটি তাকে দেখাইবার বন্দোবস্ত করিতেই হইবে। বিদূষক স্বীকার করিলেন। তবে ব্যাপার ত বড় সোজা নয়, মহারাণীর কড়া পাহাড়ার ভিতর হইতে মালবিকাকে বাহির করা।

বিদূষক ভিতরকার সমস্ত খোঁজখবর লইয়া এক চমৎকার উপায় বাহির করিয়া ফেলিল। সে একদিন মহারাজের সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে গিয়া দুই সঙ্গীতাচার্য্য গণদাস ও হরদত্তের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত করিয়া রাজার সভায় আসিয়া বসিয়া রহিল। যথাসময়ে দৌবারিক আসিয়া সংবাদ দিল যে, দুই বৃদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য বিবাদ করিয়া আসিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছেন।

বিদূষকের চক্রান্তে যে আচার্য্য দুইজনকে একবার রাজসভাতে আসিতেই হইবে, অগ্নিমিত্র সে কথা খুবই জানিতেন। তাই বিদূষকের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া দৌবারিককে তাঁহাদিগকে লইয়া আসিবার আদেশ দিলেন। আচার্য্য দুইজন রাজসভায় আসিলেন। অগ্নিমিত্র তাঁহাদিগকে বসিবার অনুমতি দিয়া বলিলেন, "এখন ত শিষ্যদিগকে উপদেশ দেবার সময়, তবে দুইজনে একসঙ্গে এখানে চলে এলেন যে?" রাজার কথায় মনে মনে লজ্জিত হইলেও গণদাস বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলিলেন, "মহারাজ, ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝিয়াই মহারাজের নিকট বিচারের জন্য আসিয়াছি। এই আচার্য্য হরদত্ত লোকের নিকট বলিয়া বেড়ায় যে আমি না কি তার চরণধূলিরও যোগ্য নই। এ অপমান আমি সহ্য করিব কেন?"

গণদাসের কথা শেষ হইতেই হরদত্ত বলিয়া উঠিলেন যে, তিনি খুবই বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়াছেন যে, গণদাস লোকের নিকট বলিয়াছে যে ডোবাতে আর সাগরেতে যা প্রভেদ, তাঁহাতে আর গণদাসে সেই রকম প্রভেদ, তিনি আচার্য্য-পদের যোগ্য নহেন ইত্যাদি। অতএব মহারাজই যেন এর বিচার করেন, পরীক্ষা দিতে তিনিও প্রস্তুত।

অগ্নিমিত্র ঈষৎ হাসিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "সমস্যা বটে। তবে একান্ত যদি বিচারই করিতে হয়, মহারাণীর সম্মুখে হওয়াই ভাল, তিনি আর পণ্ডিতা কৌশিকী দুইজনাই সভায় উপস্থিত থাকুন। তারপর যা ভাল বিবেচনা হয় করা যাবে।"

এই বলিয়া তিনি মহারাণীর নিকট লোক পাঠাইলেন। স্বয়ং কঞ্চুকী গিয়া মহারাণী ধারিণী ও পণ্ডিতা কৌশিকীকে সঙ্গে করিয়া রাজ-সভায় আনিলেন।

মহারাজ তাঁহাদিগকে সাদরে আপনার পার্শ্বে বসাইয়া যতিবেশ-ধারিণী কৌশিকীকে বলিলেন, "এই আচার্য্যেরা বিবাদ করিয়া আসিয়াছেন, এ শাস্ত্রীয় বিচার, এর মীমাংসা আপনাকেই করিতে হইবে।"

ঈষৎ হাসিয়া কৌশিকী বলিলেন, "আর পরিহাস করিবেন না মহারাজ, নগর থাকিতে পাড়াগাঁয়ে হবে রত্নপরীক্ষা।"

"না না, তা' নয়," বলিয়া অগ্নিমিত্র একবার রাণীর দিকে চাহিয়া লইয়া বলিলেন, "আমিই বলুন, আর মহারাণীই বলুন, দুজনার মধ্যেই পক্ষপাতিত্ব দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু আপনার মধ্যে সেটুকু নাই।"

আচার্য্যেরাও সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ ঠিকই বলেছেন, আপনি কাহারও পক্ষপাতিনী নহেন, আমাদের দোষগুণ আপনিই বিচার করুন।"

তখন কোন্ বিষয় লইয়া উভয়ের পরীক্ষা হইবে তাহাই হইল আলোচনার বিষয়। নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে যদিই বিচার হয়, তবে তার অভিনয় না দেখিলে ন্যায্য বিচার করা চলে না। তাই কৌশিকী বলিলেন, "আপনারা অভিনয় দেখাইবার ব্যবস্থা করুন, আপনাদের অভিনয় দেখিয়া আমরা গুণাগুণ নির্ণয় করিব।"

অগ্নিমিত্র বলিলেন, "ওঁদের অভিনয় বহুবার দেখা আছে, নূতন করিয়া দেখিবার আর কিছুই নাই।"

তখন কৌশিকী বলিলেন, "তবে এক কাজ করা যাক্। ওদের অভিনয় ত দেখাই আছে কিন্তু অভিনয় শিখাইবার কাহার কিরূপ ক্ষমতা

আজ তাহারই প্রমাণ হউক। শাস্ত্রেও বলে, অভিনয় করিবার আর অভিনয় শিক্ষা দিবার ক্ষমতা যাঁহার আছে, তিনিই হইতেছেন প্রকৃত আচার্য্য।”

হরদত্ত ও গণদাস উভয়েরই কথাটা বেশ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। হরদত্ত বলিলেন,“উত্তম প্রস্তাব, আমার ইহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে।”

গণদাসও মহারাণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “দেবী, তাহা হইলে ইহাই স্থির ?”

মহারাণীর কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। এই যে আচার্য্যদের বিবাদ, অভিনয় শিক্ষা দিবার কৌশলের পরীক্ষা, এর মধ্যে যেন একটা চক্রান্ত আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। এ যেন কোনও গতিকে মালবিকাকেই জড়াইবার চেষ্টা হইতেছে। তিনি বলিলেন, “এসব বিবাদ বড় খারাপ, আমার ইচ্ছা এসব বিবাদ এমনই মিটাইয়া ফেলা উচিত।”

গণদাসকে মহারাণী যথেষ্টই স্নেহ করিতেন, তাই গণদাসের অভিমান হইল মহারাণীর উপর, তিনি বলিলেন, “দেবী, আপনার আশঙ্কা আমি পরাজিত হইব, সে ভয় করিবেন না।”

মহারাণী আর কি বলিবেন, তিনি তবু বলিলেন “শিষ্যের যদি তেমন মেধা না থাকে, তবে তার পরাজয়ে, গুরুর পরাজয় হওয়া কি উচিত ?”

অগ্নিমিত্র বলিলেন, “কেন ? এরকম ত সব জায়গায় হয়, যাহার মেধা নাই তাহাকে যে শিক্ষা দিতে পারে তাহারই ত বাহাদুরী সব চাইতে বেশী।”

গণদাস কথা কহেন না দেখিয়া বিদূষক বলিল, “ওহে গণদাস, দরকার কি এসব বিবাদে, তার চাইতে বাড়ীতে বসিয়া যেমন এতদিন সুখে মিঠাই মণ্ডা খাইতে তেমনি মিঠাই মণ্ডা খাইতে থাক। আমরাও বাঁচি, তোমরাও বাঁচ।”

গণদাস অপ্রস্তুত হইলেন, তিনি বলিলেন, “মহারাণী, নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার সুযোগ পাইয়াছি, দেখুন আমি কি না করিতে পারি।”

মহারাণী বলিলেন, “আমি সে কথা বলিতেছি না, আপনার শিষ্যা একেবারে নূতন, কতদিনই বা সে শিক্ষা পাইয়াছে।”

গণদাস অমনি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "সেই ত আমার কৃতিত্ব, দেখিবেন মহারাণী, অল্পদিনের মধ্যে আমি কিরূপ শিক্ষা দিতে পারিয়াছি, এইজন্যই আমার এত আগ্রহ।"

মহারাণী একেই মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন, তাহার উপর গণদাসের এত আগ্রহ, তিনি যেন অস্থির হইয়া উঠিলেন। একবার পরিব্রাজিকা কৌশিকীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বেশ, তাই যদি হয়, পরীক্ষা আমাদের একা পরিব্রাজিকার সম্মুখেই হ'ক না, এত লোককে মিছে জড়াবার দরকার কি?"

পরিব্রাজিকা কৌশিকী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তা' কি হয় মহারাণী, একা কখনও পরীক্ষা করা চলে? বিচার সকলের সম্মুখে হওয়াই উচিত।"

মহারাণীর আপাদমস্তক যেন জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার এ ক্রোধের ভাব কাহারও চক্ষু এড়াইল না। বিদূষক গণদাসকে বলিলেন, "ওহে গণদাস, যাও হে, তুমি বেঁচে গেছ, বাড়ী যাও এবার, মহারাণী রাগ করেছেন। তোমারই ভাল হ'ল, পরীক্ষা দিতে হ'ল, না।"

গণদাস অমনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "শুনলেন দেবী, পরীক্ষা দিতে আমি কাতর? আপনি অনুমতি করুন, আমি শিষ্যাকে এনে নিজের কৃতিত্ব দেখাই, আর যদি অনুমতি না পাই আপনার, তবে নিশ্চয়ই বুঝব আপনি আমায় ত্যাগ করেছেন।"

এর উপর আর কথা চলে না। মহারাণী বলিলেন, "আপনার যা অভিপ্রায় করুন। আপনি গুরু, শিষ্যার উপর আপনার যথেষ্টই প্রভুত্ব আছে।"

মহারাণীর কথায় সকলকারই মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন কি সম্বন্ধে পরীক্ষা লওয়া হইবে তাহাই সমস্যা হইয়া পড়িল।

পরিব্রাজিকা বলিলেন, "মহিলা কবি শর্ম্মিষ্ঠার ছলিক নামক নাটক অভিনয় করা সোজা নয় বলেই জানি। তারই কিয়দংশ বেশ নিপুণভাবে অভিনয় করে আপনাদের শিষ্যারা দেখান। তা'হলেই আপনাদের কলাকৌশল বুঝতে পারা যাবে।"

আচার্য্যেরা সম্মত হইলেন। তখন স্থির হইল গণদাস ও হরদত্ত তাঁহাদের শিষ্যাদের শিখাইয়া নাট্যশালার নেপথ্যগৃহে লইয়া আসিবেন, সেইখানেই সকলের সম্মুখে বিচার হইবে। যাইবার সময় গণদাস একবার মহারাণীর দিকে চাহিলেন, মহারাণী মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনাকেই যেন জয়ী দেখতে পাই।"

রাজ-সভায় মালবিকার নৃত্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাট্যশালায় গিয়া যে যাহার আসনে বসিলেন। নেপথ্য গৃহ হইতে সঙ্গীতের মৃদু মৃদু ধ্বনি আসিতেছিল, তাই শুনিয়া অগ্নিমিত্র যেন অস্থির হইয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল সম্মুখের ওই যবনিকাটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া মালবিকাকে একবার দেখিয়া ফেলেন।

আচার্য্যেরা ভিতর হইতে সংবাদ পাঠাইলেন, যে, তাঁহাদের শিষ্যারা প্রস্তুত, পরীক্ষা লওয়া হউক। তখন অগ্নিমিত্র পরিব্রাজিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচার্য্য দুইজনার মধ্যে কাহার পরীক্ষা প্রথমে লওয়া হইবে।

পরিব্রাজিকা বলিলেন, "জ্ঞানে অবশ্য দুইজনাই সমান, তবে গণদাস বয়সে বড়, প্রথম সম্মান তাঁহাকেই দেওয়া হউক।"

অগ্নিমিত্র সেই রকমই আদেশ পাঠাইলেন।

যবনিকা উঠিল। প্রথমেই আসিলেন মালবিকা—গণদাসের শিষ্যা, মহারাণীর ইচ্ছানুসারে বেশভূষার তেমন বাহুল্য ছিল না, তবুও মালবিকাকে সেই সামান্য পোষাক পরিচ্ছদে যা মানাইয়াছিল, তাহার তুলনা হয় না। মালবিকা আসিয়াই প্রথমে সকলকে প্রণাম করিয়া গুরুর আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, আর অগ্নিমিত্র একেবারে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিদূষক ছিল পাশেই, অগ্নিমিত্রের ভাবগতিক দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "সখা, কি রকম রূপ?"

অগ্নিমিত্র বলিলেন, "ভাই, এতক্ষণ আমার ভয় হচ্ছিল, চিত্রে যেমনটি দেখেছি, হয়ত আসলে ইনি তত রূপসী নন। কিন্তু এখন এঁকে দেখে বুঝ্‌ছি চিত্রকর এঁর চিত্র আঁকতেই পারেন নি।"

গণদাস আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মালবিকাকে বলিলেন, "বৎসে, লজ্জা কি ভয় কিছু রেখো না। অভিনয় যা কর্‌বার করে যাও।"

গুরুর আদেশ পাইয়া মালবিকা প্রথমে একটি গান গাহিলেন—

"দুর্লভ হে, দুর্লভ হে, প্রিয় আমার,
নিরাশ আমি,
ছেড়েছি তোমারই আশা, ও আমার
হৃদয়-স্বামী।
তবু হে নিঠুর বিধি, বাঁ চোখ আমার,
নাচাও কেন,
পরাধীনা আমি হে নাথ, তবু সে যে
তোমারি জেনো।"

যেমন অতুলনীয় রূপ, তেমনি সুমিষ্ট কণ্ঠ, অভিনয়েরও তেমনি সুন্দর ভঙ্গী। মালবিকার একখানি গীত শুনিয়াই সকলে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বিদূষক মৃদুস্বরে অগ্নিমিত্রকে বলিল, "বন্ধু, শুন্‌লে গানটা? এ যেন তোমাকে উপলক্ষ্য করেই গানটা গাওয়া হ'ল। ইঙ্গিতে কেমন প্রেম নিবেদন জানালে?"

অগ্নিমিত্রও মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঠিক ব'লেছ বন্ধু, আমারও তাই মনে হ'চ্ছে। ঐ যে বল্লে 'নাথ আমি পরাধীনা' এ নিশ্চয়ই দেবী ধারিণীরই ভয়ে। তবে সে যে আমারই, একথা যেন আমাকেই জানান হ'ল।"

গান শেষ করিয়া মালবিকা আবার একবার সকলকে নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, তাহা দেখিয়া বিদূষক উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "যাবেন না, যাবেন না, আসল কাজই যে বাকী।"

গণদাস বলিলেন, "বৎসে, দাঁড়াও, সকলের সম্মতি পেলে তবে যেও।"

মালবিকা সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন, গণদাস একবার সকলের দিকে চাহিয়া প্রথমে বিদূষককেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন, কেমন শুন্‌লেন।"

"প্রথমে কৌশিকীই বলুন," বলিয়া বিদূষক কৌশিকীর দিকে চাহিলেন। কৌশিকী বলিলেন, "গীত, অভিনয় এ ত আমার মন্দ লাগিল না, সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে সুন্দর হইয়াছে বলিতেই হইবে।"

অগ্নিমিত্র বলিলেন, "আমারও চমৎকার লাগিয়াছে।" তাঁহার কথা

শেষ হইতে না হইতেই বিদূষক বলিল,"সকলেরই যখন ভাল লেগেছে তখন পারিতোষিক দি।" এই বলিয়া মহারাজের হাত হইতে সুবর্ণের একটী বলয় খুলিয়া লইয়া মালবিকাকে দিতে গেল। মহারাণী ধারিণীর কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি ভাল লাগিল না, তিনি বলিলেন, "এ কি রকম ব্যবহার! অপর পক্ষের গুণাগুণ না দেখিয়াই একজনকে পুরস্কার দেওয়া কি?"

"পরের জিনিষ বলিয়াই দেবার এত তাড়া।" বলিয়া মৃদু হাসিয়া বিদূষক বলয়টি অগ্নিমিত্রের হাতেই আবার পরাইয়া রাখিল। তখন মহারাণী গণদাসকে বলিলেন, "আর্য্য গণদাস, আপনার শিষ্যা অভিনয় দেখিয়েছেন ত!"

• "হাঁ, রাণীমা" বলিয়া গণদাস মালবিকাকে বলিলেন, "চলে এস বৎসে, আমরা এখন যাই।" মালবিকা গণদাসের সহিত চলিয়া গেলেন। তারপর আসিলেন হরদত্ত। তিনি মহারাজ অগ্নিমিত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এবার অনুমতি করুন আমি আমার শিষ্যাকে লইয়া আসি।"

যাহার জন্য এত চক্রান্ত, এত অভিনয়ের আড়ম্বর সে উদ্দেশ্য ত অগ্নিমিত্রের সাধিত হইয়াই গিয়াছিল। হরদত্তের শিষ্যা আসুক বা নাই আসুক তাহাতে তাঁহার কোনও রূপ আগ্রহ ছিল না। তবু তিনি ভদ্রতার খাতিরে বলিলেন, "হাঁ, আসুন আপনার শিষ্যাকে, তাঁহার অভিনয় দেখিবার জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত হইয়া আছি।"

ঠিক সেই সময় মহারাজের পরিচারকেরা আসিয়া জানাইল, যে ভোজনের সময় হইয়াছে, আহারও প্রস্তুত।

"আহার প্রস্তুত" শুনিয়া বিদূষক বলিয়া উঠিল, "তাইত! আহার প্রস্তুত, তবে ত আর বসিয়া থাকা উচিত নয়, চিকিৎসকেরা নিয়মিত সময়েই ভোজন করিতে বলেন। চলুন।"

অগ্নিমিত্রও তাহাই চাহিতেছিলেন, হরদত্তকে বলিলেন, "আজ তবে থাক, কাল দেখা যাইবে।"

সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তখনকার দিনে স্ত্রীপুরুষে দোলনায় বসিয়া 'দোল খাওয়া' মহা কৌতুকের ব্যাপার ছিল। বসন্তকালে এই রকম 'দোল খেলা, রাজারাণীদের বসন্তোৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ হইত। বসন্তোৎসবের আর একটা প্রধান অঙ্গ ছিল, কোনও রূপসী যুবতীকে পুষ্পের আভরণে সাজাইয়া অশোক তরুর মূলে তাহার চরণস্পর্শ করান। ইহাকে অশোক তরুর 'দোহদসঞ্চার' বলা হইত। এইরূপ চরণস্পর্শের পর পাঁচদিনের মধ্যে যদি অশোকগাছে ফুল ফুটিত, তবে সকলের আর আনন্দের সীমা থাকিত না। অশোক তরুর 'দোহদসঞ্চারের' ভার সাধারণত রাণীদের উপর পড়িত।

সেবার বসন্তোৎসবের দিন বিদূষকের চপলতায় মহারাণী ধারিণী দোলা হইতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া পায়ে এমন আঘাত পাইয়াছিলেন যে, একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। মহারাণী যেদিন পড়িয়া যান, তার পরের দিন তাঁহার অশোক তরুর মূলে চরণ স্পর্শ করাইবার পালা ছিল। মহারাণী অসুস্থ, তিনি নিজে যাইতে পারিবেন না বলিয়া প্রাসাদের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী মালবিকাকে একাজের ভার দিয়া তাঁহাদের প্রমোদবনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আর তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলিয়াছিলেন, নিজের এক পরিচারিকা বকুলাবলিকাকে।

সেদিন বসন্তোৎসব। অগ্নিমিত্রের দ্বিতীয়া মহিষী ইরাবতী রাজার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, যে 'আজ তাঁহারা দু'জনে প্রমোদ উদ্যানের দোলাগৃহে যাইয়া দোলায় চড়িয়া আমোদ করিবেন। অগ্নিমিত্রের মন ভাল ছিল না। অভিনয়ের দিন সেই যে মাত্র একটীবার মালবিকার দেখা পাইয়াছিলেন, সেই হইতেই তিনি মালবিকাকে আবার একবার দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই খুব চতুরা হয়, তিনি মুখে যতই প্রণয় দেখান না কেন, তাঁহার মনের ভাব ইরাবতী জানিতে পারিবেনই, তাই সে দিন আর 'দোল

খেলিতে' যাইবার তাঁহার সাহস ছিল না। তবু পাছে এই লইয়া কোনও মনোমালিন্য হয়, এই ভয়ে গৌতমের পরামর্শে প্রমোদবনেই গেলেন। সেখানে খানিকক্ষণ এদিক ওদিক করিতে না করিতেই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন স্বয়ং মালবিকা উদ্যানে প্রবেশ করিয়া অশোক তরুর দিকে যাইতেছেন। মালবিকা কি করে, কোথায় যায় দেখিবার জন্য তাঁহারা একটা ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহারা দেখিলেন মহারাণী ধারিণীর একজন তরুণী পরিচারিকা বকুলাবলিকা মহারাণীর পায়ের নূপুর লইয়া অশোক তরুর কাছে মালবিকার সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিল। বকুলাবলিকাকে দেখিয়া বিদূষক যেন অকূলে কূল পাইল। সে পূর্ব্ব হইতেই অগ্নিমিত্রের নাম করিয়া ও পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া তাহাকে হাত করিয়া ফেলিয়াছিল, এখন কি ভাবে তাহার দূতীগিরি সফল হয় জানিবার জন্য তাঁহারা দুইজনে আরও নিকটে আসিয়া নিজেদেরকে অন্তরালে রাখিয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে লাগিলেন।

বকুলাবলিকা তখন মালবিকাকে বলিতেছিল, "দাও ভাই, তোমার একটা পা মেলে দাও, আল্‌তা আর নূপুর পরিয়ে দি।"

বকুলাবলিকা পায়ে হাত দিয়া আল্‌তা পরাইয়া দিবে, মালবিকা তাই যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিলেন, কিন্তু পা না বাড়াইয়া উপায় নাই, তাই বকুলাবলিকার দিকে পা মেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ক্ষমা ক'রো ভাই।" বকুলাবলিকা বলিল, "এতে আর লজ্জা কিসের? তুমিত আমারই শরীর ভাই, তোমায় আমায় কিছু প্রভেদ আছে?" এই বলিয়া মালবিকার স্বভাবতই রাঙা পায়ে বেশ নিপুণ ভাবে আল্‌তা পরাইতে লাগিল।

এমন লোভনীয় দৃশ্য অগ্নিমিত্র একেবারে তন্ময় হইয়া দেখিতে লাগিলেন। এক পায়ে আল্‌তা পরাইয়া বকুলাবলিকা বলিল, "দেখ ভাই, কেমন হ'ল।" "ভারি সুন্দর হ'য়েছে ত।" বলিয়া মালবিকা একবার নিজের চরণের দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন, "নিজের পা কি না, তাই প্রশংসা করতে লজ্জা বোধ হচ্ছে। কার কাছ থেকে শিখেছ, ভাই?"

ঈষৎ হাসিয়া মুখ নত করিয়া বকুলাবলিকা বলিল, "স্বামী আমায় শিখিয়েছে। ছাড়ে না ভাই, নিজেই আমার পায়ে আল্‌তা পরিয়ে দেয়, বেশ পরায় কিন্তু।"

"গুরুদক্ষিণা কি দিয়েছিস্ ভাই ?" বলিয়া মালবিকা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

"বল্‌ব এখন, কিন্তু কি সুন্দর মানিয়েছে তোকে, মনে হচ্ছে যেন একটী লালটুকটুকে পদ্মফুল মাটির উপর ফুটে রয়েছে। এমন রূপ না হ'লে আর মহারাজ পাগল হ'ন।"

মালবিকা চম্‌কাইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "কার কথা বল্‌ছ ? আমার কি এমন রূপগুণ যে মহারাজ আমায় চাইবেন ?"

"নিজের গুণ নিজে কি কেউ জান্‌তে পারে ? মহারাজ কিন্তু চেয়েছেন তোকে, সত্যি বল্‌ছি ভাই, গৌতমকে দিয়ে একথা তিনি নিজেই আমায় ব'লে পাঠিয়েছেন।" বলিয়া বকুলাবলিকা মালবিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

এদিকে রাণী ইরাবতী অগ্নিমিত্রের সহিত দোল খেলিবার আশায় একটী সহচরীকে সঙ্গে লইয়া প্রমোদ উদ্যানে আসিয়াছিলেন। আসিবার সময় সেকালের অনেক বড় ঘরের মেয়েদের মত তিনিও এ বসন্তোৎসবের দিনে খানিকটা মদ খাইয়া আসিয়াছিলেন। দোলাগৃহে রাজাকে দেখিতে না পাইয়া তিনি ভাবিলেন নিশ্চয়ই রাজা আজকের দিনে রহস্য করিবার লোভে এই প্রমোদ-কাননেরই একটা কুঞ্জে লুকাইয়া আছেন। তিনি তাই কুঞ্জে কুঞ্জে প্রিয়তমের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একটা কুঞ্জের কাছে আসিয়া যা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন অশোকতরুর তলায় মালবিকার পায়ে বকুলাবলিকা নূপুর পরাইয়া দিতেছে, আর তাহারই নিকটে আর একটা ঝোপের অন্তরালে দাঁড়াইয়া অগ্নিমিত্র তন্ময় ভাবে প্রশংসমান নেত্রে মালবিকাকে দেখিতেছেন। একে তাঁহার সেদিন মনের অবস্থা ভাল ছিল না, নেশায় তাঁহার গা মাথা ঘুরিতেছিল, তাহার উপর এই দৃশ্য! তাঁহার মনে হইতেছিল ছুটিয়া গিয়া মালবিকার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া আনেন। কিন্তু রাজা

মালবিকার আলতা পরা

নিজে কি করেন দেখিবার জন্য কোনও গতিকে নিজেকে সামলাইয়া রাখিয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে লাগিলেন।

মালবিকার চরণে তখন নূপুর পরান হইয়া গিয়াছিল। বকুলাবলিকা তাঁহাকে এইবার অশোক তরুর মূলে চরণস্পর্শ করাইতে বলিল। মালবিকা উঠিয়া নিতান্ত সঙ্কুচিতা হইয়া কোনও গতিকে বৃক্ষের মূল বামপদ দিয়া স্পর্শ করিলেন। অগ্নিমিত্র সমস্তই দেখিতেছিলেন, দেখা দেবার এই উত্তম সুযোগ ভাবিয়া একেবারে মালবিকার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মালবিকা বকুলাবলিকা দুইজনে দেখিলেন সম্মুখে মহারাজ। তাঁহারা অমনি সসম্ভ্রমে বলিয়া উঠিলেন,"মহারাজের জয় হউক।" বলিয়া দুইজনে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অগ্নিমিত্র "আহাঃ কর কি, কর কি" বলিতে বলিতে মালবিকার কুসুমকোমল হাত দুইখানি ধরিয়া উঠাইয়া তাঁহার দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়া মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অশোক তরুর মূল বড় কঠিন, তোমার ওই ফুলের মত কোমল বাঁ পাখানি ওতে স্পর্শ করালে, লাগেনি ত ?"

লজ্জায় মালবিকার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি মুখটি নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাণী ইরাবতীর নেশা তখন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। প্রিয়তম স্বামীর এই লজ্জাহীন ব্যবহার দেখিয়া রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল। তিনি ঝটিকার ন্যায় কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া একেবারে গিয়া দাঁড়াইলেন অগ্নিমিত্র ও মালবিকার মাঝে। সহসা ইরাবতীকে দেখিয়া সকলেই চমকাইয়া উঠিলেন। কি যে অনর্থ ঘটিবে তাহা ভাবিয়া মালবিকার ও বকুলাবলিকার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। ইরাবতী একবার সকলকার দিকে চাহিয়া অগ্নিমিত্রকে বলিলেন, "প্রার্থনা পূরণ হ'ল ? অশোক তরু যে একেবারে ফল প্রসব করলে দেখ্‌ছি।" বিদূষক তখন অগ্নিমিত্রকে বলিল, "সখা, ব্যাপার সুবিধা নয়, পালাই চল।" কিন্তু এ অবস্থায় পলায়ন করিয়াইবা লাভ কি, ভাবিয়া অগ্নিমিত্র দাঁড়াইয়াই রহিলেন। ইরাবতী তখনও রাগে ফুলিতেছিলেন, বকুলাবলিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি গো বকুলাবলিকে, বেশ কাজের ভার নিয়েছ, বাসনা পূরণ কর।"

বকুলাবলিকা ইরাবতীকে ভালরূপেই চিনিত, সে তাই সভয়ে বলিয়া উঠিল, "আমরা এর কিছুতেই নাই, রাণী মা। পাটরাণীমার আদেশে আমরা এসেছি এখানে, আমাদের আর কোনও উদ্দেশ্য নাই।" এই বলিয়া বকুলাবলিকা রাণী ইরাবতীকে প্রণাম করিয়া মালবিকাকে লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ইরাবতী তখন অগ্নিমিত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ছিঃ ছিঃ, এত শঠ তুমি, পুরুষ মানুষকে আবার বিশ্বাস করতে আছে? তোমরা কেবল মিষ্টকথায় নারীর মন ভোলাতে জান। তোমরা ব্যাধ, ব্যাধ। ব্যাধেরা যেমন গান গেয়ে হরিণীকে কাছে এনে তাকে বিনাশ করে তোমরাও ঠিক তাই।"

অগ্নিমিত্র বলিলেন, "মিছে রাগ করা। তুমিই আমায় আস্‌তে ব'লেছিলে। এসে দেখি তুমি নাই, তাই একটু এদিক ওদিক ঘুরে দেখছিলাম। মালবিকা আমার কে? তাকে আমার কোনও দরকার নাই।"

"থাক্‌, থাক্‌, তোমার এদিক ওদিক ঘুরে দেখা আমি সব জানি, তুমি এত শঠ।" এই বলিয়া ইরাবতী সরোষে সেখান হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

অগ্নিমিত্র খানিকটা আগাইয়া গিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে, মিছে সন্দেহ ক'রে কষ্ট পাচ্ছ।"

কিন্তু ইরাবতী কিছুই শুনিলেন না, তিনি মুখ ফিরাইয়া আবার চলিতে লাগিলেন। অগ্নিমিত্র দেখিলেন বেগতিক, তিনি রাণীকে শান্ত করিবার জন্য একেবারে ইরাবতীর পা দুটী জড়াইয়া ধরিলেন।

"ছাড়, ছাড়, এ ত আর মালবিকার পা নয়। আমি আর তোমার কে?" বলিয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া ইরাবতী প্রাসাদে চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আপনার কক্ষে আসিয়া রাণী ইরাবতী শয্যার উপর শুইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যাঁহাকে তিনি প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসেন, তাঁহার এই বিশ্বাসঘাতকতা। কয় বৎসরইবা তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছে, এর মধ্যেই স্বামী অপরের হইয়া গেলেন। এই সেদিন পর্য্যন্তও তিনি কত আদর, কত সোহাগ পাইয়াছেন, আর আজ? ইরাবতী আর ভাবিতে পারিলেন না।

অনেকক্ষণ কাঁদিবার পর ইরাবতী আপনার দেহ হইতে একে একে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ছড়াইয়া ফেলিলেন। তিনি ভাবিলেন যে নারী স্বামীর প্রেম হারায় তাহার আবার বেশভূষা! তাঁহার সর্ব্বস্বই গিয়াছে, তিনি আজ ভিখারিণী। তিনি ভিখারিণীর সাজেই থাকিবেন।

সেদিনটা কোনও গতিকে কাটাইয়া তাহার পরের দিন সকাল বেলা তিনি মহারাণী ধারিণী কেমন আছেন দেখিতে গেলেন। ধারিণী তখন প্রাসাদের বারান্দায় শুইয়া বায়ু সেবন করিতেছিলেন। ইরাবতী যাইতেই তিনি আপনার শয্যার একপার্শ্বে তাঁহাকে বসাইয়া ইরাবতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিষণ্ণ মুখ, মলিন বেশ, না আছে বেশভূষার পারিপাট্য, না আছে দেহে একখানিও অলঙ্কার। বিলাসপ্রিয় ইরাবতীর এমন বেশ কেহ কখনও দেখে নাই। ধারিণী অবাক হইয়া গালে হাত দিয়া ইরাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি, একি বেশ? গহনাপত্র সব কি হ'ল?"

ইরাবতী সে কথার উত্তর দিলেন না, তিনি বলিলেন, "তোমার পায়ের ব্যথাটা কেমন আছে দিদি? একটু সেরেছে?"

ধারিণী বলিলেন, "আমি যা জান্‌তে চাইছি, আগে তারই উত্তর দাও ত, আজ এ বেশ কেন?"

ইরাবতী তবুও কোন কথা কহিলেন না, ধারিণী তখন তাঁহার একখানি হাত আপনার হাতের মধ্যে লইয়া আদরের সুরে বলিলেন, "নাগর বুঝি কাল মান ভাঙায় নি?"

ইরাবতী আর থাকিতে পারিলেন না, নীরবে অবিচার সহ্য করিয়া

থাকিবার মত মেয়ে তিনি নন। তিনি তখন অশোক তরুর তলায় রাজার আর মালবিকা বকুলাবলিকার সমস্ত ব্যাপার যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, একে একে সমস্ত বলিয়া এর উপযুক্ত শাস্তিও চাহিয়া বসিলেন। সপত্নী হইলেও মহারাণী ধারিণী ইরাবতীকে নিজের কনিষ্ঠা ভগিনীর মতই দেখিতেন, স্বামীর এ প্রবঞ্চকতা তাঁহারও অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি তখনই আপনার রক্ষিণীদিগকে আদেশ দিলেন যেন এখনই তাহারা মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া ভূমির নিম্নে তাঁহার যে কোষাগার আছে, তাহারই পাশের একটী গৃহে দুইজনকে বন্দী করিয়া রাখে। তিনি প্রধান রক্ষিণী মাধবিকাকে আরও বলিয়া দিলেন যে, তাঁহার সর্পমুদ্রাযুক্ত অঙ্গুরীর মোহরাঙ্কিত ছাড়পত্র না দেখিলে, কিছুতেই যেন হতভাগিনীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া না হয়।

তাহাই হইল। মালবিকা ও বকুলাবলিকা বন্দিনীই হইলেন। সংবাদটা প্রচার হইতেও বিলম্ব হইল না, এসব ব্যাপার ত আর বেশীক্ষণ চাপা থাকে না। প্রাসাদের সকলেই শুনিলেন, কথাটা অগ্নিমিত্রেরও কানে উঠিল। তিনি পড়িলেন মহাভাবনায়। মালবিকার আর দোষ কি, তবে একথা মহারাণীকে যে তিনি নিজে বলিবেন, তাহাও ত হইতে পারে না। তাঁহার নিজের মুখে মালবিকার সম্বন্ধে কোন কথাই বলা চলে না। কি যে করিবেন তিনি কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। বিদূষকই ছিল তাঁহার এসব বিষয়ে প্রধান সহায় ও মন্ত্রণাদাতা, তাই তিনি আবার বিদূষকেরই শরণাপন্ন হইলেন।

বিদূষক বলিল, "মালবিকার উদ্ধার! মহা সমস্যার ব্যাপার। ধারিণী, ইরাবতী দুই রাণীই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, সতর্ক পাহারার বন্দোবস্ত রহিয়াছে, এ অবস্থায় মালবিকাকে কি করিয়া উদ্ধার করা যায়।" অনেকক্ষণ পরামর্শ করিয়াও দুইজনের কেহই কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। শেষে বিদূষকের মাথায় এক বুদ্ধি আসিল। সে বলিল, "সখা, উপায় বা'র ক'রেছি।" অগ্নিমিত্র উৎসুক হইয়া বলিলেন, "উপায় বার ক'রেছ! কি বল ত?" পাছে আর কেউ শুনিতে পায়, তাই বিদূষক অগ্নিমিত্রের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া যা ভাবিয়াছিল, সব বলিল।

শুনিয়া অগ্নিমিত্র সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক হবে, সখা কাজ করে যাও।"

তখন বিদূষক চলিলেন নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে, অগ্নিমিত্রও একবার মহারাণী ধারিণী কেমন আছেন দেখিতে গেলেন।

মহারাণী তখনও প্রাসাদের বারান্দায় শয্যার উপর শুইয়া বায়ু সেবন করিতেছিলেন, পরিব্রাজিকা কৌশিকী তাঁহাকে গল্প শুনাইতেছিলেন। অগ্নিমিত্র যাইতেই মহারাণী উঠিবার চেষ্টা করিলেন, অগ্নিমিত্র বলিলেন, "থাক্, থাক্, তোমার আর উঠিয়া কাজ নাই, পায়ে বেদনা, তুমি শুয়েই থাক।" তারপর পরিব্রাজিকাকে প্রণাম করিয়া ধারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেদনা কিছু কম্‌ল ?"

"আজ একটু ভাল আছি।" বলিয়া ধারিণী আবার একটু উঠিবার চেষ্টা করিলেন।

সেই সময় যেন বিদূষকের চীৎকার শুনা গেল। সে যেন চেঁচাইয়া বলিতেছে, 'বাবাগো, গেলাম গো।"

সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। এক হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে পৈতা জড়াইয়া বিদূষক সেইখানে আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "আমায় বাঁচান, আমায় বাঁচান, সাপে কাম্‌ড়েছে।"

বিদূষককে সর্প দংশন করিয়াছে শুনিয়া সকলেরই মন খারাপ হইয়া গেল।

অগ্নিমিত্র বলিলেন, "সাপ! কোথায় ছিল সাপ ?"

"ওরে বাবারে, গেলাম রে, বাগানে গেছ্‌লাম ফুল তুল্‌তে রাণীমাকে দেবার জন্যে, ওরে বাবারে গাছে ছিল সাপরে, মারলে এক ছোবল এই ডান হাতে।" বলিয়া বিদূষক হাত দেখাইল।

"এঁ্যা, আমার জন্যে ফুল তুলতে গিয়ে সাপে কামড়াল।" কথাটা মহারাণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত বলিয়া ফেলিলেন।

"মরলুম রাণীমা, আর বাঁচব না, ওরে বাবারে মহারাণীর বাগানে সাপ থাকে কে জান্‌ত রে।" বলিয়া বিদূষক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

ধারিণী বলিলেন, "বিষ-বৈদ্যকে এখনই ডাকিয়া আন, ঔষধ দিক।"

"ওরে বাবারে, বৈদ্য কি করবে রে, আমার হাত পা যে অসাড় হ'য়ে আস্‌ছে, আমি যে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না চোখে।" বলিয়া বিদূষক সেইখানেই শুইয়া পড়িল।

মহারাণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া বলিলেন, "তোমরা সবাই ধর একে।" পরিব্রাজিকা সসম্ভ্রমে বিদূষককে ধরিলেন।

বিদূষক অগ্নিমিত্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি আমায় বন্ধুর মত স্নেহ করেন, জননীকে দেখ্‌বেন। আমি গেলে তাঁকে দেখবার যে আর কেউ থাকবে না।"

অগ্নিমিত্র বলিলেন, "ভয় নাই, বিষ-বৈদ্য এল-ব'লে, তিনি এলেই, তুমি ভাল হয়ে যাবে।"

গৌতমের অবস্থা দেখিয়া সকলেই ভীত হইয়া পড়িলেন, মহারাণী নিজে উঠিতে পারেন না, তাই তিনি সকলকে বিদূষকের সেবা করিতে বলিলেন। এমন সময় এক পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল যে বিষ-বৈদ্য ধ্রুবসিদ্ধি আসিয়াছেন, বিদূষককে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে হইবে।

অগ্নিমিত্র তখনই কঞ্চুকীকে বলিলেন, "গৌতমকে ধ্রুবসিদ্ধির নিকট লইয়া যাও।"

বিদূষক অতিকষ্টে উঠিয়া কঞ্চুকীর স্কন্ধে ভর দিয়া যাইতে যাইতে কাতরদৃষ্টিতে একবার মহারাণীর দিকে চাহিয়া বলিল, "রাণীমা বাঁচি কি না বাঁচি, আপনার শ্রীচরণে অনেক অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করিবেন।"

"দীর্ঘজীবী হ'ন, সেরে উঠুন।" বলিয়া মহারাণী চোখ মুছিলেন। সকলেরই মুখে উৎকণ্ঠার ভাব। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে আবার একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "মহারাজ, ধ্রুবসিদ্ধি একটি সর্পমুদ্রা চেয়েছেন, শাস্ত্রের বিধান অনুসারে সর্পমুদ্রিকা কল্পনা করা চাই, তবে সাপের বিষ নাম্‌বে।"

মহারাণীর অঙ্গুরীতে সর্পমুদ্রা ছিল। তিনি তখনই আপনার হাত হইতে অঙ্গুরীটি খুলিয়া পরিচারিকার হাতে দিলেন, আর মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, গৌতম যেন এযাত্রা বাঁচিয়া যায়।

মহারাণীর অঙ্গুরীটী পাইয়া ধ্রুবসিদ্ধি সকলকে গৃহ হইতে চলিয়া যাইতে বলিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন। বিদূষক মহাখুসী, সে একখানি পত্র অঙ্গুরীটীর দ্বারা মোহরাঙ্কিত করিয়া ধ্রুবসিদ্ধিকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া দিল। তাহার পর মোহরযুক্ত পত্রখানি লইয়া গুপ্ত পথ দিয়া মহারাণীর কোষাগারের দিকে চলিল। যাহার সহিত দেখা হইল তাহাকেই নিজের আরোগ্যের কথা মহারাণীকে জানাইতে বলিয়া কোষাগারের সম্মুখে আসিয়া বিদূষক দেখিল, দুইজন সশস্ত্র প্রহরিণী কারাগারের নিকট বসিয়া রহিয়াছে।

এইবার একটা খুব বড় কাজ করিতে পাইবে ভাবিয়া বিদূষক মহা উৎসাহে একজন প্রহরিণীকে গম্ভীরভাবে মহারাণীর অঙ্গুরীর মোহরযুক্ত পত্রখানি দিয়া মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করিয়া দিতে বলিল। তখনকার দিনে প্রায় সব মেয়েরাই লিখিতে পড়িতে জানিতেন। প্রহরিণী পত্রখানি পাঠ করিয়া ভাবিল ছাড়িয়াই দেওয়া যাক্। তবে বিদূষক আসিয়াছে, তাহার সহিত একটু রহস্য করিবার লোভ যেন ছাড়া যায় না। তাই সে মনে মনে হাসিয়া গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "কেবল এ দেখেই ত ছাড়া যায় না।"

বিদূষক ব্যস্তভাবে বলিল, "কেন? মহারাণীর আদেশ, তাঁহার মুদ্রাযুক্ত পত্র, এতেও ছাড়া যায় না?" বিদূষকের ব্যস্ততা দেখিয়া হাসি টিপিয়া রাখা তাহাদের পক্ষেও শক্ত হইল, কোনও গতিকে হাসি সামলাইয়া লইয়া তাহারা বলিল, "মহারাণী বুঝি আর লোক পেলেন না নিজের অত বিশ্বাসী পরিচারিকা থাকিতে মালবিকার মুক্তির ভার দিলেন আপনাকে, এ বিশ্বাস হয় না।" বলিয়া তাহারা মুখ টিপিয়া হাসিল।

বিদূষক পড়িল মুস্কিলে, সামান্যা রক্ষিণী, তাহারা যে এমন বিপদ বাধাইবে, বিদূষক অতটা ভাবে নাই। অথচ ব্যাপারটী এত গোপনীয় যে, এ লইয়া তাহাদের সহিত বাদানুবাদও চলে না। সমস্যা জটিল হইয়া উঠিল। বিদূষক মূর্খ হইলেও উপস্থিত বুদ্ধি তাহার মন্দ যোগাইত না। সে মনে মনে এক উপায় চিন্তা করিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "সব কথা কি আর তোমাদের বলা যায়,তোমরা সামান্য প্রহরী বৈ ত নয়।"

তবে এর মধ্যে কিছু গুপ্ত রহস্যও আছে, সেটি কি তাহা শুনিবার জন্য প্রহরিণীদের আগ্রহের অন্ত রহিল না। তাহারা জানিত বিদূষকের নিকট কোনও কথা গোপন থাকে না, তাই তাহারা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। বিদূষক বলিল, "তোমরা যখন নিতান্তই ছাড়বে না, তখন শোন। এই কাল দুপুরে এক জ্যোতিষী এসেছিলেন মহারাণীর কাছে।"

"জ্যোতিষী কি বল্লে?" বলিয়া প্রহরিণীরা উৎসুক হইয়া বিদূষকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিদূষক খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "জ্যোতিষী বল্লেন কি জান? জ্যোতিষী মহারাণীর হাত দেখে বল্লেন, মহারাজের লক্ষ্মী চঞ্চলা হয়েছেন—"

"এঁ্যা, এই কথা বল্লে জ্যোতিষী?" বলিয়া প্রহরিণীরা উৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়িল, বিদূষক আবার বলিল, "তবে একথাও তিনি বলেছেন যে, সমস্ত কয়েদীদের যদি খালাস করে দেওয়া যায়, তবেই মহারাজের মঙ্গল হতে পারে।" প্রভুর মঙ্গল হইবে শুনিয়া তাহারা আর দ্বিধামাত্র না করিয়া মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে ছাড়িয়া দিল। বিদূষক তাহাদিগকে একেবারে প্রমোদ-কাননের 'সমুদ্রগৃহে' যাইয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়া নিজে অগ্নিমিত্রকে সুসংবাদটি দিবার জন্য আবার একবার প্রাসাদের দিকেই চলিল।

অগ্নিমিত্রও তখন আসিতেছিলেন প্রমোদ-উদ্যানের দিকেই, বিদূষককে দেখিতে পাইয়া তাহাকে মালবিকার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। কি কৌশলে যে মালবিকাকে উদ্ধার করা হইয়াছে সংক্ষেপে বলিয়া বিদূষক অগ্নিমিত্রকে আবার বলিল, "চলুন, তাড়াতাড়ি যাই, সমুদ্রগৃহে মালবিকাকে রাখিয়া আসিয়াছি।"

দুইজনে প্রমোদকাননের মধ্যে যে সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত অট্টালিকা ছিল, অগ্নিমিত্র যাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'সমুদ্রগৃহ'—সেইখানে আসিয়া অগ্নিমিত্র বলিলেন, "সখা, মালবিকা আমায় ভালবাসিবেন ত। এস না দেখি এই জানলাটার পাশ থেকে ভিতরে কি করছেন ওঁরা।"

তাঁহারা লুকাইয়া দেখিতে লাগিলেন, মালবিকা আর বকুলাবলিকা তখন গৃহের ভিতরের চিত্রগুলি দেখিতেছিলেন। সেখানে অগ্নিমিত্রের একখানি চিত্র ছিল, সেখানিতে তিনি তাঁহার নবপরিণীতা পত্নী ইরাবতীর দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। মালবিকার চিত্রখানি খুব ভাল লাগিল। তিনি বকুলাবলিকাকে বলিলেন, "সেদিন প্রভুকে দেখে যেমন পিপাসা মেটে নি, আজও তেমনি এঁর চিত্র দেখে তৃপ্তি হচ্ছে না।"

বিদূষক অগ্নিমিত্রের কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, "শোন, বন্ধু তুমি যেমন ওঁকে দেখ, উনিও তোমায় সেইরকম দেখতে আরম্ভ ক'রেছেন।"

তাঁহারা আরও শুনিলেন মালবিকা বকুলাবলিকাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আচ্ছা, প্রভু যে পাশ ফিরে ওই মেয়েটিকে দেখছেন, উনি কে ?"

"উনি যে রাণী ইরাবতী।" এই কথা বলিয়াই বকুলাবলিকার মালবিকার সহিত একটু রহস্য করিবার ইচ্ছা হইল, সে তাই আবার বলিল, "দেখছ ত মহারাজ ইরাবতীকে কত ভালবাসেন।"

"তবে আর আমায় চাওয়া কেন ?" বলিয়া মালবিকা মুখ ফিরাইয়া লইলেন। সে ছবিখানি দেখিবার তাঁহার আর প্রবৃত্তি হইল না, তিনি আর একখানি ছবি দেখিবার জন্য সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

বকুলাবলিকা তাঁহার সামনে আসিয়া বলিল, "একটা কথা বল্‌লাম, তোর রাগ হ'ল অমনি।"

ঈষৎ হাসিয়া মালবিকা বলিলেন, "রাগ ক'রে থাকি, রাগ ভাঙা না।"

অগ্নিমিত্র দেখিলেন দেখা দিবার ইহাই উত্তম সুযোগ, তিনি একেবারে মালবিকার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "সুন্দরি, তোমার এ দাস থাকৃতে মান ভাঙাতে যাবে সখী ?"

মালবিকা লজ্জায় অভিভূতা হইয়া পড়িলেন। এ কথার যে কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। অগ্নিমিত্র মালবিকার একখানি হাত আপনার হাতের মধ্যে লইয়া বিদূষককে বলিলেন, "কৈ, তোমার বান্ধবী যে কথার উত্তরই দেন না।"

অগ্নিমিত্রের হাত হইতে আপনার হাতখানি ছাড়াইয়া লইয়া মালবিকা

বসন্তোৎসব

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বলিলেন, "আবার যে স্বামীকে দেখতে পাব, এ ভরসা আমি স্বপ্নেও করতে পারিনি।"

হাসিমুখে বকুলাবলিকা বলিল, "মহারাজ এর উত্তর দেন।"

মালবিকার মুখে 'স্বামী' সম্ভাষণ শুনিয়া অগ্নিমিত্রের আর আনন্দের সীমা ছিল না, তিনি বলিলেন, "মুখে আর এর উত্তর দেব কি। আজ থেকে আমি ওঁর দাস, ওঁর সেবা ক'রেই আমার দিন যাবে।"

বিদূষক এতক্ষণ কথা কহে নাই, জানালা দিয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "ও বকুলাবলিকা, এই দেখ হরিণশিশুটা অশোক গাছের কচি কচি ডালগুলি সব খেয়ে ফেল্লে, এস এস তাড়িয়ে দি।"

• "সব খেয়ে ফেল্লে! চলুন, চলুন।" বলিয়া বকুলাবলিকা বিদূষকের সহিত গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। অগ্নিমিত্র মালবিকাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।

বাহিরে আসিয়া বিদূষক সমুদ্রগৃহের দ্বারে শয়ন করিয়া রহিল, বকুলাবলিকাও কিছু দূরে থাকিয়া কেউ আসিয়া পরে কি না দেখিতে লাগিল।

এদিকে রাণী ইরাবতীর চন্দ্রিকা নাম্নী এক পরিচারিকা প্রমোদ-উদ্যানের নিকট দিয়া আসিবার সময় বিদূষককে দেখিতে পাইয়াছিল। তাই সে ইরাবতীর কাছে আসিয়া কথা প্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিল, যে, এই ঠিক দুপুর রোদে বিদূষক প্রমোদ-কাননে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সহসা এমন সময় বিদূষক যে কেন প্রমোদ-কাননে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা কেহই ভাবিয়া পাইলেন না। রাণী ইরাবতী তাঁহারই এক সহচরীকে বলিলেন, "দেখ, সেদিন স্বামী আমার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইতে এসেছিলেন, আমি রাগ ক'রে চলে এসেছিলাম, কাজটা অন্যায় হ'য়ে গেছে, চল সমুদ্রগৃহে আমাদের যে ছবি আছে, সেই ছবিখানির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে থেকে ক্ষমা চেয়ে আসি।"

তাঁহার সহচরী বলিলেন, "বেশ কথা ত। স্বামীকে প্রসন্ন না ক'রে তাঁর ছবির কাছে থেকে মাপ চাওয়া এ আবার কেমন, এমন কথা ত কখনও শুনি নি।"

ইরাবতী বলিলেন, "তুমি বুঝছ না, স্বামী এখন কি আর আমার আছেন যে, তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইব। তার চেয়ে ছবির কাছ থেকে ক্ষমা চাইলে নিজের দোষটাত কাটাতে পারব।"

"মন্দ নয়, তাই চল।" বলিয়া তাঁহার সহচরী ইরাবতীকে সঙ্গে করিয়া সমুদ্রগৃহের দিকে চলিলেন।

সমুদ্রগৃহের প্রায় নিকটে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন, বিশালবপু বিদূষক দ্বারের নিকট শুইয়া ঘুমাইতেছে। ইরাবতীর সহচরী বলিলেন, "দেখ, দেখ, গৌতম কি রকম ক'রে শুয়ে রয়েছে, ঠিক যেন দোকানের সাম্‌নে ষাঁড় শুয়ে আছে।" বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ইরাবতী বলিলেন, "শরীরটা বোধ হয় ভাল নেই, মনে হ'চ্ছে যেন সাপের বিষ এখনও রয়েছে ওর শরীরে।"

সহচরী বলিলেন, "না না, মুখত বেশ পরিষ্কার দেখাচ্ছে, ধ্রুবসিদ্ধির চিকিৎসা, বিষ কি আর থাকৃতে পারে? ও ভাল হ'য়ে গেছে।"

বিদূষক ঘুমায় নাই, ঘুমাইবার ভাণ করিয়াছিল মাত্র। এখন সহসা এ অসময়ে ইরাবতীকে এখানে আসিতে দেখিয়া বিদূষক উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল, সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে এইরূপ ভাবে রাজাকে সাবধান করিবার জন্য চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মালবিকা, মালবিকা।"

"আ মোলো, চেঁচায় দেখ।" বলিয়া ইরাবতীর সহচরী আবার বলিলেন, "কাজের মধ্যে ত কেবল মিঠাই মণ্ডা খাওয়া, কাল খুব খেয়েছে, আজ তাই আরামে ঘুমিয়ে মালবিকার স্বপ্ন দেখছে।"

ইরাবতী আরও অনেকটা কাছে আসিয়া পড়িলেন দেখিয়া বিদূষক প্রমাদ গণিল, যা হোক করিয়া রাজাকে বাঁচাইতে হইবে তাই সে আবার একবার যেন তন্দ্রাঘোরেই চীৎকার করিয়া বলিল, "মালবিকা সাবধান, ইরাবতী!"

"তবে রে, বিট্‌লে বামুন, দাঁড়াও, সাপের, ভয় দেখিয়ে মজাটি টের পাওয়াই।" বলিয়া ইরাবতীর সহচরী পায়ের নিকট একটা কাষ্ঠখণ্ড পরিয়াছিল সেইটী হাতে তুলিয়া লইলেন।

"সাপে কামড়েছিল বেশ হয়েছিল।" বলিয়া ইরাবতী সহচরীকে

উৎসাহিত করিলেন। সহচরী তখন দূর হইতে কাষ্ঠখণ্ডটী খুব সাবধানে একেবারে বিদূষকের দেহের উপর ফেলিয়া দিলেন। বিদূষকও ত তাহাই চাহিতেছিল, সে একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "সাপ, সাপ, কেউ এস না এদিকে, সাবধান।"

বিদূষকের মুখে সাপের নাম শুনিয়া অগ্নিমিত্র ব্যস্ত হইয়া গৃহের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "ভয় কি, ভয় কি ?"

মালবিকাও অগ্নিমিত্রকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া, "যাবেন না, যাবেন না, সাপ আছে বল্ছে যে" বলিয়া অগ্নিমিত্রের অনুসরণ করিয়া আসিতে আসিতে আসিয়া পড়িলেন একেবারে রাণী ইরাবতীর সম্মুখে। সে সময় যদি সহসা বজ্রপাত হইত তাহা হইলেও কেহ এত বিস্মিত হইত না। সকলেই একবার সকলকার মুখের দিকে চাহিয়া নীরব।

মালবিকার হৃৎপিণ্ড যেন বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। এবার যে কপালে কি লেখা আছে, তিনি তাহাই অনুমান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সাপের নাম শুনিয়া বকুলাবলিকাও সেই সময় সেখানে আসিয়া পড়িল। ব্যাপার দেখিয়া তাহারও চক্ষুস্থির। সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হইয়া পড়িল, কাহারও মুখে কথা নাই। প্রথমে কথা কহিলেন ইরাবতী, তিনি একবার মালবিকার ভয়-বিশুষ্ক আনত মুখের দিকে চাহিয়া অগ্নিমিত্রকে বলিলেন, "কেমন, এই সাঙ্কেতিক স্থানে এসে দু'জনার মনোবাঞ্ছা বেশ নির্ব্বিঘ্নে পূরণ হ'য়েছে ত ?"

"মিছে এ অপবাদ প্রিয়ে, আমার আর—"

"থাক্, থাক্ তোমায় আর কথা কইতে হবে না।" বলিয়া অগ্নিমিত্রের সকল কথা না শুনিয়াই ইরাবতী বকুলাবলিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি গো বকুলাবলিকা, তোমার দূতীগিরি বেশ সফল হয়েছে ত ? পুরস্কার কি পেলে ?"

ভয়ে বকুলাবলিকার মুখ শুখাইয়া উঠিল। অগ্নিমিত্র বলিলেন, "কি যে বল, তার ঠিক নেই। আজ এ উৎসবের দিনে কাকেও বন্দী ক'রে রাখা কি ভাল ? তাই আমি ওদের মুক্তি দিয়েছি, ওরা আমায় প্রণাম ক'রতে এসেছে।"

"বটে ? মুক্তি দিয়েছ, প্রণাম করতে এসেছে, দাঁড়াও।" বলিয়া ইরাবতী তাঁহার সহচরীকে বলিলেন, "যাও ত একবার মহারাণীর কাছে, জিগ্যেস্ ক'রে এসত, ওদের হঠাৎ মুক্তি দেওয়া হ'ল কেন,আর আমাকেই বা জানান হয়নি কেন ?"

অগ্নিমিত্র পড়িলেন বিষম সঙ্কটে, কি যে করিবেন, কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বিদূষকও হতভম্ব। মালবিকা ও ইরাবতীকে দেখিয়া তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল, যেন পোষা একটা পায়রা পড়িয়াছে একেবারে বিড়ালের সম্মুখে।

ঠিক সেই সময় প্রাসাদ হইতে মহারাণীর এক পরিচারিকা জয়সেনা ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে আসিয়া অগ্নিমিত্রকে বলিল, "মহারাজ, ঘোর বিপদ।"

"বিপদ ! কি হ'য়েছে ?" বলিয়া অগ্নিমিত্র উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। সেখানে যে যে ছিল সকলেই উৎকণ্ঠিত হইল।

জয়সেনা বলিতে লাগিল, "পশুশালার কাছে কুমারী বসুলক্ষ্মী একটি বল লইয়া খেলা করিতেছিলেন। বলটা একবার বানরদের খাঁচার নিকট চলিয়া যায়, রাজকুমারী যাই সেটা আনিতে গিয়াছেন, পিঙ্গল নামক একটা বানর তাঁহাকে এমন ভয় দেখাইয়াছে, যে, তিনি এখনও কাঁপিতেছেন। মহারাণী ক্রোড়ে করিয়াও তাঁহাকে শান্ত করিতে পারিতেছেন না।"

অগ্নিমিত্র তখন কোনও গতিকে একবার পলাইতে পারিলেই বাঁচেন, তাই জয়সেনার কথা শুনিয়াই বলিলেন, "আহাঃ ছেলেমানুষ, চল, চল, দেখা যাক্ কি হ'ল মেয়েটার।"

বিদূষকও অমনি অগ্নিমিত্রের হস্ত ধরিয়া "আসুন, আসুন, ঘোর বিপদ" বলিয়া প্রায় টানিয়াই লইয়া চলিল। মনে মনে পিঙ্গলবানরকে সে একবার সাধুবাদ দিতেও ভুলিল না।

ইরাবতীও বসুলক্ষ্মীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তিনিও অগ্নিমিত্রকে বলিলেন, "তুমি নিজে একবার সান্ত্বনা দিয়ে দেখ না।"

"তাই দেখি।" বলিয়া অগ্নিমিত্র চলিয়া গেলেন, সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহারাণী ধারিণী সেদিন পুত্রের মঙ্গল কামনা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে আটশত সুবর্ণ মুদ্রা পাঠাইয়া মঙ্গলগৃহে পূজার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার ভ্রাতা বীরসেনের নিকট হইতে এক পত্র আসিল। পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, যে, তাঁহারা বিদর্ভরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মাধবসেনকে মুক্ত করিয়াছেন, এবং মহারাজ অগ্নিমিত্রের নিকট মহামূল্য রত্নাদি উপহার পাঠাইতেছেন। শীঘ্রই একটি দূত সে সমস্ত উপহার লইয়া বিদিশায় পৌঁছিবে।

সেইদিনই আবার তাঁহার উদ্যান-পালিকা আসিয়া সংবাদ দিল যে, অশোক বৃক্ষে প্রথম পুষ্পোদ্‌গম হইয়াছে। মহারাণী এসব সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, তবে তাঁহার এক দুঃখ রহিয়া গেল যে, যেদিন তিনি মালবিকাকে অশোক তরুর 'দোহদ'-সঞ্চারের ভার দিয়াছিলেন সেদিন স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, যদি পাঁচ দিনের মধ্যে অশোক গাছে ফুল ফোটে তবে তোমার মনোরথ পূরণ করিব। অশোক তরু আজ পুষ্পের শোভায় সমৃদ্ধ। তিনি কোথায় মালবিকার মনোরথ পূরণ করিবেন, না, নিজেই পাঠাইয়াছেন তাকে কারাগারে। মালবিকাকে তিনি যথার্থই ভালবাসিয়াছিলেন, তাই যখন বিদূষকের চক্রান্তে তাঁহার মুক্তির সংবাদ পাইলেন, তিনি মনে মনে সন্তুষ্টই হইলেন।

তারপর তিনি অগ্নিমিত্রকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, সেদিন প্রমোদকাননে তাঁহার সহিত গিয়া আশোক তরুর পুষ্পোদ্‌গন দেখিতে হইবে। মহারাণীর অনুরোধ রাজা কখনও অমান্য করেন নাই, আজও করিলেন না, তিনি বিচার কার্য্য শেষ করিয়াই প্রমোদকাননের দিকে চলিলেন।

মহারাণী এদিকে মালবিকাকে আপনার নিকট ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভয়ব্যাকুল চিত্তে মালবিকা মহারাণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই, তিনি পণ্ডিতা কৌশিকীকে বলিলেন, "মেয়েদেরকে সাজাইতে পারেন বলিয়া আপনি গর্ব্ব করিয়া থাকেন, মালবিকাকে খুব ভাল করিয়া বিবাহ-সজ্জায় সাজাইয়া দিন দেখি, দেখা যাক্ আপনার বাহাদুরী।"

মহারাণীর কথামত কৌশিকী যত্নের সহিত মালবিকাকে সুন্দর ভাবে সাজাইয়া দিলেন। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মহারাণী চলিলেন প্রমোদ-উদ্যানে। অগ্নিমিত্র পূর্ব্বেই সেখানে বিদূষককে লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, আজ যে মালবিকাকে বিবাহ বেশে সাজান হইতেছে, সে কথাও তাঁহার কানে উঠিয়াছিল, তবে এর যে কি যথার্থ কারণ, তাহা তিনি ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, দুইজনের তখন কল্পনা জল্পনা চলিতেছিল।

এই সময় আসিলেন মহারাণী, সঙ্গে কৌশিকী আর বধূর বেশে মালবিকা। মহারাণী অগ্নিমিত্রকে দেখিয়াই হাসিয়া বলিলেন, "এই অশোক তরু আর এই তরুণী, এইখানেই তোমায় আজ আস্‌তে বলা হ'য়েছে।"

"আজ অশোক তরুর ভাগ্য ভাল যে স্বয়ং মহারাণী তার মান বাড়িয়াছেন।" বলিয়া অগ্নিমিত্র ঈষৎ হাসিলেন।

বিদূষক মৃদুস্বরে বলিল, "শুধু তরু? তরুণীটির কথা বললে না?" অগ্নিমিত্র তখনও ভাল করিয়া মালবিকার দিকে চাহিতে পারিতেছিলেন না, বিদূষকের কথায় একবার বেশ করিয়া দেখিয়া লইলেন। যার জন্য হৃদয় এত উৎকণ্ঠিত, সে জন আজ সম্মুখে, তবু তাহাকে আপনার বলিবার উপায় নাই, তাই অগ্নিমিত্রের মনে দুঃখ হইতেছিল।

সেই সময় কঞ্চুকী আসিয়া সংবাদ দিলেন, যে, বিদর্ভরাজ যে সমস্ত উপহার পাঠাইয়াছেন, তাহার মধ্যে যে দুইজন শিল্পকুমারী ছিল, তাহাদিগকে তিনি সঙ্গে করিয়া মহারাজের নিকট আনিয়াছেন। অগ্নিমিত্র বলিলেন, "নিয়ে এস তাদের।"

তাহারা সম্মুখে আসিল। অগ্নিমিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোন্ কোন্ শিল্পকলায় পারদর্শিনী?" "সঙ্গীতে" বলিয়া মালবিকার দিকে তাহাদের দৃষ্টি পড়িল। দুইজনেই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "রাজকন্যে! তুমি এখানে?"

"রাজকন্যা কে?" বলিয়া মহারাণী উৎসুক হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তাহারা বলিল, "এইযে আমাদের রাজকন্যা মালবিকা। ইনিই

হ'চ্ছেন মাধবসেনের ভগিনী। মহারাজের সহিত বিবাহ দেবার জন্য আমাদের রাজা বিদিশায় আসছিলেন, পথে বিদর্ভরাজ তাঁকে বন্দী করেন।"

"হাঁ, হাঁ, আমি অনেক কথাই যেন শুনেছি, তবে সমস্তটা জানি না বটে। তার পর কি হ'ল বল ত।" বলিয়া অগ্নিমিত্র তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তাহারা প্রথমটা যতিবেশধারিণী কৌশিকীকে চিনিতে পারে নাই। তারপর যখন তাঁহার কণ্ঠস্বরে তাঁহাকে চিনিতে পারিল, তখন আর কাহারও অশ্রু বাধা মানিল না। কৌশিকী, মালবিকা ও দুইজন শিল্পদারিকা পরস্পর পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

মহারাণী ধারিণীর আর অনুশোচনার সীমা ছিল না, তিনি বলিলেন, "মালবিকা রাজকন্যা? আমি যে দেখ্‌ছি চন্দন কাঠ পাদুকা ক'রে ব্যবহার করেছি এতদিন।" মালবিকা আপনাকে সামলাইয়া লইয়া একটী দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সবই বিধির বিধান।"

তখন কৌশিকী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাই বলিয়া গেলেন। কি করিয়া মাধবসেন বন্দী হয়েন, তারপর কি করিয়া দস্যুর হাতে সুমতি প্রাণ হারাইয়াছিলেন তাহাও বলিলেন।

সমস্ত শুনিয়া অগ্নিমিত্র বলিলেন, "আমরা ক'রেছি কি! চেলীর কাপড়কে গামছা বলে ব্যবহার করেছি!"

মহারাণী তখন কৌশিকীকে বলিলেন, "মালবিকা রাজকন্যা একথা আপনি আমায় আগে বলেন নি কেন? বেচারীকে কত কষ্টই না ভোগ করতে হয়েছে।"

তখন কৌশিকী বলিলেন, "মহারাণী, কেন বলিনি শুনুন। মালবিকা তখন খুব ছোট, সেই সময় কি একটা মেলা ছিল, একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন আমাদের বাড়ী। তিনি ওকে লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন যে, 'এ মেয়ের ভাগ্য খুব ভাল, তবে একটা বৎসর এর কপালে দুঃখ আছে। একবৎসর কোথাও একে দাসীর মত থাকতে হবে। তারপর একজন

প্রতাপশালী রাজার সঙ্গে ওর বিয়ে হবে।' আমি জান্‌তাম, তাই পরিচয় দিই নাই।"

অগ্নিমিত্র বলিলেন, "আমার জন্যই এদের এত কষ্ট, আমি ওদের সকল দুঃখই ঘুচাব আজ।" বলিয়া কঞ্চুকীকে বলিলেন, "মৌদ্‌গল্য, এখনই মন্ত্রীদিগকে জানাও যে, মাধবসেন ও তাঁহার ভ্রাতা যজ্ঞসেন দুইজনকে যেন বরদা নদীর উত্তর ও দক্ষিণ কূলে দুইটী রাজত্ব দেবার ব্যবস্থা করা হয়।"

কঞ্চুকী যাইতে না যাইতেই একজন প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল, যে মহারাজের পিতা পুষ্পমিত্র যজ্ঞস্থান হইতে একখানি পত্র পাঠাইয়াছেন। পিতার পত্র শুনিয়া অগ্নিমিত্র তখনই যে লোকটী পত্র আনিয়াছে তাহাকে আনিতে বলিলেন।

একখানি পত্র লইয়া একটি লোক আসিল। অগ্নিমিত্র তাহার হস্ত হইতে সেটি গ্রহণ করিয়া একজন পরিজনকে পড়িতে বলিলেন। তাহাতে লেখা ছিল—

"স্বস্তি, যজ্ঞশালা হইতে সেনাপতি পুষ্পমিত্র পুত্র শ্রীমান্ অগ্নিমিত্রকে স্নেহালিঙ্গন জানাইতেছে। তোমার পুত্র বসুমিত্রকে একশত রাজপুত্র সঙ্গে দিয়া যজ্ঞাশ্বের রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলাম। নানাদেশ ঘুরিয়া অশ্ব যখন সিন্ধুনদের দক্ষিণ কূলে বিচরণ করিতেছিল, অশ্বারোহীসেনা সমাবৃত যবনেরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। উভয়পক্ষে তখন ভীষণ যুদ্ধ বাধে, সেই যুদ্ধে বসুমিত্র যেরূপ বীরত্ব দেখাইয়া যবন সেনাকে পরাজিত করিয়াছিল তাহার তুলনা নাই। সূর্য্যবংশের গৌরব সগররাজা যেমন তাঁহার পৌত্র অংশুমানের সাহায্যে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন, আমিও আশা করি পৌত্র বসুমিত্রের সাহায্যে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিতে পারিব। তুমি অচিরে বধূমাতাদিগকে লইয়া যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়া যজ্ঞক্রিয়া যাহাতে সুসম্পন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা করিবে।"

পিতার পত্র ও পুত্রের বীরত্ব কাহিনী শুনিয়া অগ্নিমিত্র অত্যন্ত সুখী হইলেন। মহারাণী ধারিণীরও নয়নে আনন্দাশ্রু বাহির হইতে লাগিল।

একদিনেই এতগুলি শুভসংবাদ, এ যেন বড় একটা দেখা যায় না, সকলেরই মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন মহারাণী ধারিণী মালবিকার

একখানি হাত ধরিয়া বলিলেন, "আজকের এ আনন্দের দিনে কাহারও মনোরথ অপূর্ণ রাখিব না।" এই বলিয়া অগ্নিমিত্রকে বলিলেন, "আজকের দিনে আমার দেওয়া এই উপহারটি নিতে হবে।" অগ্নিমিত্র মনে মনে মহাখুসী, তবু মুখে লজ্জার ভাণ দেখাইয়া সরিয়া গেলেন, তাঁহার হাবভাব দেখিয়া বিদূষক বলিয়া উঠিল, "আহাঃ, নূতন বর কিনা, তাই লজ্জা হ'চ্ছে। কিন্তু অবগুণ্ঠন কই?"

মহারাণী দেখিলেন, তাইত অবগুণ্ঠন আনা হয় নাই, ক'নের সাজই হয় নাই। তিনি তখন জয়সেনাকে চেলীর অবগুণ্ঠন আনিতে বলিলেন, আর অমনি রাণী ইরাবতীকে একবার এ সংবাদ দিতে বলিলেন। জয়সেনা অবগুণ্ঠন লইয়া আসিল, এবং বলিল, যে রাণী ইরাবতী শুনিয়া বলিয়াছেন যে, আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করিবেন, তাহাই করিবেন, আপনি যাহা করিবেন, তাঁহার তাহাতেই মত আছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, স্বামীর নিকট তিনিই অপরাধিনী হইয়া আছেন, স্বামী যাহাতে সন্তুষ্ট হয়েন তিনিও তাহাই চাহেন। ইরাবতীর অমত নাই, মালবিকা যেন আশ্বস্তা হইলেন। মহারাণী মালবিকাকে অবগুণ্ঠন পরাইয়া অগ্নিমিত্রের কাছে আসিয়া বলিলেন, "এবার এটিকে গ্রহণ কর।"

"না নিয়ে আর উপায় কি? তোমার দেওয়া জিনিষ কোনটাই বা নিই নাই।" বলিয়া অগ্নিমিত্র মালবিকার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইলেন।

বিদূষক বলিয়া উঠিল, "তাত বটেই, নেহাৎ মহারাণী দিচ্ছেন, তাই, নইলে আর কি!"

বিদূষকের কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিল, মালবিকাও মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজা দুষ্যন্ত সেদিন মৃগয়া করিতে বাহির হইয়াছিলেন। চারিদিকে নিবিড় বন, তিনি এক হরিণের পিছু পিছু রথ ছুটাইয়া চলিয়াছেন, অনুচরেরা কে কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে দেখা যাইতেছে না। হরিণের আরও খানিক নিকটে গিয়া দুষ্যন্ত তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিবেন, এমন সময় দুইজন ঋষি সেখান দিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহারা হাত উঠাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এ আশ্রম-মৃগ, বধ করিবেন না, বধ করিবেন না।"

তখনকার দিনে সমাজে ব্রাহ্মণের মানমর্য্যাদার সীমা ছিল না, তাই দুষ্যন্ত ব্রাহ্মণের নিষেধ শুনিয়াই বাণ সংহত করিয়া লইলেন। ঋষিরা বলিলেন, "মহারাজ, দুষ্টের দমন করাই আপনাদের কাজ, নিরীহ হরিণ-শিশুকে মারিয়া কি লাভ?"

দুষ্যন্ত রথ থামাইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন, তাঁহারাও আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "নিকটেই মহামুনি কণ্বের আশ্রম, আপনি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছেন দেখিতেছি, আশ্রমে গিয়া খানিকক্ষণ বিশ্রাম করুন।"

তপোবনে আসা রাজাদের প্রায় ঘটিয়া উঠে না, তাহার উপর আবার মহামুনি কণ্বের দর্শন লাভ—এমন সুযোগ ছাড়া যায় না, তাই দুষ্যন্ত বলিলেন, "মহামুনি এখন আশ্রমে আছেন ত?"

"তিনি গিয়াছেন সোমতীর্থে" বলিয়া ঋষিরা আবার বলিলেন, "তাহ'লেও তাঁহার কন্যা শকুন্তলা আশ্রমে আছেন, মহর্ষি না থাকিলে তিনিই অতিথি সৎকার করেন।"

"তাই হউক, তাঁহার কন্যার সহিতই সাক্ষাৎ করিয়া যাই, তিনি মহর্ষিকে আমার প্রণাম জানাইবেন।" বলিয়া দুষ্যন্ত সেইখানে রথ

রাখিতে বলিয়া তীর, ধনুক, আভরণাদি সমস্ত সারথীর হস্তে দিয়া সামান্যবেশে একাকী তপোবনে প্রবেশ করিলেন। তপোবনের চারিদিকের সে স্নিগ্ধ শান্তিময় পবিত্র ভাব দুষ্যন্তের অত্যন্ত ভাল লাগিতেছিল, তিনি তপোবনের শোভা দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মনে হইল যেন দক্ষিণ বাহুটি শিহরিয়া উঠিতেছে। তিনি ভাবিলেন, 'এ আবার কি? মুনির তপোবনে স্ত্রীলাভের সম্ভাবনা।'

দক্ষিণ দিক হইতে যেন কাহাদের অস্পষ্ট স্বরে কথাবার্ত্তা তাঁহার কানে আসিল। কে ওখানে কথা কয় দেখিবার জন্য এদিক সেদিক চাহিতেই তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষু নিস্পলক হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, অত্যন্ত রূপসী তিনটী মুনিকন্যা তিনটী ছোট ছোট কলসী লইয়া বৃক্ষে জল দিবার জন্য সেইদিকে আসিতেছেন। তাঁহাদের সে সরলতাপূর্ণ মধুর রূপ দেখিয়া দুষ্যন্ত ভাবিলেন, 'কি সুন্দর! আমার প্রাসাদেও এমন রূপ ত কখন দেখি নাই। বনলতাও দেখিতেছি উদ্যান-লতাকে সৌন্দর্য্যে পরাজিত করিতে পারে।"

সুন্দরীদের নিজেদের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হয় শুনিবার জন্য দুষ্যন্ত কৌতূহলী হইয়া একটু আড়ালে রহিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন অপরাকে বলিতেছিলেন, "দেখ্ শকুন্তলা, পিতা তোকে যত না ভালবাসেন তার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসেন এই আশ্রমের গাছগুলিকে, নইলে ফুলের মত কোমল তোর দেহ, আর তোকে কি না দেন এই গাছের গোড়ায় জল দিতে?"

অপরা উত্তরে বলিলেন, "না ভাই, ঠিক তা' নয়, কেবল পিতা বলেছেন বলেই যে আমি জল দি তা নয়, এদের আমি ভাইভগ্নীর মত ভালবাসি, তাই আমার এত যত্ন করতে ইচ্ছা হয়।"

দুষ্যন্ত বুঝিলেন ঋষিরা যাঁহার কথা বলিয়াছিলেন, ইনিই সেই কণ্ব মুনির কন্যা শকুন্তলা। তিনি একবার ভাবিলেন আশ্রমে গিয়া বিশ্রাম করি। আবার মনে হইল, 'না, আরও কিছুক্ষণ এঁদের কথাবার্ত্তা শোনা যাক্।'

তিনি শুনিতে লাগিলেন, শকুন্তলা বলিতেছেন, "দেখ অনসূয়া,

প্রিয়ম্বদা এমন শক্ত ক'রে আমায় বল্কল পরিয়ে দিয়েছে, যে, আমার বড় কষ্ট হ'চ্ছে, একটু আল্গা ক'রে দে ভাই।"

বল্কল ঠিক করিয়া দিতে দিতে প্রিয়ম্বদা হাসিয়া বলিলেন, "দোষটা আমারই ? তুই বুঝি আর বড় হচ্ছিস না ? নিজের বুকের দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি।"

দুষ্যন্তের তখন আর অন্যদিকে নজর নাই, তিনি কেবল একমনে শকুন্তলাকেই দেখিতেছিলেন আর ভাবিতেছিলেন, "আ মরি মরি, কি সুন্দর মানিয়েছে, সামান্য একটা বৃক্ষের বল্কল তা'তেই যেন শকুন্তলার রূপ ফুটে উঠেছে। স্বয়ং প্রকৃতি যাকে রূপ দিয়েছেন, তা'কে যা কিছু পরান যায় তাই তার আভরণ হ'য়ে পড়ে।"

তাঁহারা তিন সখীতে আরও অনেক কথা কহিতে লাগিলেন। দুষ্যন্ত আবার শুনিলেন প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে বলিতেছেন, "অনসূয়া, এই বনতোষিনী লতাকে শকুন্তলা কেন এমন একমনে দেখে জানিস্ ?"

অনসূয়া বলিলেন, "কেন বল্ দেখি।"

প্রিয়ম্বদা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ও মনে করে এই লতাটি যেমন সহকার তরুকে আশ্রয় ক'রে রয়েছে, আমিও তেমনি একটী বেশ মনের মত বর পাই।"

প্রিয়ম্বদার কথায় শকুন্তলা লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, "তোর নিজের মনের কথা তাই বল্ না।" এই বলিয়া শকুন্তলা আবার বৃক্ষে জল দিতে লাগিলেন। তখন অনসূয়া একটী লতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শকুন্তলা, এই মাধবী লতাটীকে ভুলে গেছিস ?"

"ওকে কি ভুল্তে পারি ? তাহ'লে নিজেকেও যে ভুলে যেতে হয় ভাই" বলিয়া শকুন্তলা মাধবী লতার কাছে গিয়া বলিলেন, "দেখ্ ভাই লতাটায় কেমন ফুল ফুটেছে।"

প্রিয়ম্বদা বলিয়া উঠিলেন, "পিতা কণ্ব সেদিন বলছিলেন, যে এই মাধবী লতার ফুলফোটা এ শকুন্তলারই শুভ সূচনা," তারপর ঈষৎ হাসিয়া শকুন্তলার দিকে একবার আড় নয়নে চাহিয়া বলিলেন, "শুভসূচনাটা এই যে শ্রীমতী শকুন্তলার শুভ বিবাহের দিন সন্নিকট হ'য়ে এল।" প্রিয়ম্বদার

কথায় অনসূয়া হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাই বুঝি শকুন্তলা এত যত্ন ক'রে ওর গোড়ায় জল দেয় ?"

শকুন্তলা বলিলেন, "ধেৎ, ওযে আমার ভগ্নী হয়, তাইত আমি ওকে এত ভালবাসি। জল দেব না ?"

তিনি মাধবীলতায় আবার জল দিতে লাগিলেন। সেই সময় কোথা হইতে একটা মধুকর শকুন্তলার মুখে আসিয়া পড়িল, শকুন্তলা বিরক্ত হইয়া যতই তাড়াইয়া দেন, মৌমাছিটা ততই তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়ে। শকুন্তলা বিপদে পড়িলেন, তিনি কোন মতে সেটাকে তাড়াইতে না পারিয়া সখীদেরকে বলিলেন, "আমায় রক্ষা কর ভাই, রক্ষা কর. আমি গেলাম।"

সামান্য একটা মৌমাছির নিকটও তাহার এত অসহায় অবস্থা দেখিয়া অনসূয়া প্রিয়ম্বদা দুজনাই হাসিয়া উঠিলেন, তাঁহারা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমরা রক্ষা করবার কে ? সকলের রক্ষা কর্ত্তা রাজা দুষ্যন্তকে ডাক না, তোকে রক্ষা করবেন এসে।"

শকুন্তলার সে ভয়চকিত ভাব, মুক্ত সৌন্দর্য্যের সে মধুর রূপ দুষ্যন্ত মুগ্ধ নয়নে দেখিতেছিলেন, সখীদের কথা শুনিয়া ভাবিলেন মুনিকন্যাদিগকে দেখা দিবার এমন সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না, তাই শকুন্তলা আবার যাই অস্ফুট স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তিনি অমনি তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলেন, "কে রে দুর্ব্বৃত্ত! ঋষিবালাদের উপর অত্যাচার করবার সাহস করে!"

সহসা একজন বহুমূল্য পরিচ্ছদধারী সুপুরুষ তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন দেখিয়া সকলে অত্যন্ত সঙ্কুচিতা হইয়া গেলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনসূয়া বলিলেন, "না মহাশয়, এমন কিছুই বিপদ হয় নাই, একটা মধুকর আমাদের এই সখীটিকে বিরক্ত করছিল বলে উনি কাতর হয়ে পড়েছিলেন।"

দুষ্যন্তকে দেখিয়া শকুন্তলা লজ্জায় কেমন যেন জড়সড় হইয়া পড়িলেন, তাই দুষ্যন্ত যখন তাঁহাকে তপস্বী কণ্বের কন্যা বলিয়া তপস্যার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তাহার কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না,

অধোবদন হইয়া বসিয়া রহিলেন। একথার উত্তর দিলেন অনসূয়া, তিনি বলিলেন, আপনার মত মহানুভব অতিথি লাভ করা তপস্যার-ই ত ফল।"

তারপর তিনি শকুন্তলাকে অতিথির জন্য পাদ্য-অর্ঘ্য আনিতে বলিলেন; তাহা শুনিয়া দুষ্যন্ত বলিলেন, "না, না, পাদ্য-অর্ঘ্যে কোনও প্রয়োজন নাই, আপনাদের সুমিষ্ট বাক্যেই আমার অতিথিসৎকার হয়েছে।"

"আচ্ছা, বসুন তাহ'লে।" এই বলিয়া অনসূয়া তাঁহাকে সপ্তপর্ণী বেদী দেখাইয়া বলিলেন, "বসে বিশ্রাম করুন।" দুষ্যন্ত নিজে বসিলেন, আর তাঁহারাও জল দিতে দিতে বেশ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া তাঁহাদিগকেও সেইখানে বসিতে বলিলেন। তখন সকলে মিলিয়া বৃক্ষের তলায় বাঁধান বেদীর উপর বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। শকুন্তলার কিন্তু এ গল্পে যোগ দিবার মত মনের অবস্থা ছিল না। দুষ্যন্তকে দেখিয়া অবধি কেন যে তাঁহার মনে একটা ভাবান্তর আসিতেছিল, তিনি নিজেও তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তিনি নীরবে বসিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। দুষ্যন্তের প্রত্যেক কথাটি যেন তাঁহার শরীরে এক পুলকের সৃষ্টি করিতেছিল। দুষ্যন্ত সখী তিনটীকে আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিলেন, "আপনাদের সমান বয়স, সমান রূপ। আপনাদের এ সখীত্ব বড়ই মধুর।"

প্রিয়ম্বদা আড়ালে অনসূয়াকে বলিলেন, "ইনি কে বল ত অনসূয়া, এঁর আকৃতি যেমন সুন্দর, কথাগুলিও তেমনি মিষ্টি। নিশ্চয়ই ইনি কোন হেঁজিপেঁজি লোক নন।"

অনসূয়া বলিলেন, "আমারও এবিষয়ে কৌতূহল হচ্ছে দাঁড়া, জিগ্যেস ক'রে দেখি।"

তিনি দুষ্যন্তকে বলিলেন, "মহাশয় আপনার মিষ্ট কথায় ভরসা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, কোন রাজর্ষি-বংশের গৌরব আপনি বাড়াইয়াছেন? কোন দেশই বা এখন আপনার বিরহে কাতর হইয়া পড়িয়াছে? আর কিজন্যই বা এমন সুকুমার দেহে তপোবনের ক্লেশ সহ্য করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন?"

দুষ্যন্ত একটু ভাবনায় পড়িলেন। নিজের প্রকৃত পরিচয় দিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। আত্মগোপন করিবার জন্য বলিলেন, "খুব এক উচ্চকুলে জন্মিয়াছি; রাজা দুষ্যন্তের রাজধানীতে থাকি; নাগরিকদের বিচার করা আমার কাজ। তপোবন দর্শনে পুণ্য হয় তাই এদিকে একবার এই ধর্ম্মারণ্যেই আসিয়াছি।"

অনসূয়া বলিলেন, "আজ মহাশয়কে পাইয়া তপস্বীরা বাস্তবিকই ধন্য হইলেন।"

কথাগুলি শুনিয়া শকুন্তলার মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল, তাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না।

দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে দেখাইয়া অনসূয়াকে বলিলেন, "আমি আপনাদের সখীটার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা দুইজনই এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "সে ত আপনার অনুগ্রহ, এতে আর কিন্তু হ'চ্ছেন কেন?"

দুষ্যন্ত বলিলেন, "আচ্ছা, মহর্ষি কণ্ব ত আজীবন ব্রহ্মচারী, বিবাহ করেন নাই, অথচ আপনাদের সখীটী তাঁহারই কন্যা? এ কি রকম?"

অনসূয়া বলিলেন, "আপনি নিশ্চয়ই রাজর্ষি কৌশিকের নাম শুনেছেন। তিনিই শকুন্তলার পিতা। তবে মহামুনি কণ্ব একে আশৈশব লালনপালন করেছেন বলে শকুন্তলা তাঁকে পিতা বলে।"

ক্ষত্রিয় রাজার কন্যা অথচ তপোবনে মহর্ষি কণ্ব তাঁহাকে লালনপালন করিতেছেন কেন জানিবার জন্য দুষ্যন্তের অত্যন্ত কৌতূহল হইল। তখন অনসূয়া বলিলেন, "সেই রাজর্ষি এক সময়ে এমন উগ্র তপস্যা আরম্ভ করেছিলেন, যে তাঁর তপস্যা দেখে দেবতারা পর্য্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন।" সে কথা দুষ্যন্ত পূর্ব্বেও শুনিয়াছিলেন, তাই বলিলেন, "সে আমার জানা আছে, তারপর?"

অনসূয়া বলিতে লাগিলেন, "তাঁহারা ভীত হয়ে রাজর্ষির তপস্যার বিঘ্ন জন্মাবার জন্য অপ্সরা মেনকাকে পাঠিয়ে দেন, তারপর একদিন বসন্তকালে মেনকার সে পাগল-করা রূপ দেখে—"

অনসূয়া এর পর আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, তাঁহার কেমন লজ্জা করিতে লাগিল।

দুষ্যন্ত বলিলেন, "বুঝতে পেরেছি, অপ্সরার কন্যা না হ'লে আর এত রূপসী হয় ? বিদ্যুতের সে চঞ্চল জ্যোতিঃ কেবল আকাশেই দেখা দেয়। পৃথিবী কি আর বিদ্যুৎ প্রসব করতে পারে ?"

শকুন্তলা লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিলেন, দুষ্যন্তের কথাগুলি তাঁহার কর্ণে যেন সুধা বর্ষণ করিতেছিল। তাঁহার সে ভাব প্রিয়ম্বদার বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি শকুন্তলার দিকে চাহিয়া একটু দুষ্টামির হাসি হাসিয়া দুষ্যন্তকে বলিলেন, "সখীর সম্বন্ধে মহাশয় যেন আরও কিছু জিজ্ঞাসা করবেন বলে মনে হচ্ছে।"

শকুন্তলার লজ্জার মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল, তিনি প্রিয়ম্বদাকে ছোট্ট একটা কিল দেখাইলেন।

দুষ্যন্ত তখন মনে মনে কি ভাবিতেছিলেন, প্রিয়ম্বদার কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, হাঁ, বলবার আছে বৈ কি, অনেক কথাই জানবার আছে, আপনি ঠিক ধরেছেন ত।"

প্রিয়ম্বদা আবার একবার শকুন্তলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যা জান্‌বার আছে জিগ্যেস করুন। আমরা তাপসী আমাদের কাছে কুণ্ঠা কিসের ?"

দুষ্যন্ত বলিলেন, "আপনাদের এই সখীটীর কথাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। মহামুনি কণ্ব কি এঁকে সারাজীবন ব্রহ্মচারিণীই করে রাখতে চান, না যতদিন না বিবাহ হয়, কেবল তত দিনই ইনি এমনি আছেন ?"

প্রিয়ম্বদা বলিলেন "ধর্ম্মশাস্ত্রে যা বিধান আছে তাই হবে, পিতা কণ্বের ত খুবই ইচ্ছা একটি উপযুক্ত পাত্র পেলেই তাঁর সঙ্গে ওর বিয়ে দেন।"

শকুন্তলা ক্ষত্রিয়ের কন্যা, আর উপযুক্ত পাত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হইতে পারে শুনিয়া দুষ্যন্ত আশান্বিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, যাকে অগ্নি মনে ক'রে ভয় পেয়েছিলাম, এখন দেখছি সে অগ্নি নয়, রত্ন—তাকে স্পর্শ করাও যেতে পারে।
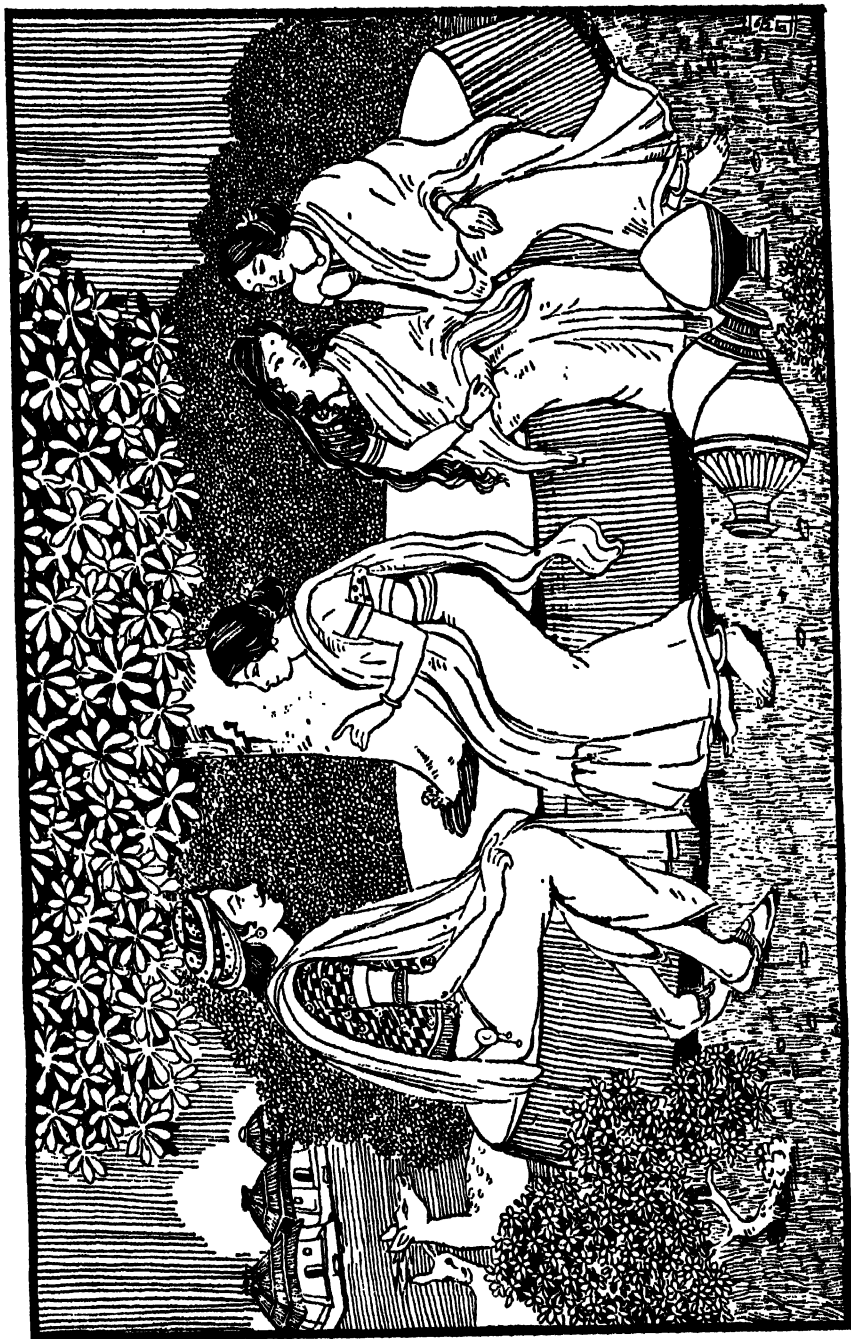
দুষ্মন্ত শকুন্তলা অনসূয়া প্রিয়ম্বদা গল্প করিতেছেন

নিজের সম্বন্ধে এত কথা হইতেছে দেখিয়া শকুন্তলার কেমন অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। তিনি অনসূয়াকে বলিলেন, "অনসূয়া, আমি আর এখানে থাকৃব না।" "কেন, কি হ'ল ?" বলিয়া অনসূয়া শকুন্তলার মুখের দিকে চাহিলেন। শকুন্তলা বলিলেন, "দেখ্ছ ত, প্রিয়ম্বদার মুখে যা আসছে ও তাই বলছে। আমি ওর সব কথা গৌতমীকে বলে দেব।" বলিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

অনসূয়ার মোটেই ইচ্ছা ছিল না যে অতিথিকে বসাইয়া রাখিয়া শকুন্তলা অন্য কোথাও চলিয়া যান, তাই বলিলেন, "অতিথি মশাই রইলেন বসে, আর তুমি যাবে চলে—সে হ'তে পারে না, তোমার যাওয়া হবে না।"

শকুন্তলা কিন্তু অনসূয়ার কথার জবাবও দিলেন না। তিনি মুখটি ভার করিয়া চলিয়া যাইতেই লাগিলেন।

শকুন্তলা চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া দুষ্যন্তের মনে হইতেছিল যে তখনই গিয়া শকুন্তলার সুকোমল হাত দুখানি ধরিয়া তাঁহাকে সেখানে আরও খানিকক্ষণ থাকিবার জন্য মিনতি করেন। কিন্তু সেটা যেন নেহাৎ বাড়াবাড়ি হইবে ভাবিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইলেন।

প্রিয়ম্বদা তখন তাড়াতাড়ি শকুন্তলার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "চলে যাওয়া হ'চ্ছে ? আমার না দু'কলসী জল পাওনা আছে তোর কাছে, শোধ না করলে যেতে দেব না।" শকুন্তলার একটি হাত ধরিয়া তিনি আপনার পাশে তাঁহাকে বসাইলেন। শকুন্তলার বিব্রত ভাব দেখিয়া দুষ্যন্ত প্রিয়ম্বদাকে বলিলেন, "দেখুন, আপনাদের সখীটিকে পরিশ্রান্ত বলেই বোধ হচ্ছে। আপনার দু'কলসী জল পাওনা ? আমিই না হয় ওঁকে ঋণমুক্ত করি।"

এই বলিয়া নিজের হাত হইতে একটা অঙ্গুরী খুলিয়া দুষ্যন্ত সেটা প্রিয়ম্বদার হাতে দিলেন। অঙ্গুরীতে খোদিত নাম পড়িয়া প্রিয়ম্বদার চক্ষু স্থির, অনসূয়াও কৌতূহলী হইয়া নাম পড়িলেন, পড়িবামাত্র দুইজনে কেবল এ ওর মুখের দিকে তাকায় ও এর মুখের দিকে তাকায়, অঙ্গুরীতে স্বয়ং মহারাজ দুষ্যন্তের নাম লেখা। দুষ্যন্ত তাঁহাদের হাব ভাব

দেখিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। তিনি অমনি বলিলেন, "কি ভাবছেন আপনারা ? এ আংটী ? আমারই অবশ্য—রাজা আমায় পুরস্কার দিয়েছেন।"

প্রিয়ম্বদা অঙ্গুরীটী দুষ্যন্তকে ফিরাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "তবে ত এ আংটী আপনার কাছ ছাড়া করা উচিত নয়। আপনি অনুগ্রহ ক'রে যে বল্লেন, এই যথেষ্ট। আপনার কথাতেই আমরা একে ঋণমুক্ত ক'রেছি।"

তারপর মৃদু হাসিয়া শকুন্তলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওগো শকুন্তলা, এই দয়ালু মহাশয়ই বল, কিম্বা রাজর্ষিই বল, ইনি তোমায় অঋণী করেছেন, এখন যেখানে ইচ্ছা যেতে পার—যা।"

• কিন্তু তখন আর দুষ্যন্তকে ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইবার শক্তি শকুন্তলার ছিল না। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "যাব না, আমার যাওয়া না যাওয়া বুঝি তোর কথার উপর নির্ভর করছে ? নিজের যখন খুসী হবে, যাব।"

সহসা তাঁহারা শুনিতে পাইলেন কে যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "যে যেখানে আছ, সবাই সাবধান, রাজা দুষ্যন্ত মৃগয়া করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার রথ দেখিয়া ভয় পাইয়া একটা বন্য হস্তী ক্ষেপিয়া গিয়াছে।"

বন্যহস্তী ক্ষেপিয়াছে শুনিয়া সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অনসূয়া প্রিয়ম্বদা দুইজনেই বলিলেন, "মহাশয় অনুমতি করুন আমরা কুটিরের মধ্যে চলে যাই। বন্যহস্তী ক্ষেপেছে।"

দুষ্যন্ত বুঝিলেন নিশ্চয় তাঁহারই অনুচরেরা তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে আসিয়া এই সব অনর্থ ঘটাইতেছে। তিনি বলিলেন, "আপনারা যাবেন যান। আমি দেখি যাতে অনিষ্ট না হয়।"

তাঁহারা আবার বলিলেন, "মহাশয় আপনি অতিথি এলেন আমাদের আশ্রমে, অথচ আমরা আপনার কিছুই করতে পারলাম না। দয়া করে কিছু মনে করবেন না, আবার যেন আপনার দেখা পাই।"

"ও কথা বলবেন না, আপনাদের দর্শনেই আমার অতিথি-সৎকার হ'য়েছে আমি যথেষ্টই অনুগৃহীত হয়েছি।" দুষ্যন্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সখীরা চলিতে লাগিলেন, অগত্যা শকুন্তলাও চলিলেন, কিন্তু দুষ্যন্তকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার যেন মন উঠিতেছিল না। তিনি যাইতে যাইতে দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন, "দাঁড়া ভাই আমার পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছে।" এই বলিয়া পিছন ফিরিয়া একবার দুষ্যন্তকে দেখিয়া লইলেন, তারপর দু তিন পা গিয়া গাছে বল্কল জড়াইয়া গিয়াছে এই অছিলা করিয়া আবার একবার পিছন দিকে চাহিয়া দুষ্যন্তকে দেখিয়া লইয়া সখীদের সঙ্গে কুটিরের ভিতর চলিয়া গেলেন।

তিনজনেই চলিয়া গেলেন; একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া দুষ্যন্তও আশ্রম হইতে বাহির হইলেন। বাহিরে আসিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া রহিল সেই শকুন্তলারই কাছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অনুচরদের সাক্ষাৎ পাইয়া দুষ্যন্ত সেই তপোবনেরই কিছুদূরে শিবির স্থাপনা করিয়া কিছুদিন থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন। শকুন্তলাকে দেখিয়া অবধি নগরে ফিরিয়া যাইবার তাঁহার আর মোটেই ইচ্ছা ছিল না। দিনকতক মৃগয়া লইয়াই রহিলেন, কিন্তু মনে তাঁহার শান্তি কোথায়। অহর্নিশি কেবল শকুন্তলার মুখখানিই তাঁহার মনে পড়ে। সে সময়কার অন্য সকল রাজাদের মত তাঁহারও একজন বিদূষক ছিল, মৃগয়ায় আসিবার সময় দুষ্যন্ত তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন। যখন কোনও কাজ থাকিত না, তাঁহার সহিত গল্প করিতেন। বিদূষক যে হাস্যপরিহাস করিতেন, তাহা অত্যন্ত ভাল লাগিত বলিয়া দুষ্যন্ত তাঁহাকে সর্ব্বদাই কাছে কাছে রাখিতেন। একে ব্রাহ্মণের সন্তান, দিনরাত বনে বনে ঘুরিয়া পশু শীকার করা তাঁহার পোষায় না, তায় আবার অবসর সময়েও দুষ্যন্তের কেবল শকুন্তলার চর্চ্চা—বিদূষক একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। দুষ্যন্তেরও আর মৃগয়া ভাল লাগিতেছিল না। তিনি বনে রহিয়াছেন, কোথায় মাঝে মাঝে গিয়া শকুন্তলার সহিত আলাপ করিয়া আসিবেন, তা নয়, কেবল বন্যজন্তু শীকার। তাই সেদিন বিদূষক মৃগয়ার বিরুদ্ধে দুকথা বলিতেই দুষ্যন্ত ঠিক করিয়া ফেলিলেন যে আর মৃগয়া করা হইবে না। সেনাপতিকেও সেইরূপ আদেশ দিলেন।

কিন্তু মৃগয়াই যদি না করা যায় তবে আর বনে থাকা যায় কি করিয়া, অবিলম্বে নগরেই ফিরিতে হয়। দুষ্যন্ত পড়িলেন সমস্যায় ; বিদূষকও তাহার কোনও সদুপায়ই বাহির করিতে পারিলেন না। একবার তিনি যুক্তি দিলেন যে তপস্বীদের নিকট হইতে কর আদায়ের নাম করিয়া আরও কিছুদিন বনে থাকা চলিতে পারে। দুষ্যন্ত বলিলেন, "তপস্বীরা কর দেন না, তাঁহাদের কেবল মঙ্গল-আশীর্ব্বাদই রাজার প্রাপ্য।" কিন্তু তবু তাঁহার না থাকিলেই নয়—শকুন্তলাকে না দেখিয়া নগরে গিয়া রাজকার্য্য

চালান তাঁহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে লাগিল। শকুন্তলার সেই যে পায়ে কাঁটাফোটার অছিলায় তাঁহার প্রতি লজ্জাজড়িত দৃষ্টি তাঁহার অন্তর আকুল করিয়া তোলে। তাঁহার মনে হয় নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই তিনি সে সরলা তাপস-কন্যার মধ্যে অনুরাগের লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন। তপোবনের নিকটে আরও কিছু দিন থাকাই বা যায় কি প্রকারে, মধ্যে মধ্যে কোন ছলেই বা তপোবনে প্রবেশ করা যাইতে পারে—এ সমস্যার আর মীমাংসা হইল না। দুজনেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। এমন সময় এক প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল যে দুইজন ঋষিকুমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

দুষ্যন্ত তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে আপনার নিকট আনিবার জন্য আদেশ দিলেন। ঋষি বালকেরা তাঁহার নিকটে আসিতেই দুষ্যন্ত আপনার আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিয়া তাঁহারা যে কেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিবালকেরা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি তপোবনের এত কাছে রহিয়াছেন জানিতে পারিয়া এই তপোবনের সমস্ত মুনিঋষিরা মহারাজের নিকট প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছেন—"

দুষ্যন্ত অমনি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি আদেশ করিয়াছেন তপস্বীরা, বলুন।"

ঋষি-বালকেরা বলিতে লাগিলেন, "তাঁহারা বলিয়াছেন যে, আমাদের কুলপতি মহামুনি কণ্ব এখন এখানে নাই, তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া রাক্ষসেরা আমাদের যাগযজ্ঞে অনবরত বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছে, আপনি যখন এখানেই রহিয়াছেন, তখন যদি আরও কিছুদিন থাকিয়া আমাদের রক্ষা করেন তবে নির্ব্বিঘ্নে আমরা তপস্যাকার্য্য করিতে পাই।"

দুষ্যন্ত যে সুযোগ এতক্ষণ চাহিতেছিলেন, সে সুযোগ যে বিধাতা এমন ভাবে তাঁহাকে মিলাইয়া দিবেন, তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই, তিনি মহা উৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "বেশ, বেশ, আমি এখানে থাকিতে খুবই রাজী। রাক্ষসেরা কেমন বাধা দেয় দেখিব।"

দুষ্যন্তের যে থাকিবার এত উৎসাহ কেন, বিদূষক তাহা খুবই বুঝিতে পারিতেছিলেন, তিনি নিম্নস্বরে বলিলেন, "বন্ধুর বরাত ভাল দেখছি।"

দুষ্যন্ত ঈষৎ হাসিয়া তপোবনের কোথায় কোথায় রাক্ষসের অত্যাচার বৃদ্ধি পাইয়াছে একবার নিজে দেখিয়া আসিবার জন্য রথ আনিতে আদেশ করিলেন।

ঋষিবালকেরা যে এত শীঘ্র রাজাকে তপোবনে আসিবার জন্য রাজী করাইতে পারিবেন তাহা ভাবেন নাই, কাজেই তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে রাজার সুখ্যাতি করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

রথ প্রস্তুত হইয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে আবার একজন প্রহরী আসিয়া জানাইল যে, রাজধানী হইতে পূজনীয়া রাজমাতা একজন লোক পাঠাইয়াছেন, সে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়।

"মা লোক পাঠিয়েছেন? তাকে এখুনি নিয়ে এস।" বলিয়া দুষ্যন্ত রথে উঠিবার জন্য যাইতেছিলেন, আর গেলেন না, শিবিরেই বসিয়া রহিলেন।

যে লোকটী আসিয়াছিল তাহার নাম করভক, সে প্রণাম করিয়া জানাইল যে রাজমাতা সে দিন হইতে চতুর্থ দিনে 'পুত্রপিণ্ড পালন' নামক এক ব্রত করিবেন, সেদিন যেন মহারাজ প্রাসাদে উপস্থিত থাকেন।

দুষ্যন্তের সমস্ত উৎসাহ কমিয়া আসিল। জননী নিজে লোক পাঠাইয়াছেন, যাইতেই হবে। এদিকে শকুন্তলাকে দেখিবার ইচ্ছা, তাহার উপর আবার ঋষিদিগকে এইমাত্র তিনি আশ্বাস দিয়াছেন তপোবনে আরও কিছুদিন থাকিয়া অশান্তি দূর করিবেন, তাহারই বা কি হইবে, ইহাই হইল তাঁহার ভাবনা। একদিকে ঋষিদের আদেশ অপরদিকে জননীর আদেশ, তিনি উভয় সঙ্কটে পড়িলেন।

কিছুক্ষণ থাকিয়া তিনি বিদূষককে বলিলেন, "ব্যাপার ত জটিল, এককাজ করলে কিন্তু দুই দিকই বজায় থাকে, তবে তুমি যদি রাজী হও। মা'ঠাকুরাণী ত তোমায় পুত্র বলেই গ্রহণ করেছেন, তুমি ফিরে গিয়ে ব্রতের কাছে থেকো, আমি থাকাও যা তুমি থাকাও তা'। আর জননীকে বুঝিয়ে ব'লো যে তপস্বীদের কাজে আমি ব্যস্ত, এখানে না থাকলে নয়।"

বিদূষক বলিলেন, "ভাল কথা, আমিই ফিরে যাই। কিন্তু দেখো ভায়া, যেন মনে করো না যে আমি রাক্ষসের ভয়েই ফিরে যেতে রাজী হ'য়েছি।"

দুষ্যন্ত হাসিয়া বলিলেন, "আরে না, না, আমি কি তোমায় চিনি না, যে মনে করব তুমি রাক্ষসের ভয়েই দেশে পালাচ্ছ।"

বিদূষক তখন লোকজন সঙ্গে লইয়া যুবরাজের মত ঘটা করিয়া রাজধানীতে যাইতে চাহিলেন। দুষ্যন্তও তাই চাহেন, বেশী লোকজন থাকিলে তপোবনের শান্তিভঙ্গ হইবার যথেষ্টই সম্ভাবনা। তাই তিনি বিদূষককে সমস্ত লোকজন লইয়া যাইতে বলিয়া দিলেন, তাঁহার মনে হইল, "একা থাকাই বেশ।"

বিলম্ব করিলে চলিবে না, বিদূষক লোকজন লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। দুষ্যন্ত ভাবিলেন, 'এর কাছে শকুন্তলার কথা বলিয়া ভাল করি নাই, এর স্বভাব যেরূপ চঞ্চল এ নিশ্চয়ই বাড়ীর মেয়েদের কাছে শকুন্তলার গল্প করিবে।'

সেই জন্য বিদূষক যখন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইতে আসিলেন, তিনি তাঁহার হাত দুটী ধরিয়া বলিলেন, "বন্ধু তপস্বীদের কাজেই আমি এখানে থেকে গেলাম। আর শকুন্তলার কথা যা তোমায় বলেছি, সে সবই পরিহাস। সে জংলী মেয়ে নিয়ে আমার কি হবে? তুমি সব বোঝ ত? কাহারও কাছে এসব নিয়ে যেন গল্প ক'রো না।"

বিদূষক বলিলেন, "সে আর আমি বুঝি নি? শোনবামাত্রই বুঝে নিয়েছি যে সমস্তই কেবল পরিহাস। একি সত্যি যে লোকের কাছে ব'লে বেড়াব?" দুষ্যন্ত আশ্বস্ত হইলেন। বিদূষক সমস্ত লোক জন লইয়া রাজধানীর দিকে রওনা হইলেন, দুষ্যন্তও চলিলেন তপোবন রক্ষা করিতে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুষ্যন্ত হইলেন তপোবনের রক্ষী। রাক্ষসেরা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা ত দূরের কথা দূর হইতে কেবল ধনুষ্টঙ্কারের শব্দ শুনিয়াই পলাইয়া যাইতে লাগিল। তপস্বীরা নির্ব্বিঘ্নে আপনাদের যাগযজ্ঞ সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা সম্মুখ যুদ্ধ করিতে সাহস করিত না বলিয়া তাহাদিগকে একেবারে সমূলে বিনাশ করাও যাইত না, কাজেই আবার যে কখন তাহাদের উপদ্রব হয়, তাহা নিবারণ করিবার জন্য দুষ্যন্তকে মুনিদের আশ্রমের নিকটেই আরও কয়েকদিন থাকিতে হইল। রাক্ষস-বধের নাম করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে কণ্বমুনির আশ্রমের নিকট যাইতেন, দূর হইতে সমস্ত দেখিতেন, কখনও দেখিতেন অনসূয়া প্রিয়ম্বদা জল তুলিতেছেন, কখনও বা ফুল তুলিতেছেন। তাঁহারা কখন কোথায় থাকেন, কখন কি করেন তিনি সমস্তই দেখেন। আর কেবলই মনে হয় আবার একবার আশ্রমের ভিতর গিয়া শকুন্তলাকে দেখিয়া আসেন। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাঁহার ভয় হইতে লাগিল, হয়ত এবার মুনি-ঋষিরা তপোবনের অশান্তি দূর হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে নগরে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিবেন, তখন তাঁহার কি দুর্দ্দশা হইবে। শকুন্তলাকে না দেখিয়া তিনি থাকিবেন কি করিয়া।

আজকাল তাঁহার আর কিছুই ভাল লাগে না; রাত্রে ভাল ঘুমও হয় না, আহারেও তেমন রুচি নাই, দিন রাত কেবল শকুন্তলারই মুখখানি তাঁহার মনে পড়ে। সেদিনও তাঁহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, অন্য-মনস্কভাবে এদিক সেদিক ঘুরিতেছিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে কখন যে কণ্বমুনিরই আশ্রমের কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন, খেয়াল ছিল না। সম্মুখেই পূর্ব্বেকার সেই লতাপকুঞ্জটী দেখিতে পাইয়া তাঁহার চমক ভাঙিল। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখেন মধ্যাহ্ন-সূর্য্য ঠিক মাথার উপরে রহিয়াছেন, এই সময়—হ্যাঁ ঠিক এই সময়ই ত শকুন্তলা এই লতাপকুঞ্জে আসিয়া সখীদের সঙ্গে বিশ্রাম করেন, তিনি দূর হইতে কতবারই ত সে

দুষ্যন্তের যাহা শুনিবার ছিল, শুনিলেন। শকুন্তলার মুখ থেকে এ রকম কথা যে তিনি কোন দিন শুনিতে পাইবেন সে কল্পনা তিনি মনে আনিতেও কখন সাহস করেন নাই। পুলকে তাঁহার সারা দেহ শিহরিয়া উঠিল। তাঁহাদের মধ্যে আরও কি কি কথা হয়, জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল বাড়িয়া গেল। তিনি শুনিলেন শকুন্তলা আবার বলিতেছেন—

"তোমরাই দেখ যদি তিনি কৃপা ক'রে চরণে স্থান দেন। নইলে মরণই আমার মঙ্গল।"

প্রিয়ম্বদা তখন অনসূয়াকে চুপি চুপি বলিলেন, "অবস্থা একেবারে সঙ্গীন, একে আর বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিবৃত্ত করবার সময় নেই।"

অনসূয়া বলিলেন, "সবই ত বুঝি। এখন কি উপায়, যা'তে খুব শীঘ্রই গোপনে দু'জনের মিলন ঘটান যায়।"

দুইজনের পরামর্শ চলিতে লাগিল। প্রিয়ম্বদা বলিলেন, "গোপনে দুজনের সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, তবে—শীঘ্র, এইটাই শক্ত।"

প্রিয়ম্বদা আরও বলিলেন, "আমার কিন্তু খুবই বিশ্বাস যে রাজাও শকুন্তলাকে ভালবেসে ফেলেছেন। আজকাল ত মাঝে মাঝে তাঁকে বনে বনে ঘুরতে দেখতে পাই। কি রকম চেহারা ছিল, আর কি হ'য়ে যাচ্ছে।"

দুষ্যন্ত সবই শুনিতেছিলেন, প্রিয়ম্বদার কথায় তিনি আপন দেহের দিকে একবার চাহিয়া ভাবিলেন, "বাস্তবিকই ত রাত জাগিয়া জাগিয়া আমার শরীর অনেকটা শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হাতের বালা আজকাল কেবলই খুলে যায়।"

দুইজনে আবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। প্রিয়ম্বদার মাথায় এক মতলব আসিল, তিনি বলিলেন, "অনসূয়া এক কাজ করিলে হয় না? শকুন্তলাকে দিয়ে যদি একটা প্রেমপত্র লেখান যায় আর সেটা আমি দেবপূজার ফুলের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে সে রাজর্ষিকে দিয়ে আসি কেমন হয়?" এযুক্তি অনসূয়ার বেশ ভাল লাগিল। তিনি বলিলেন, "সেই বেশ হবে আমার মনে হয়, এখন শকুন্তলা কি বলে।"

শকুন্তলা বলিলেন, "তোমাদের মতেই আমার মত, তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কর।"

তখন তাঁহারা শকুন্তলাকে পদ্মে একখানি প্রেমপত্র লিখিতে বলিলেন। খানিকক্ষণ ভাবিয়া শকুন্তলা বলিলেন, "পত্র লেখাত শক্ত নয়, কিন্তু তিনি যদি অবজ্ঞা করেন, তখন কি হবে ভাই? সেই ভাবনায় আমার হৃদয় যে কেঁপে উঠ্‌ছে।"

প্রিয়ম্বদা বলিলেন, "কি বলিস্ শকুন্তলা তুই, তোর প্রেমপত্রকে উপেক্ষা! শরতের বিমল জ্যোৎস্নাকে উপভোগ না ক'রে এমন মূর্খ কে আছে যে সে জ্যোৎস্না ছাতা মাথায় দিয়ে নিবারণ করে?"

• প্রিয়ম্বদার কথায় শকুন্তলা না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন, "বেশ, লিখ্‌ছি না হয়, কিন্তু লিখি কিসে —সরঞ্জাম?

"তার জন্যে আট্‌কাবে না।" বলিয়া প্রিয়ম্বদা একটী পদ্মের পাতা শকুন্তলার নিকটে ফেলিয়া দিয়া তাহার উপর নখ দিয়া পত্র লিখিতে বলিলেন।

শকুন্তলা ভাবিয়া চিন্তিয়া দুই ছত্র লিখিয়া অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাকে বলিলেন, "শোন্ দেখি, কেমন হ'য়েছে, আমি পড়ছি—

"জানিনা হৃদয় তব, ওগো মনচোরা।
দেহমন সমর্পিনু হ'য়ে আত্মহারা।"

দুষ্যন্ত ঝোপের আড়াল হইতে তাঁহাদের সকল কথাই শুনিতে ছিলেন। ভাবিলেন দেখা দেবার ইহাইত উপযুক্ত অবসর। তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া একেবারে শকুন্তলার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "সুন্দরি! তোমার শরীরে ত কেবল তাপই হ'য়েছে আমি যে দিনরাত দগ্ধ হ'চ্ছি তোমায় না দেখে।"

সহসা এমন সময় দুষ্যন্তকে দেখিয়া অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা তাড়াতাড়ি উঠিয়া "আসুন, আসুন" বলিয়া তাঁহাকে শিলার উপর বসিতে বলিলেন। শকুন্তলাও উঠিবার চেষ্টা করিতেছিলেন দেখিয়া দুষ্যন্ত বলিলেন, "থাক্,

থাক্, তোমার আর উঠে কাজ নাই। তোমার শরীর ভাল নয়, যেমন আছ শুয়ে থাক।"

অনসূয়ার অনুরোধে দুষ্যন্ত শিলার উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের সখীটী এখন কেমন আছেন?" ঈষৎ হাসিয়া একবার শকুন্তলার দিকে চাহিয়া লইয়া প্রিয়ম্বদা বলিলেন, "এবার ওষুধ পাওয়া গেছে, সব রোগ সেরে যাবে।"

প্রিয়ম্বদার কথা শুনিয়া শকুন্তলা লজ্জায় মরিয়া গেলেন। তিনি কোনও কথা কহিতে পারিলেন না, কেবল মুখটী নীচু করিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, 'যাকে একবার দেখবার জন্যে মন এত উতলা হইয়াছিল, আর এখন তাকে কাছে পেয়ে কথা বল্‌বারই ক্ষমতা রইল না।'

একটা কথা প্রিয়ম্বদা বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছিলেন না, শেষে সাহস করিয়া বলিয়াই ফেলিলেন, তিনি বলিলেন, "আপনারা দু'জনেই দুজনার প্রতি আসক্ত হ'য়েছেন, এতে আর লুকোবার কিছুই নাই, তবু আপনাকে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না।" "কি বলিবার আছে বল" বলিয়া দুষ্যন্ত উৎসুক দৃষ্টিতে প্রিয়ম্বদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রিয়ম্বদা বলিলেন, "আপনার জন্যই আমাদের সখীর আজ এই দশা, দয়া ক'রে যাতে ওর জীবন রক্ষা হয়, তার উপায় করুন।"

দুষ্যন্ত হাসিয়া বলিলেন, "দশা দু'জনেরই সমান, বরং তোমাদের সখীটিকেই ব'লে দাও যাতে আমার জীবন রক্ষা হয় তার উপায় করুক।"

শকুন্তলা এতক্ষণ নীরবে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, তিনি অনসূয়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "উনি রাজা মানুষ—ঘরে ওঁর সুন্দরী স্ত্রী নিশ্চয়ই আছেন তাঁকে ছেড়ে এখানে রয়েছেন বলে একে ওঁর মন খারাপ তার উপর তোদের যা তা অনুরোধ।"

শকুন্তলার কথা শুনিয়া দুষ্যন্ত অনুনয়ের সুরে বলিয়া উঠিলেন, "আমার আবার কার জন্যে মন খারাপ হ'তে যাবে? আমার মন খারাপ ত কেবল তোমারই জন্যে। এখনও আমার মন বোঝ নি?"

অনসূয়া বলিলেন, "সে ত আমরা বুঝছিই, তবে কি জানেন, শুন্‌তে পাই রাজারাজড়াদের নাকি অনেক প্রণয়িনী থাকেন, তাই ভয় হয় শেষটায় যেন সখীর জন্য আমাদের না অনুতাপ করতে হয়।"

দুষ্যন্ত বলিলেন, "আমাকে কিছু বল্‌তে হবে না। তোমাদের এই প্রিয় সখী আর সসাগরা পৃথিবী এই দুইটাই আমার বংশের গৌরব হ'য়েই থাক্‌বেন।"

সকলেই আশ্বস্ত হইলেন। মনের আনন্দ গোপন করা শকুন্তলার পক্ষেও কঠিন হইয়া পড়িল। তখন হরিণ-শিশু ধরিবার ছল করিয়া অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা লতাগৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কুঞ্জের মধ্যে রহিয়া গেলেন কেবল দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা। অনসূয়া প্রিয়ম্বদা চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া শকুন্তলা বলিয়া উঠিলেন, "আমার একে শরীর খারাপ তার উপর তোরা দুজনাই চ'লে যাচ্ছিস, আমি বুঝি একা থাকব?"

"একা?" প্রিয়ম্বদা ঈষৎ হাসিয়া আবার বলিলেন, "সারা পৃথিবীর যিনি রক্ষক তিনি রইলেন তোর কাছে, তবু তোর একা থাকা হ'ল?" বলিয়া দুজনাই চলিয়া গেলেন।

শকুন্তলা অসহায় ভাবে বলিয়া ফেলিলেন, "সত্যিই চলে গেল?" "গেলেই বা, এত উতলা হ'চ্ছ কেন?" বলিয়া দুষ্যন্ত আরও নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আমি ত আছি, তোমার সেবক। কি ক'রব বল, এই পদ্মপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করি, না, তোমার ওই কোমল পা দু'খানিতে একটু হাত বুলিয়ে দিই।"

শকুন্তলা উঠিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন, "না, না, কিছু করতে হবে না আপনাকে, আপনি মাননীয় ব্যক্তি, ওসব কথা ব'লে আমায় অপরাধিনী করেন কেন?"

শকুন্তলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সখীদের মত তিনিও চলিয়া যান দেখিয়া দুষ্যন্ত আরও নিকটে আসিয়া তাঁহার একখানি হাত ধরিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "কোথায় যাবে? বাইরে এখন বেজায় রোদ, তোমার শরীরও ভাল নয়, এখানেই থাক না।"

শকুন্তলা আপনার হাতখানি ছাড়াইয়া লইতে লইতে বলিলেন,

"কি কর, কি কর, হাত ছেড়ে দাও, সখীরা কেউ নাই এখানে, আমি পরাধীনা, একলা আপনার কাছে কি ক'রে থাকি ?"

দুষ্যন্ত শকুন্তলার হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া অভিমান ভরে বলিলেন, "যাবে যাও, আমি আর তোমার কে ?"

শকুন্তলার আর যাওয়া হইল না, তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দেখুন, আমারই কপাল মন্দ, নইলে আর আমার মত পরাধীনা যে, সে পরের গুণে এত মুগ্ধ হয় ?"

দুষ্যন্ত বুঝিলেন, শকুন্তলার মন তাঁহার উপর বেশ আকৃষ্ট হইয়াছে, তাই আবার যখন শকুন্তলা লতাগৃহ হইতে বাহির হইতে গেলেন, তিনি তাঁহার অঞ্চলখানি ধরিয়া ফেলিলেন। শকুন্তলা সভয়ে বলিলেন, "ক'চ্ছেন কি, আমায় ছেড়ে দিন, পুরুবংশে আপনার জন্ম, নারীর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করবেন না। চারিদিকে ঋষিরা চলাফেরা করছেন, দেখ্‌লে কি মনে করবে।"

দুষ্যন্ত অঞ্চল ত ছাড়িলেনই না, বরং আরও নিকটে আসিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "দেখ্‌লেইবা, আমি যদি তোমায় বিবাহ করি, তুমি কি মনে কর কণ্বমুনি এতে দুঃখিত হবেন ? সেজন্যে কিচ্ছু ভয় নাই। মুনি-ঋষিদের কত মেয়েরাই গন্ধর্ব্ববিবাহে আবদ্ধ হ'য়েছেন। তাঁহাদের গুরুজনেরা কখনও তা'তে আপত্তি করেননি ত।"

শকুন্তলার তখন মনের মধ্যে ঝটিকা বহিতেছিল, তিনি যে কি করিবেন, কি বলিবেন কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। একদিকে দুষ্যন্তের উপর প্রবল অনুরাগ, অপর দিকে আশ্রমসুলভ লজ্জা, গুরুজনদিগের ভয়, সমস্তই যেন তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিতেছিল। এদিকে কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া দুষ্যন্তেরও যেন চমক ভাঙ্গিল, পাছে এ অবস্থায় তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় সেই ভয়ে তিনি তাড়াতাড়ি শকুন্তলার অঞ্চল ছাড়িয়া দিয়া লতাগৃহের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা কোথায় আছে দেখিবার জন্য শকুন্তলা একবার এদিক ওদিক দেখিয়া আবার পিছন দিকে চাহিয়া দেখেন দুষ্যন্ত মুগ্ধনেত্রে তাঁহাকেই দেখিতেছেন। চারিচক্ষু এক হইতেই

শকুন্তলা অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন, আর যেন কতকটা অজ্ঞাতসারেই বলিয়া ফেলিলেন, "পৌরব, আমি তোমার আশা পূরণ করিনি ব'লে আমায় ভুলে যেও না।"

"তোমায় ভুলব, শকুন্তলা?" বলিয়া দুষ্যন্ত ক্ষণেক শকুন্তলার দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতেচাহিয়া আবার বলিলেন, "তুমি যেখানেই থাক, মন আমার তোমার দিকেই পড়ে রইল। আমার মন থেকে তুমি কোথাও যেতে পারবে না।"

শকুন্তলা তখন দু'এক পা আগাইয়া গিয়াছিলেন। দুষ্যন্তের কথায় তাঁহার পা যেন আর চলিতে চাহিল না। তিনি এক কুরুবক গাছের আড়ালে লুকাইয়া দুষ্যন্ত কি করে দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

দুষ্যন্তেরও আর কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, শকুন্তলা নাই, একলা আর কতক্ষণ থাকিবেন, তিনিও বাহিরে আসিতেছিলেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন একটী মৃণালবলয় তাঁহার সম্মুখে মাটির উপর পড়িয়া রহিয়াছে। মৃণালবলয়টী যে শকুন্তলার সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না, তাই তিনি সযত্নে সেটীকে হাতে তুলিয়া লইয়া একেবারে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আঃ।"

শকুন্তলা সমস্তই দেখিতেছিলেন, নিজের হাতের দিকে চাহিয়া দেখেন, হাতে বালা নাই, এ বালা তাঁহারই কখন পড়িয়া গিয়াছে। দুষ্যন্তের কাছে ফিরিয়া যাইবার এমন সুযোগ ছাড়া যায়? শকুন্তলা ব্যস্তভাবে লতাগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আমার এক হাতের বালা এখানে পড়ে গেছে, কিছু দূরে গিয়ে মনে পড়ল, তাই নিতে এসেছি।" তারপর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই তুমি পেয়েছ, এইবেলা দিয়ে দাও, নইলে সবাই সব কথা জেনে যাবে।"

দুষ্যন্ত বলিলেন, "পেয়েছি বটে, দিতেও পারি, যদি একটা সর্ত্তে রাজী হও।"

শকুন্তলা বলিলেন, "সর্ত্তটা আগে শুনি।"

দুষ্যন্ত বলিলেন, "আমায় যদি নিজে তোমার হাতে বালাটা পরিয়ে দিতে দাও, তবে দিতে পারি।"

শকুন্তলা দেখিলেন, এ সর্ত্তে রাজী হওয়া ছাড়া উপায় নাই, তাই বলিলেন, "এ ছাড়া যখন তুমি দেবে না, তাই হোক।"

দুষ্যন্ত মহা আনন্দিত হইলেন, তিনি বলিলেন, "এস এই শিলার উপর বসি।"

দুইজনে শিলার উপর পাশাপাশি বসিলেন, দুষ্যন্ত শকুন্তলার সুকোমল হাতখানি নিজের হাতে লইয়া নানা ছল করিয়া বালা পড়াইতে দেরী করিয়া কেবল স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন; শকুন্তলা বলিলেন, "প্রিয়তম, তাড়াতাড়ি পরিয়ে দাও বড় দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।"

শকুন্তলার মুখে 'প্রিয়তম' সম্ভাষণ শুনিয়া দুষ্যন্তের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন "পরাতে পারা যাচ্ছে না, আচ্ছা এই রকম করে পরিয়ে দেব ?"

শকুন্তলা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যা খুসী তোমার।"

দুষ্যন্ত তখনও নানা ছল করিয়া অনেক দেরী করিয়া বালা পরাইয়া দিয়া শকুন্তলাকে বলিলেন, "দেখ গো সুন্দরি! তোমায় কেমন মানিয়েছে দেখ, মনে হয় যেন আকাশের চাঁদ আকাশ ছেড়ে মৃণালবলয় রূপে তোমার সুন্দর হাতখানি আরও সুন্দর ক'রে তুলেছে। ভাল ক'রে দেখ।"

শকুন্তলা বলিলেন, "আমার চোখে কি পড়েছে, বালার মধ্যে তোমার আকাশের চাঁদ দেখবার আমার ক্ষমতা নাই।"

দুষ্যন্ত হাস্যমুখে বলিলেন, "দেখি চোখটা, আর যদি হুকুম হয় ফুঁদিয়ে না হয় পরিষ্কার ক'রে দেই।"

"তা'হলে উপকার হয় বটে, কিন্তু তোমায় অতদূর বিশ্বাস হয় না," বলিয়া শকুন্তলা প্রথমে রাজী হইলেন না। তারপর দুষ্যন্তের আগ্রহের আতিশয্যে যখন রাজী হইলেন, দুষ্যন্ত তাঁহার মুখখানি দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিলেন, চোখে ফুৎকার দিবার কথা আর মনে রহিল না।

শকুন্তলা এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন, "আমার চোখ কোন্‌টা বুঝি বুঝতে পারছ না ?"

"না, না, তা নয়।" বলিয়া দুষ্যন্ত শকুন্তলার চোখে একবার ফুৎকার দিলেন।

"হয়েছে, হয়েছে, আমি ভাল হয়ে গেছি, ছাড়।" এই বলিয়া শকুন্তলা দুষ্যন্তের হাত হইতে আপনার মুখখানি মুক্ত করিয়া লইয়া বলিলেন, "তুমি আমার এত উপকার করলে, আর আমি তোমার কিছু উপকার করতে পারলাম না বলে যেন কিছু মনে ক'রো না।"

"উপকার? সুন্দরি, ফুৎকার দেবার সময় যে তোমার মুখকমলের আঘ্রাণ পেয়েছি, এতেই আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি, মধুকরও ত কমলের আঘ্রাণ নিয়েই সন্তুষ্ট হয়।"

দুষ্যন্তের কথা ও বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া শকুন্তলা না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আহাঃ সে মধুকর বেচারা সন্তুষ্ট না হ'য়েই বা কি করে।"

"বটে? সন্তুষ্ট না হয়েই বা কি করে? এম্‌নি করে," বলিয়া দুষ্যন্ত আবার শকুন্তলার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিতে গেলেন, শকুন্তলা তাড়াতাড়ি দুই হাত দিয়া আপনার মুখ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন। ঠিক এই সময় বাহির হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, "চক্রবাকের বধূ, বেলা গেল, স্বামীসম্ভাষণ সেরে নাও।"

তাঁহা শুনিয়া শকুন্তলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুষ্যন্তকে বলিলেন, "প্রিয়তম, লুকিয়ে পড়, লুকিয়ে পড়, গৌতমী পিসি আমায় দেখতে আসছেন।"

আর্য্যা গৌতমীর নাম শুনিয়া দুষ্যন্ত অমনি লতাকুঞ্জের বাহিরে গিয়া এক স্থানে লুকাইয়া পড়িলেন।

"কেমন আছিস মা, শকুন্তলা" বলিতে বলিতে আর্য্যা গৌতমী লতাগৃহের মধ্যে আসিলেন "একলা কেন মা? অনসূয়া প্রিয়ম্বদা—তারা সব কোথায়?"

শকুন্তলা বলিলেন,"অনসূয়ারা মালিনী নদীতে গেছে এখনই আসবে।"

গৌতমী তখন আপনার জলপাত্র হইতে খানিকটা জল ঢালিয়া শকুন্তলার গায়ে ছিটাইয়া বলিলেন, "বেঁচে থাক মা, চিরজীবিনী হ'য়ে। এখন একটু ভাল আছত?"

"একটু ভাল আছি।" বলিয়া শকুন্তলা উঠিয়া গৌতমীর কাছে আসিলেন।

"চল আমরা কুটীরে যাই।" এই বলিয়া গৌতমী শকুন্তলাকে লইয়া লতাগৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। যাইবার সময় শকুন্তলা একবার পিছন ফিরিয়া যেন লতাকুঞ্জকেই বলিতেছেন, এমনভাবে দুষ্যন্তের উদ্দেশ্যে বলিলেন, "লতাকুঞ্জ, তুমিই আমার সন্তাপ নাশ করিয়াছ, আবার যেন আমাদের মিলন হয়।"

দুজনেই চলিয়া গেলেন। দুষ্যন্ত পুনরায় সেই লতাকুঞ্জে ফিরিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল, কে যেন দূর হইতে বলিল, "রাজন্, যজ্ঞস্থলের চারিদিকে রাক্ষসদের ছায়া যাওয়া আসা করিতেছে।"

দুষ্যন্ত সেকথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার চেষ্টায় খুব শীঘ্রই সেই লতাগৃহে আবার একদিন দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার সাক্ষাৎ হইল। সেদিন সখীদের সমক্ষে চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করিয়া দুষ্যন্ত গন্ধর্ব্ব বিধানে শকুন্তলাকে যথারীতি বিবাহ করিলেন। তারপর হইতে নিয়মিত ভাবেই দুজনের দেখা সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। ঋষিদের যজ্ঞকার্য্যের বিঘ্ন দূর করিবার নাম করিয়া দুষ্যন্ত সেখানে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর কয়েকটী সপ্তাহও কাটাইলেন। ক্রমে একদিন তাঁহার কাজ ফুরাইয়া আসিল। যাগযজ্ঞের সকল বিঘ্ন দূর হওয়াতে মুনিঋষিরা সকলে তাঁহাকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিয়া নগরে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিলেন। যে দিন তপোবন ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন তাহার পূর্ব্বদিন দুষ্যন্ত আসিলেন শকুন্তলার নিকট হইতে বিদায় লইতে। শকুন্তলার চোখে জল, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না, তবু তিনি দুষ্যন্তকে বলিলেন, "প্রিয়তম, আবার কবে আমাদের দেখা হবে ?"

দুষ্যন্ত তাঁহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া আপনার হাত হইতে একটী আংটী খুলিয়া শকুন্তলার সুকোমল হস্তের অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই অঙ্গুরীতে আমার নাম লেখা আছে, তুমি রোজ এর একটী ক'রে অক্ষর প'ড়ো সব অক্ষরগুলি পড়া শেষ হ'তে না হ'তেই দেখবে আমার লোকজন এসে কত সমাদর ক'রে আমার প্রাসাদে তোমায় নিয়ে যাবে। তোমার আমার বিচ্ছেদ সে আর ক'টা দিন ?"

অত দুঃখের মধ্যেও শকুন্তলা কতকটা শান্তি পাইয়াছিলেন, তারপর যে দিন দুষ্যন্ত তপোবন ছাড়িয়া আপনার রাজধানীতে চলিয়া গেলেন, সেদিন সকাল হইতে শকুন্তলা আর আপনাতে আপনি রহিলেন না, প্রিয়তমের চিন্তায় তিনি নিজের সত্তাও যেন হারাইয়া ফেলিলেন।

অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদা প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও দেবপূজার ফুল তুলিতে যাইবার সময় শকুন্তলাকে সঙ্গে যাইবার জন্য ডাকিতে আসিয়া-

ছিলেন, কুটীরের কাছে আসিয়া দেখেন, বাম হস্তের উপর :মুখটী রাখিয়া শকুন্তলা যেন কিসের চিন্তায় বিভোর। তাঁহার সে ভাব দেখিয়া সখীদের মোটেই ইচ্ছা হইল না যে তাঁহাকে ফুল তুলিতে ডাকিয়া তাঁহার প্রিয়তমের চিন্তায় বাধা দেন, তাই তাঁহারা সেদিন দুজনেই ফুল তুলিতে গেলেন। শকুন্তলা একাকী সেই ভাবেই কুটীরের দ্বারে বসিয়া রহিলেন।

গ্রহের ফের, শকুন্তলা যখন স্বামীর ধ্যানে তন্ময় হইয়া উদাস ভাবে বসিয়া ছিলেন, মহামুনি দুর্ব্বাসা মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে বিশ্রাম করিবার ইচ্ছায় সেই কুটীরের অনতিদূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে অন্য আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া দুর্ব্বাসা মুনি শকুন্তলার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য বলিলেন, "কে আছ ? আমি এসেছি।" কিন্তু তাঁহার কথা শুনিবে কে ? শকুন্তলা তখন দুষ্যন্তের চিন্তায় আত্মহারা, মুনির কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশই করিল না। শকুন্তলার কোনও সারা না পাইয়া মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তিনি হাত উঠাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বটে এতদূর স্পর্দ্ধা। আমার অপমান ? আমি অতিথি দ্বারে এসেছি, আর তুই অন্যের চিন্তায় বিভোর হ'য়ে আমায় তাচ্ছিল্য করিলি। যাকে তুই একমনে চিন্তা কর্‌ছিস আমার শাপে সে যেন তোকে একেবারে ভুলে যায়, হাজার মনে করিয়ে দিলেও সে আর কখনও তোকে চিন্‌তে পার্‌বে না। তোর সকল স্মৃতি তার মন থেকে মুছে যাবে।" মহর্ষির এ তীব্র অভিশাপও শকুন্তলার কানে গেল না, তিনি:যেমন ভাবে বসিয়াছিলেন, ঠিক সেই রকম ভাবেই বসিয়া রহিলেন।

অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা সেই কুটীরেরই কিছুদূরে ফুল তুলিতেছিলেন। অতিথির কণ্ঠস্বর শুনিয়া প্রথম হইতেই তাঁহারা যেন নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলেন না ; শকুন্তলা আছে বটে কুটীরের দ্বারে তবে হৃদয় যে তার কার কাছে পড়ে আছে, তাহা তাঁহাদের অজানা ছিল না, তাই শকুন্তলার দ্বারা আজ যে অতিথি সৎকার কত হবে, সে তাহারা বেশ বুঝিতে পারিতেছিল। তাহার উপর আবার মহামুনির সে দারুণ অভিসম্পাত যখন শুনিতে পাইল, তাহারা শকুন্তলার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল।. অনসূয়া মহামুনির কাছে ক্ষমা চাহিয়া তাহার ক্রোধ শান্ত করিবার জন্য ছুটিয়া

গিয়া একেবারে তাঁহার পা' দুটী জড়াইয়া ধরিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া আবার তাঁহাকে তাঁহাদের আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতে বলিল। কিন্তু মুনি ছিলেন স্বয়ং দুর্ব্বাসা। তাঁহার ন্যায় ক্রোধপরায়ণ মুনি তখনকার দিনে আর কেহই ছিলেন না, তিনি আশ্রমে ফিরিয়া যাইতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। তখন অনসূয়া কাতরভাবে বলিল, "ভগবন্, শকুন্তলা আপনার কন্যা, বালিকা সে, সে কি আপনার তপস্যার মহিমা জানে? তার এই প্রথম অপরাধ ক্ষমা করুন।"

অনেক কাকুতি-মিনতির পর দুর্ব্বাসা বলিলেন, "আমার বাক্য কখনও অন্যথা হয় না, তবে যদি সে কোনও নিদর্শন বস্তু দেখাতে পারে, তখন আমার এ শাপ মোচন হবে।" এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

অনসূয়া প্রিয়ম্বদার কাছে ফিরিয়া আসিয়া মুনির সকল কথাই বলিল। প্রিয়ম্বদা শুনিয়া বলিল, "যাক্—তার জন্যে ভাবনা নাই, রাজর্ষি চলে যাবার সময় শকুন্তলার হাতে তাঁর নাম লেখা একটী আংটী পরিয়ে দিয়ে গেছেন, সেইটীই নিদর্শন রইল।"

তাহারা স্থির করিল যে, এসব কথা আর শকুন্তলাকে জানাইয়া কাজ নাই, যাহা হইবার তাহা ত' হইয়াই গিয়াছে, বলিয়া কেবল বেচারার মন খারাপ করা বৈ ত নয়। তাহারা যখন ফিরিল, তখনও শকুন্তলা সেই একই ভাবে সেইখানে বসিয়াছিল, দেখিলে মনে হয় যেন পটে আঁকা ছবি।

তপোবন হইতে রাজা দুষ্যন্তের চলিয়া যাইবার পর দিন কয়েক শকুন্তলা ও তাহার সখীরা উৎসুকভাবে তাঁহার লোকজনদের প্রতীক্ষায় রহিলেন। দুষ্যন্ত নিজে যে সময়ের মধ্যে লোক পাঠাইবেন বলিয়া গিয়াছিলেন, সে সময় যখন উত্তীর্ণ হইয়া গেল, অথচ লোকও কেহই আসিল না, তখন তাহারা ভাবিল, কাজের ব্যস্ততায় মহারাজ লোক পাঠাইতে পারেন নাই, এবার নিশ্চয়ই লোক আসিবে। তারপরও যখন এক দুই করিয়া অনেক দিন কাটিয়া গেল, মাসের পর মাসও কাটিল, তখন তাঁহাদের আর সন্দেহ রহিল না, যে, দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে ভুলিয়া

গিয়াছেন এবং এ বিস্মৃতির প্রধান কারণ—দুর্ব্বাসার অভিশাপ। তখন তাহাদের ভাবনা হইল যে, মহামুনি কণ্ব যখন তপোবনে ফিরিয়া আসিবেন, কেমন করিয়া শকুন্তলার বিবাহব্যাপার তাঁহাকে বলা হইবে, শুনিয়া তিনিই বা কি মনে করিবেন। আরও ভাবনার কথা, যে শকুন্তলা অন্তঃসত্ত্বা হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা যে কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। একবার ভাবিল, যে, অঙ্গুরীটী দুষ্যন্ত শকুন্তলার হাতে পরাইয়া দিয়াছেন সেইটীই না হয় কাহারও হাতে দিয়া রাজার নিকট পাঠাইয়া দেয়, কিন্তু তপস্বীদের মধ্যে গোপনে এ কাজের ভার লইবার মত লোকই-বা কোথায়? রাত্রে আর কাহারও চোখে ঘুম নাই, নিত্যকার্য্য করিতেও যেন হাতপা আর সরে না। তাঁহাদের দুর্ভাবনার অন্ত রহিল না।

এমনি সময়ে, একদিন মহামুনি কণ্ব তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। সেদিন প্রাতে মহর্ষি তাঁহার আশ্রমের অগ্নি-গৃহে অগ্নিদেবের পূজা করিতে গিয়াছিলেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, যেন কোনও অশরীরী আত্মা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ব্রাহ্মণ! দুষ্যন্ত তোমার কন্যা শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়াছেন। এ বিবাহে জগতের মঙ্গল হইবে, শকুন্তলা এখন গর্ভবতী।"

কণ্বমুনির অনেক দিন হইতেই ইচ্ছা ছিল যে, সৎপাত্রে শকুন্তলার বিবাহ দেন, এখন বিনা চেষ্টায় পৃথিবীর রাজা দুষ্যন্তের সহিত শকুন্তলার বিবাহ হইয়াছে শুনিয়া মুনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি তখনই বাহিরে আসিয়া শকুন্তলাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "মা, তুমি সৎপাত্রেই বিবাহিতা হ'য়েছ, তোমার জন্য আর আমার ভাবনা রইল না। আজই আমি তোমায় শিষ্যদের সঙ্গে দিয়ে তোমার স্বামীগৃহে পাঠিয়ে দেব।"

শকুন্তলা লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া রহিল। শকুন্তলা যে আজই শ্বশুরবাড়ী যাইবে, এ কথা প্রচার হইতে বড় বেশী বিলম্ব হইল না। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা—তাঁহারাও শুনিল। দুঃখিনী শকুন্তলা যে এবার সুখী হইবে সেই কথা ভাবিয়া মনে মনে যেমন তাঁহারা একটা স্বস্তি

অনুভব করিতেছিল, আবার শকুন্তলাকে আর দেখিতে পাইবে না ভাবিয়া তাহাদের মনে তেমনি দুঃখও হইতেছিল।

অচিরেই শকুন্তলাকে সাজাইবার জন্য তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল। শকুন্তলা স্নান করিয়া গৌতমী ও অন্যান্য তাপসীদিগকে প্রণাম করিয়া সাজিতে বসিল। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা ফুলের মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছিল, সেই ফুলের মালা, গোরচনা, তিলক মাটি, দূর্ব্বা এই সব লইয়া শকুন্তলাকে সাজাইতে লাগিল। সখীদের হাতে হয়ত কখনও আর সাজিতে পাইবে না—এই শেষ, ভাবিয়া শকুন্তলার দুঃখ হইতেছিল, সে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল। সখীদেরও চোখে জল, তবু তাহারা মঙ্গলাচরণের সময় ক্রন্দন করা উচিত নয় বলিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিল। শকুন্তলার চক্ষু মুছিয়া দেয়, আবার নিজেদের চক্ষুও মধ্যে মধ্যে মুছিতে হয়।

তাহারা শকুন্তলাকে সাজাইতে ছিল বটে, কিন্তু সাজাইয়া যেন তৃপ্তি পাইতেছিল না। শকুন্তলার যা রূপ, সে রূপের যোগ্য অলঙ্কার কোথায়? এমন সময় মহামুনির এক শিষ্য আসিয়া বলিলেন, "এই দেখুন, কত অলঙ্কার।" তিনি সঙ্গে অনেক অলঙ্কার আনিয়াছিলেন, সবগুলি সেইখানে রাখিয়া দিতেই সকলে একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। আর্য্যা গৌতমী উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত অলঙ্কার! এসব তুমি কোথায় পেলে বাবা?"

শিষ্য বলিলেন, "কোথায় পেলাম? শকুন্তলাকে সাজাইবার জন্য পিতা আমায় ফুল তুলিতে আদেশ দিয়াছিলেন। আমি যেমন ফুল তুলিতে যাব, অমনি কোন গাছ দিলে এই চেলী, কেউ দিলে আল্‌তা, কেউ দিলে এই সমস্ত অলঙ্কার, তাই নিয়ে এলুম।"

সব শুনিয়া গৌতমী বলিলেন, "মা শকুন্তলা, এসব বনদেবতাদের দয়া, এসব দেখে মনে হয়, নিশ্চয়ই তুমি স্বামীর ঘরে গিয়ে খুব সুখে থাকবে।"

অলঙ্কার পাওয়া গেল বটে, তবে সেগুলি পরান আবার এক সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িল। অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা দুইজনেই তপোবনে মানুষ

হইয়াছে, অলঙ্কার পরা ত কাহারও ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই, কাজেই কোন্ অলঙ্কারটি যে দেহের কোন্ স্থানে পরিতে হয়, তাহারা তাহা জানিত না। কিছুক্ষণ ভাবিয়া অনসূয়া বলিল, "এক কাজ করা যাক্। অলঙ্কার দেখিনি বটে, তবে অলঙ্কারপরিহিতা অনেক নারীর চিত্র ত দেখিয়াছি, সেই ভাবেই শকুন্তলাকে সাজান যাক্।" তাহারা শকুন্তলাকে সাজাইতে লাগিল।

স্নান করিয়া কণ্বমুনি আসিলেন শকুন্তলাকে দেখিতে। শকুন্তলাকে স্বামীগৃহে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া অবধি মহর্ষির চিত্তও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁর মত লোকেরও কন্যাবিচ্ছেদের দুঃখে বাক্‌রোধ হইয়া আসিতেছিল। শকুন্তলার দিকে চাহিয়া তিনি ভাবিতেছিলেন, "কি আশ্চর্য্য, স্নেহ কি জিনিষ! অরণ্যবাসী আমি, সংসারে যার কোন বন্ধনই নাই, তারও চোখে জল, হৃদয় কাতর, না জানি গৃহস্থ যারা, তাদের মেয়েরা যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ী যায়, মনে কি কষ্টই না হয় তাদের।"

শকুন্তলার অলঙ্কার পরা হইয়া গিয়াছিল, সে কাপড় ছাড়িয়া প্রথমে পিতা কণ্বকে ও তারপর আর আর সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিল। মহর্ষি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর তিনি তপোবনের প্রতি বৃক্ষলতা, বনদেবতা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন, "আশ্রমের যত বৃক্ষলতা আছ সকলেই শোন, যে তোমাদের মূলে জল না দিয়া নিজে কখনও জলপান করিত না, অলঙ্কার পরিবার সাধ থাকিলেও যে কখনও কোন বৃক্ষের একটী পল্লব পর্য্যন্ত ভাঙ্গে নাই, তোমাদের শাখায় প্রথম ফুল ফুটিলে যাহার আহ্লাদের সীমা থাকিত না, সেই তোমাদের শকুন্তলা আজ স্বামীর গৃহে যাইবে, তোমরা সকলে অনুমতি দাও।"

মহামুনির কথা শেষ হইতে না হইতেই সকলের মনে হইল যেন আকাশ হইতে বনদেবতাদের কথার প্রতিধ্বনি আসিতেছে। সকলেই যেন আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেছেন, 'শিবশ্চ পন্থাঃ'। সেই সময় এক কোকিল ডাকিয়া উঠিল। যাত্রাকালে কোকিলের কণ্ঠস্বর মঙ্গলের নিদর্শন, তাই

শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রা

সকলেই সন্তুষ্ট মনে যাত্রা আরম্ভ করিলেন। শকুন্তলা চলিতে লাগিল। আশৈশব সে যে তপোবনে কাটাইয়াছে তাহার প্রত্যেক সুখস্মৃতিটী আজ তাহার মনে পড়িতে লাগিল। দুষ্যন্তকে দেখিবার জন্য যদিও তাহার মনে অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল তবু সে এ আশ্রম ছাড়িয়া অন্য কোথাও গিয়া কেমন করিয়া থাকিবে সেই ভাবিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিল। সে প্রিয়ম্বদাকে বলিল, "তোমাদেরকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাক্‌ব ভাই? যেতে যে আমার পা চাইছে না।"

প্রিয়ম্বদাও কম কাতর হয় নাই, সে বলিল, "দুঃখ কি তোর একার? তুই যাচ্ছিস ব'লে এই দেখ তপোবনের অবস্থা।" এই বলিয়া সে দেখাইল যেন চারিদিকেই একটা বিষাদের ছায়া, হরিণ হরিণী যাহারা কি আনন্দে ঘাস খায় তাহারা খাওয়া ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে, ময়ূর ময়ূরী--নৃত্যের যাহাদের বিরাম থাকিত না তাহারাও নীরব, বৃক্ষলতা—সবাই যেন বিষণ্ণ, এইসব দেখিয়া শকুন্তলার মন আরও কাতর হইয়া উঠিল। যে মাধবী লতাটীকে সে নিজের ভগিনীর মত স্নেহ করিত, তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া তাহাকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিল, পিতাকে বলিল যেন চিরদিন সে একে স্নেহ করে, আর অনসূয়া প্রিয়ম্বদাকে বলিল, "আমার এ বোনটীকে তোদের হাতে দিয়ে গেলাম।" তাহারাও চোখ মুছিয়া বলিল, "আর আমাদেরকে? আমাদেরকে কারু হাতে দিয়ে যাচ্ছিস্ বোন?" তখন তিনজনেই কাঁদিতে লাগিল।

কণ্বমুনি বলিলেন, "অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা, তোমরা কর কি? তোমরাই যদি কাঁদ্‌বে তবে শকুন্তলাকে ভোলাবে কে?"

শকুন্তলার চারিদিকেই স্নেহের আকর্ষণ। কুটীরের পাশে পূর্ণগর্ভা হরিণী—তাহাকে দেখিয়া শকুন্তলা বলিল, "বাবা, এ প্রসব হ'লে আমায় খবর পাঠিও।"

পিছন হইতে আবার কে তাহার অঞ্চল ধরিয়া টানে, শকুন্তলা চাহিয়া দেখে তাহারই পালিত পুত্র—এক হরিণ প্রসব করিয়াই যাহার মা মারা পড়িয়াছিল, সে নিজে যাহাকে আপন হাতে খাওয়াইয়া পালন করিয়াছিল। শকুন্তলা অধীর হইয়া পড়িল। কণ্বমুনি তাহাকে সান্ত্বনা দিতে,

লাগিলেন। তারপর তাঁহারা এক জলাশয়ের নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানে আসিয়া কণ্বমুনির শিষ্য দুইজন বলিলেন, "গুরুদেব, প্রিয়জনের সঙ্গে জলাশয় অতিক্রম করতে নেই শুনেছি, এই পুষ্করিণীর তীরে আমাদিগকে যা বলতে হয় বলুন, আশ্রমে গিয়ে আপনাকে ত আবার বিশ্রাম করতে হবে।"

মহর্ষি বলিলেন, "ঠিক বলেছ। তাহ'লে এই বটবৃক্ষের তলায় দাঁড়াই।"

মহারাজ দুষ্যন্তকে কি বলা যায় তিনি ভাবিতে লাগিলেন। মনে মনে ঠিক করিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "দেখ, তোমরা মহারাজ দুষ্যন্তকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে ব'লো যে, আমি দরিদ্র তপস্বী আর আপনি পৃথিবীর অধীশ্বর, অতি উচ্চকুলে আপনার জন্ম, আপনি গন্ধর্ব্ববিধানে যে আমার কন্যাকে বিবাহ করেছেন, এ ভালই হয়েছে। আপনার অনেক মহিষী, আপনি তাঁদিগের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেন আমার কন্যাকেও সেরূপ দেখবেন এইটুকুই আমি চাই। এর বেশী কিছু পাওয়া কন্যার অদৃষ্ট। আপনার জন এর অধিক আর কিছু চায় না।"

শিষ্যেরা গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। তখন কণ্বমুনি শকুন্তলার দিকে চাহিয়া তাহাকে বলিলেন, "দু'একটী কথা বলব মা, মনে রাখিস্। স্বামীর গৃহে গিয়ে তাঁর গুরুজনদের সেবা করিস্, সপত্নীদের কখনও পর ভাবিস্ নি মা, আপনার সখীদের মত তাঁদের সঙ্গে ব্যবহার করিস্। আর স্বামী যদিও কখন রেগে উঠেন, দেখিস্ মা, কখনও যেন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করিস্ নি। ভোগে আসক্তিবিহীন হ'য়ে আশ্রিত পরিজনদের উপর সকল সময়ে সদয় থাকিস্। এর বেশী আর কি বলব মা, তোদের বয়সে এসব যারা মেনে চলে শেষটায় তারাই হয় গৃহিণী, আর যারা এসব মানতে চায় না, তাদের জন্যেই সংসার জ্বলে যায়।"

তারপর বিদায়ের পালা আসিল, কণ্বমুনি বলিলেন, "মা, এবার আমি ও তোমার সখীরা চলে যাব, আমাদের আলিঙ্গন কর।"

শকুন্তলা বলিল, "কেন বাবা, অনসূয়া প্রিয়ম্বদা আমার সঙ্গে যাবে না?"

মুনি বলিলেন, "তা কি হয় মা, ওদের এখনও বিয়ে হয় নি, বিয়ে দিতে হবে। ওদের তোমার সঙ্গে যাওয়া ভাল দেখায় না। গৌতমী তোমার সঙ্গে যাবেন।"

এমন স্নেহময় পিতাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া শকুন্তলা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল, সে পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা, তোমায় ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে কেমন করে বাঁচব।"

কণ্বমুনি তাহার অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, "তার জন্য দুঃখ কিসের মা? অমন রাজ্যেশ্বর স্বামী,—তাঁর সংসারে গিয়ে স্বামী-পুত্র নিয়ে নানা কাজে ব্যস্ত হ'লে আর তখন আমার জন্যে তোমার মন কেমন করবে না।"

শকুন্তলা পিতাকে প্রণাম করিল, তারপর অনেক অশ্রু বিসর্জ্জনের মধ্যে যখন সখীদের নিকট হইতে বিদায় লওয়া হইল, তাহারা কোনও গতিকে বলিয়া ফেলিল, "মহারাজ যদি প্রথমটা তোকে চিনতে না পারেন, তবে তোর হাতে তাঁর নাম লেখা যে আংটীটী আছে সেটী দেখাস্।"

'চিন্‌তে না পারেন' কথাটা শুনিয়া শকুন্তলার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে বলিল, "একথা কেন বলছিস্ ভাই? শুনে যে আমার বুকের ভিতরটা কেমন করছে।"

সখীরা বলিল, "না, না, ও কিছু না, এমনিই বল্‌লাম। স্নেহ অমঙ্গলটাই আগে আশঙ্কা করে।"

শকুন্তলা পিতার দিকে চাহিল, চিরস্নেহময় পিতা—তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইতেছে,—দুঃখে যেন তাহার পা অসাড় হইয়া আসিতেছিল, সে পিতাকে আবার জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বক্ষের মধ্যে মুখ রাখিয়া বালিকার ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। কণ্ব ও গৌতমী অনেক বুঝাইলেন, তখন শকুন্তলা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বলিল, "আবার কবে এখানে আসব বাবা?"

"স্বামীর সঙ্গে বহুবৎসর ধ'রে রাজ্যসুখ ভোগ করে," কণ্বমুনি বলিলেন,

"সংসার যখন আর ভাল লাগবে না, পুত্রকে তখন সিংহাসনে বসিয়ে শান্তির কামনায় দু'জনে আবার এই পুণ্যাশ্রমে আসবি মা।"

বেলাও বাড়িতেছিল, কণ্বমুনির তপস্যার সময় বহিয়া যায়। শিষ্যেরা তাড়া করিতে লাগিলেন। কণ্বমুনি নিজেই অধীর, তবু তিনি অনেক কষ্টে শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া শেষ বিদায় দিলেন। গৌতমী শারঙ্গরব ও শারদ্বতের সহিত শকুন্তলা চক্ষু মুছিতে মুছিতে পথ চলিতে লাগিল।

সকলে চলিয়া গেলেন। যতক্ষণ তাঁহাদিগকে দেখা যাইতেছিল অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা উৎসুক নয়নে দেখিতেছিল, তারপর যখন আর দেখা গেল না, তাহারা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অঞ্চলে মুখ ঢাকিল। শকুন্তলাবিহীন আশ্রমে ফিরিয়া যাইতে তাহাদের আর ইচ্ছা হইতেছিল না। কণ্বমুনি এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাকে লইয়া আশ্রমের দিকে চলিলেন।

বহুদিনের গচ্ছিতধন তার মালিকের হাতে দিতে পারিলে মনটা যেমন নিশ্চিন্ত হয়, শকুন্তলাকে তাহার স্বামীর গৃহে পাঠাইয়া দিয়া মহর্ষির মনেও তেমনি একটা তৃপ্তি আসিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, "বাস্তবিকই, কন্যা যেন নিজের জিনিষ নয়—পরের, পরের গচ্ছিত ধন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দিন কয়েকের মধ্যেই গৌতমী, শকুন্তলা প্রভৃতি সকলে দুষ্যন্তের রাজধানীতে পৌঁছিলেন। প্রাসাদের দ্বারে আসিয়া তাঁহারা কঞ্চুকীকে দিয়া রাজার নিকট আপনাদের আগমনের সংবাদ পাঠাইয়া রাজাজ্ঞার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দুষ্যন্ত তখন সভার মধ্যে রাজকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। অনেক কাজ—তিনি যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, মাঝে মাঝে বৈতালিকেরা তাঁহার 'জয়' গান করিয়া তাঁহার পরিশ্রম লাঘব করিতেছিল। বিদূষক ছিলেন তাঁহার পাশে, তিনি বলিলেন, "বন্ধু, শোন, সঙ্গীতশালা থেকে বীণাযন্ত্র সহযোগে কে যেন গান করছে।" দুষ্যন্ত শুনিলেন তাঁহার এক মহিষী হংসপদিকা গাহিতেছিলেন—

"আম্র মুকুলের ক'রে মধুপান
ওহে মধুকর কোথায় যাও ?
কমলিনীসনে করিতে প্রণয়,
মুকুলের দিকে ফিরে না চাও ?"

গানটী দুষ্যন্তের অত্যন্ত ভাল লাগিল, তিনি বিদূষককে বলিলেন, "বন্ধু, এ গানে অর্থ আছে, আমাকেই যেন কিছু মনে করিয়ে দেওয়া। যাও দেখি তুমি রাণীকে গিয়ে বুঝিয়ে এস।" "যাচ্ছি কিন্তু ছাড়ান পাব না, বন্ধু। রাণীমার যা সহচরীরা আছে!" বিদূষক চলিয়া গেলেন। দুষ্যন্ত ভাবাবিষ্টের মত বসিয়া রহিলেন।

একটা অব্যক্ত করুণ সুর তাঁহার হৃদয়রাগিণীতে রহিয়া রহিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। যেন একটা কিসের বেদনার স্মৃতি তাঁহার মনের মধ্যে আসিয়াও আসিতেছিল না। তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন—কি যেন তিনি খুবই জানিতেন, অথচ আজ তার আর কিছুই মনে পড়িতেছে না।

তিনি ভাবিলেন, "এ আবার কি ? এমন সুমিষ্ট গান, হংসপদিকার সুমিষ্ট স্বর, এ পরিপূর্ণ সুখৈশ্বর্য্যের মাঝে সহসা আমার মন এত খারা

হয়ে গেল কেন? কৈ, কোনও প্রণয়িণীর সঙ্গেই ত আমার বিচ্ছেদ হয় নি, তবে—তবে কি এ গতজন্মেরই কোন কর্ম্মের স্মৃতি অজ্ঞাতসারে আমার হৃদয়ে এসেছে, অথচ স্পষ্ট করে কিছুই মনে পড়ছে না? গতজন্মেরই হবে, নইলে রম্যবস্তু দেখে, কিংবা মধুর শব্দ শুনে সুখী লোকেরও মনে যখন সময় সময় ব্যথার সৃষ্টি হয়, অথচ তার কারণও কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন সেটা গতজন্মেরই কোন প্রণয়ের স্মৃতি নয় ত কি? সংস্কাররূপে হৃদয়ে থাকে অথচ স্পষ্ট করেও কিছুই মনে পড়ে না। কিন্তু কি এমন কাজ—?" তাঁহার উৎকণ্ঠা বাড়িয়া উঠিল। এমন সময় কঞ্চুকী আসিয়া জানাইলেন, যে, হিমালয় পর্ব্বতের অরণ্য হইতে কয়েকটী তপস্বী মহামুনি কণ্বের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত স্ত্রীলোকও আছেন, সকলেই মহারাজের সহিত দেখা করিতে চাহেন।"

কঞ্চুকীর কথায় দুষ্যন্তের সে ভাবাবস্থা কাটিয়া গেল, তিনি বলিলেন, "মহামুনি কণ্বের শিষ্যেরা সস্ত্রীক এসেছেন? উপাধ্যায় সোমরাতকে এখনই জানাও যেন তিনি তপস্বীদের সমাদর করেন, আমি অগ্নিগৃহের নিকট অপেক্ষা করছি, সেখানেই তাঁদের নিয়ে এস।" এই বলিয়া তিনি তখনই অগ্নিগৃহে যাইবার জন্য উঠিলেন, রাজপ্রাসাদেরই সংলগ্ন একস্থানে তাঁহার অগ্নিগৃহ ছিল, তিনি সেই অগ্নিগৃহের বারান্দার উপর আসিয়া মুনিশিষ্যদের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সহসা কেন যে তপস্বীরা তাঁহার নিকট আসিয়াছেন, তিনি ভাবিয়া পাইলেন না, একবার তাঁহার মনে হইল, হয় ত রাক্ষসেরা যজ্ঞকার্য্যে বাধা জন্মাইতেছে, আবার ভাবিলেন হয় ত তাঁহার নিজেরই কোনও পাপের ফলে তপোবনের বৃক্ষে ফল নাই, পুষ্করিণীতে জল নাই। তাঁহার মন আবার উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

এদিকে শারঙ্গরব ও শারদ্বত প্রভৃতি সকলে রাজপুরীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। আশৈশব যাঁহারা নির্জ্জন তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছেন, কোলাহলপূর্ণ রাজপুরী তাঁহাদের নিকট মনে হইল যেন একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ড। শারঙ্গরব সেই কথাই বলিতেছিলেন, তাঁহার কথা শুনিয়া

শারদ্বত বলিলেন, "আমারও মনে এই সব বিলাসী লোকদের দেখে এমন একটা অশুচি ভাবের উদয় হচ্ছে, কি আর বল্‌ব। যে স্নান সেরে এসেছে, তেল মাখা লোক দেখলে, কিংবা মুক্ত লোকের বন্দীলোক দেখলে তাহার মনে যে ভাব আসে, আমার মনেও এদের দেখে ঠিক সেই রকমই একটা ভাব আস্‌ছে।"

তাঁহারা সকলে অগ্নিগৃহের নিকটে আসিলেন। বহুকাল পরে হৃদয়েশ্বর স্বামীকে আবার দেখিতে পাইবেন ভাবিয়া শকুন্তলার বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হইয়া উঠিল। একবার যাঁহার দর্শন-লালসায় কত রজনী তিনি বিনিদ্র কাটাইয়াছেন, আজ সেই চির-আকাঙ্ক্ষিতের নিকট চিরকাল থাকিতে পাইবেন ভাবিয়া তাঁহার সারা দেহে একটা পুলকের সঞ্চার হইল। কিন্তু—একি? সহসা তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হয় কেন? তিনি সভয়ে বলিলেন, "পিসিমা, আমার ডান চোখ নাচে কেন? কি হবে?" তাঁহারা দুইজনেই জানিতেন, নারীর দক্ষিণ নয়নের স্পন্দন অমঙ্গলের সূচনা করে। গৌতমী বলিলেন, "বৎসে, কোনও ভয় নাই, আমার আশীর্ব্বাদে, তোমার সকল অমঙ্গল দূর হইবে।"

মুনি-শিষ্যেরা আরও খানিক নিকটে আসিতেই দুষ্যন্ত তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শিষ্যেরা বলিলেন, "মহারাজ! আপনি রক্ষক থাকিতে তপস্যার কখনও বিঘ্ন হইতে পারে? সূর্য্য উঠিলে অন্ধকারের সাধ্য কি যে নিজের প্রভাব বিস্তার করে।"

এ কথায় দুষ্যন্ত মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি তাঁহাদের গুরু মহামুনি কণ্বের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শারঙ্গরব বলিলেন, "যাঁহারা সিদ্ধ পুরুষ, কুশল তাঁহাদের নিজের অধীন। গুরুদেব আপনাকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, আপনি তাঁহার কন্যা শকুন্তলাকে গন্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিয়াছেন জানিয়া তিনি অত্যন্ত সুখী হইয়াছেন। যে বিবাহে আপনার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তি বর, আর শকুন্তলার মত পবিত্রস্বভাবা বালিকা বধূ, সে মিলন যে অতিশয় শ্লাঘনীয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আপনাদের এ মধুর মিলন

দেখিয়া মনে হয় যেন প্রজাপতি কেবল নিজের দুর্নাম মোচন করিবার জন্যই এমন উপযুক্ত বরের সহিত উপযুক্ত বধূর মিলন ঘটাইয়াছেন। নহিলে, তাঁহার স্বভাবটি ত সবাই জানে, যার সঙ্গে যার বিবাহ হওয়া উচিত নয়, তার সঙ্গেই তার মিলন ঘটাইয়া দেন।" এই বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন। তারপর আবার বলিলেন, "এখন এই নিন আপনার পত্নী, গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে উভয়ে সুখে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করুন।"

গৌতমীও কিঞ্চিৎ আগাইয়া আসিলেন, বলিলেন, "মহারাজ, এ বিবাহ আপনারা নির্জ্জনেই সম্পন্ন করিয়াছেন, শকুন্তলা তাহার গুরুজনদের অনুমতি লয় নাই, আপনিও বন্ধু বান্ধবদের জানান নাই, সুতরাং আমাদেরও আর বিশেষ কিছুই বলিবার নাই।"

তাঁহাদের কথা শুনিয়া দুষ্যন্ত সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "এসব আবার কি?"

দুষ্যন্তের মুখে একি কথা! শকুন্তলা যেন মরমে মরিয়া গেল, সে ভাবিল 'কি লজ্জার কথা, ছিঃ ছিঃ, প্রিয়তমের কি মুখভঙ্গী!'

শারঙ্গরবও এ উত্তর প্রত্যাশা করেন নাই, তিনিও যেন প্রথমটা কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, বলিলেন, "এসব কথা আর বলেন কেন মহারাজ, লোকাচার ত আপনি সবই জানেন। সধবা নারী অধিক দিন যদি পিতৃগৃহে থাকেন, যতই তিনি সতী হউন না কেন, লোকে তাঁর সম্বন্ধে দু'কথা কহিবেই। স্বামী ভাল বাসুন আর নাই বাসুন আত্মীয় স্বজন সকলেই চায়, কন্যা তার স্বামীর গৃহেই থাকে।"

দুষ্যন্ত বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "আপনারা কি বলিতেছেন আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনারা কি বলিতে চাহেন যে এই নারীটিকে আমি বিবাহ করিয়াছি?"

বড় আশা করিয়াই শকুন্তলা স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিল, দুষ্যন্তের কথায় তাহার সমস্ত আশাই নির্ম্মূল হইয়া গেল। সে অধোবদনে আপনার দুর্ভাগ্যের কথাই ভাবিতে লাগিল।

এর পর ক্রোধ চাপিয়া রাখা শারঙ্গরবের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিতেছিল।

তিনি রুক্ষস্বরে বলিলেন, "বিবাহ করিয়া পরে তাহা অস্বীকার করাই কি রাজার ধর্ম্ম ?"

পূর্ব্বাপর সমস্ত ব্যাপারটাই দুষ্যন্তের যেন প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহার উপর তপস্বীর ক্রোধ দেখিয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন, "আপনারা এসব কি যা' তা' কথা বলিতেছেন, আমি ত এর এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেছি না।"

শারঙ্গরব আর ক্রোধ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, তিনি সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "বটে ? বুঝিতে পারিতেছেন না, না ? ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইলে মন এই রকম বিকারগ্রস্তই হইয়া পড়ে।"

দুষ্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, "আপনি আমার অত্যন্ত অপমান করিতেছেন।"

গৌতমী এতক্ষণ নীরবেই ছিলেন, তিনি শকুন্তলাকে বলিলেন, "আয় ত মা, একবার অবগুণ্ঠন খুলিয়া দেই, মুখ দেখিতে পাইলে নিশ্চয়ই তোমার স্বামী চিনিতে পারিবেন।" তিনি শকুন্তলার অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিলেন। দুষ্যন্ত দেখিলেন, এক পরিপূর্ণযৌবনা অপূর্ব্ব রূপসী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কখনও যে এ তরুণীটিকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন এমন সুন্দরী স্ত্রী যখন অনায়াসেই পাওয়া যাইতেছে, স্বীকার করিয়াই লই, কিন্তু পরের বিবাহিতা নারীকে স্পর্শ করিয়া অধর্ম্মের ভাগীই বা হই কেন। এই ভাবিয়া সহসা কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না।

রাজা কথা কহিতেছেন না দেখিয়া শারঙ্গরব বলিলেন, "মহারাজ! আপনি নীরব রহিলেন কেন ?"

দুষ্যন্ত তখনও অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিলেন, 'এই নারী! একে যেন কোথায় দেখিয়াছি। কিন্তু কৈ, কিছুই মনে পড়ে না ত'। বিবাহ ? একে ? না, না,—বিবাহ ত কখনও করি নাই!'

তিনি স্থির ভাবে বলিলেন, "তপস্বিগণ, আমি ত অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম। কিন্তু এঁকে যে কখনও বিবাহ করিয়াছি, তাহাত

কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিতেছি না; বলুন, এখন কেমন করিয়া এই গর্ভবতী নারীকে পত্নী বলিয়া গ্রহণ করি। ক্ষত্রিয়ের কি এ কাজ শোভা পায়?"

শারঙ্গরব ছিলেন মহাতেজস্বী, তিনি বলিলেন, "মহর্ষির অপমান করিবেন না।" বলিতে বলিতে তাঁহার ক্রোধ বাড়িয়া উঠিল, তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "তুমি চোরের মত লুকাইয়া কন্যার সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছ জানিয়াও আজ তোমারই হাতে নিজের কন্যাকে দিবার জন্য যিনি পাঠাইয়াছেন, তাঁহার সে মহত্ত্বের অবমাননা করিতে চাও?" রাগে তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না। শারদ্বত এতক্ষণ কিছুই বলেন নাই, তিনি শারঙ্গরবকে শান্ত হইতে বলিয়া শকুন্তলাকে বলিলেন, "শকুন্তলা, আমাদের যাহা বলিবার সবই ত বলিলাম। রাজা যাহা বলিলেন, তাহাও ত শুনিলে? এখন, তোমার নিজের যদি কিছু বলিবার থাকে বল।"

শকুন্তলা ভাবিল, 'বলিয়াই বা কি হইবে, অত অনুরাগের ত এই পরিণাম! যাহাই হউক অন্ততঃ নিজের দোষ ক্ষালনের জন্যও কিছু বলি।' এই ভাবিয়া বলিল, "পৌরব," প্রথমে মনে করিয়াছিল, 'প্রিয়তমই' বলিবে, কিন্তু যখন বিবাহেই সন্দেহ, তখন আর ওসব সম্বোধন করা ভাল দেখায় না ভাবিয়া বলিল, "পৌরব! তপোবনে যাহাকে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, এখন সেই সরলা নারীকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করা কি আপনার উচিত হইতেছে?"

দুষ্যন্তের তখন ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছিল, যে তিনি এ নারীকে কখনও বিবাহ করেন নাই, তাই তিনি স্পষ্ট ভাবে বলিলেন, "থাম! থাম! এসব কথা শোনাও মহাপাপ। তুমি নিজের কুলে কালি দিয়াছ, এখন আমার কুলেও কলঙ্ক আনিতে চাও?"

এই সময় সহসা শকুন্তলার মনে পরিল যে তপোবনে বিদায়ের দিনে দুষ্যন্ত তাহার হাতে নিজের নাম লেখা একটী অঙ্গুরী পরাইয়া দিয়াছিল, সেটীত তাহার নিকটেই আছে, দেখাইলেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যাইতে পারে। সে তাই আশ্বাসপূর্ণস্বরে বলিল, "বাস্তবিকই যদি আপনার

সন্দেহ হয়, যে আমি পরস্ত্রী, আপনারই দেওয়া কোন নিদর্শন যদি দেখাই তবে ত আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন ?"

নিদর্শনের নাম শুনিয়া দুষ্যন্ত কৌতূহলী হইয়া বলিলেন, "হাঁ, অতি উত্তম প্রস্তাব, দেখাও নিদর্শন।"

যে অঙ্গুলীতে দুষ্যন্তের অঙ্গুরীটী ছিল শকুন্তলা দুষ্যন্তকে দেখাইবার জন্য দেখে—কি দুর্দ্দৈব ! অঙ্গুরী নাই। লজ্জায় অপমানে সে বিষণ্ণ হইয়া উঠিল, ম্লানদৃষ্টিতে গৌতমীর মুখের দিকে চাহিতেই তিনি সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন, "এ আংটীও হারালি মা ! শচীতীর্থে স্নান করিবার সময় হয় ত জলে পড়িয়া গিয়াছে।"

দুষ্যন্ত মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, একেই বলে স্ত্রীজাতির উপস্থিত বুদ্ধি।"

রাজার উপহাস শকুন্তলার মর্ম্মদেশ যেন দংশন করিয়া উঠিল, সে সকলের সমক্ষে আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য বলিল, "এসমস্তই গ্রহের ফের ! ভাল, আমি অন্য প্রমাণ বলিতেছি, শুনুন।"

দুষ্যন্ত আবার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এবার শোনবার পালা ? কি বল শুনি।"

শকুন্তলার মাথার মধ্যে তখন সহস্র বৃশ্চিক যেন দংশন করিতেছিল, তবু সে অতি কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া বলিতে লাগিল, "একদিন সেই লতাকুঞ্জে আপনাতে আমাতে বসিয়াছিলাম, আপনার হাতে তখন একটী পদ্ম পাতার ঠোঙায় জল ছিল—"এই পর্য্যন্ত বলিয়া শকুন্তলা একবার দুষ্যন্তের দিকে চাহিল, তাহার বিশ্বাস ছিল, এই ঘটনাটী নিশ্চয়ই দুষ্যন্তের মনে পড়িবে। দুষ্যন্তও তাহার দিকে চাহিলেন, গল্পটী আরও শুনিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইতেছিল, তিনি বলিলেন, "বলে যাও, আমি সব শুনছি।"

শকুন্তলা আবার বলিতে লাগিল, "এমন সময় যে হরিণ শিশুটাকে আমি খুব ভালবাসিতাম, সে আমাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন আপনি তাহার দিকে জলের ঠোঙাটী আগাইয়া দিলেন, সে আপনাকে আর কখনও দেখে নাই, তাই আপনার হাত হইতে জল

খাইতে আসিল না। তারপর আমি আপনার হাত হইতে ঠোঙাটী লইতেই সে অমনি আসিয়া আমার হাত হইতে জল খাইতে লাগিল, তখন আপনি পরিহাস করিয়া বলিলেন, যে যার নিজের লোককেই বিশ্বাস করে, তোমরা দুজনেই জংলী কিনা।”

দুষ্যন্ত হাসিয়া বলিলেন, “বেশ। বেশ। মন্দ নয়। এই রকম শ্রুতি-মধুর মিথ্যা কথায় বিষয়ী লোকের মন ভুলিয়ে মেয়েরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করে নেয়, সে সবাই জানে।”

দুষ্যন্তের ইঙ্গিত গৌতমীর মনে শেলের মত বিঁধিল, তিনি বলিলেন, “কার নামে কি বল্‌ছেন, মহারাজ। এই শকুন্তলা আজন্ম তপোবনে পালিতা হ’য়েছে, তা’কে আপনি শঠ বলিতে চাহেন?” দুষ্যন্ত বলিলেন, “হাঁ, বৃদ্ধা তাপসী। হাঁ, শঠতা মেয়েদেরকে শেখাতে হয় না, সেটা তা’দের স্বভাবগত ধর্ম্ম। পশুপক্ষী—তারাও ত দেখি বাদ যায় না, কোকিলা যে কাকের বাসায় নিজের সন্তান পালন করিয়ে নেয়, সে কে আর না জানে? কেউ কি তাদের শেখাতে যায় এসব?”

দুষ্যন্তের সমস্ত কথা, সমস্ত উপহাস শকুন্তলা নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু আর থাকিতে পারিলেন না। ঘৃণায়, অপমানে, ক্রোধে তাঁহার সারা দেহঃ কাঁপিতেছিল, তিনি সরোষে বলিলেন, “অনার্য্য, তুমি নিজে যেমন ভণ্ড, সবাইকেই তেমনি ভণ্ড মনে কর। অবিশ্বাসী, অধার্ম্মিক, তোমার এ হীনতার আর তুলনা রইল না।”

দুষ্যন্ত শকুন্তলার দিকেই চাহিয়াছিলেন, তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া ভাবিলেন, “একি? এ নারী ত নাগরিকাদের মত নয়। কথায় বার্ত্তায় ভাবে বা ভঙ্গীতে কোথাও ত কিছু কৃত্রিমতা আছে বলিয়া মনে হয় না, ইনি দেখছি সত্যই ক্রুদ্ধা হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য। এই নারী—ইনি কি বাস্তবিকই মনে করেন যে আমি এঁর সঙ্গে গুপ্ত প্রণয় অস্বীকার করিতেছি, না হয়ত সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি।” তিনি বলিলেন, “ভদ্রে, দুষ্যন্তের চরিত্রে গোপনীয় কিছুই নাই, সকলেই তা’ জানে। কেবল আমি কেন, আমার প্রজাদের মধ্যেও এ রকম চরিত্রের লোক দেখা যায় না।”

শকুন্তলার ক্রোধ তখন গভীর দুঃখে পরিণত হইয়াছিল, তিনি

সজল নয়নে বলিলেন, "ধর্ম্মের মর্য্যাদা কি কেবল আপনারাই জানেন? আমরা মেয়ে মানুষ বলিয়া কি কিছুই জানি না? ওঃ, আজ তুমি আমায় সকলের সমক্ষে স্বেচ্ছাচারিণী বলে প্রতিপন্ন করলে, সংসারে আমার আর মুখ দেখাবার উপায় রাখলে না। আমার সরল বিশ্বাসের এই প্রতিদান?" তিনি আর বলিতে পারিলেন না, দুঃখে তাঁহার কণ্ঠ রোঁধ হইয়া আসিল, তিনি বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

শকুন্তলাকে কাঁদিতে দেখিয়া শারঙ্গরব বলিলেন, "কেঁদে আর কি হবে? অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে যারা কাজ করে, পরিণামে তারা দুঃখ ত পাবেই। যার তার সঙ্গে বন্ধুত্ব কর্‌লে, সে বন্ধু শেষে শত্রু হ'য়ে দাঁড়ায়।"

তখন তাঁহার সহিত দুষ্যন্তের কতকটা বচসা হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "কেন আপনারা সামান্য একটা নারীর কথায় বিশ্বাস ক'রে মিছে আমায় অপমান করছেন?"

শারঙ্গরবও রীতিমত চীৎকার করিয়া বলিলেন, "সবাই শুনলেন? তপস্বীরা যাকে আজন্ম তপোবনে প্রতিপালন ক'রেছেন, সে হ'ল শঠ, সে হ'ল মিথ্যাবাদী। আর যিনি বাল্যকাল থেকে পরপ্রবঞ্চনা বিদ্যা শিক্ষা করার: মত শিখেছেন তিনি হ'লেন সত্যবাদী—সাধুপুরুষ।"

"কিন্তু ঋষি—"দুষ্যন্ত বসিয়াছিলেন বলিতে বলিতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, "বলুন, কি লাভ এই নারীকে বঞ্চনা ক'রে?"

সক্রোধে চীৎকার করিয়া শারঙ্গরব বলিয়া উঠিলেন, "বিনিপাত!"

"বিনিপাত? বিনিপাত পৌরবে কামনা করে? হ'তে পারে না।" বলিয়া দুষ্যন্তও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

শারদ্বত তখন শারঙ্গরবকে আর বাদানুবাদ করিতে নিষেধ করিয়া দুষ্যন্তকে বলিলেন, "এই রইল আপনার পত্নী. গ্রহণ করিতে হয় গ্রহণ করুন, ত্যাগ করিতে হয় ত্যাগ করুন—যা ইচ্ছা আপনার। স্ত্রীর উপর স্বামীর সব অধিকার আছে।" তারপর শারঙ্গরবকে বলিলেন, "চল, আমরা চলিয়া যাই।"

তাঁহারা সকলে সভা ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিলেন। শকুন্তলাও

ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাদের পশ্চাতে যাইতে যাইতে বলিলেন, "এই ভণ্ড আমায় প্রত্যাখ্যান করলে, আপনারাও আমায় ত্যাগ করতে চান।" শকুন্তলাকে আসিতে দেখিয়া শারঙ্গরব বলিলেন, "খবরদার তুমি আমাদের সঙ্গে এস না, তোমার স্বামী যা বল্লেন যদি তুমি তাই হও তবে তোমার মত কুলটাকে আমরা নিতে পারি না। আর যদি তোমার কথাই সত্য হয়, তবে স্বামীর গৃহে যদি দাসীবৃত্তিও করিতে হয় সেও তোমার ভাল।"

দুষ্যন্ত বলিলেন, "তাও কি হয়, আমার গৃহে থাকিবে পরের নারী ?" রাজার পুরোহিত ছিলেন সেই সভায়। তিনি বলিলেন, "মহারাজ! ঐ নারীকে আমার গৃহে থাকিতে দিন। যদি এর গর্ভে রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষণযুক্ত সন্তান হয়, তবে বুঝিব এ আপনারই সন্তান, কারণ দৈবজ্ঞেরা বলিয়াছেন যে আপনার রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষণযুক্ত পুত্রই হইবে। আর যদি তা' না হয়, তখন অবশ্য এর অন্যপ্রকার ব্যবস্থা করা যাইবে।"

কথাটা দুষ্যন্তের মনঃপূত হইল, তিনি তাহাতে সম্মতি দিলেন। তারপর ঋষিরা চলিয়া গেলেন দেখিয়া পুরোহিত শকুন্তলাকে তাঁহার সহিত যাইবার জন্য ডাকিলেন। শকুন্তলার তখন লজ্জায় ঘৃণায় দারুণ অপমানে মর্ম্মদেশ ভেদ করিয়া একটা বিরাট হাহাকার উঠিতেছিল, দুষ্যন্তের সমস্ত উপহাস যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাঁহার নিকট সারা জগৎ–সংসার যেন একটা শুষ্ক কঠোর মরুভূমি বলিয়া মনে হইতে লাগিল, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, শিরে করাঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "মাগো! মা বসুন্ধরে, আমায় স্থান দে মা তোর বক্ষে।"

তখন এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল, মনে হইল যেন আকাশ হইতে এক জ্যোতির্ম্ময়ী নারীমূর্ত্তি নামিয়া আসিয়া শকুন্তলাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া যেমন ভাবে আকাশ হইতে আসিয়াছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই আবার আকাশে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। দুষ্যন্তও এ কথা শুনিলেন, তিনি একেই বিহ্বলের মত বসিয়াছিলেন, এ কথায় তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তাঁহার

মনে হইতে লাগিল, আজিকার এই ঘটনার মধ্যে যেন কৃত্রিমতা কোথাও কিছুই নাই, যেন সবই সত্য। অথচ এই যে নারী—একেত তিনি চেনেন না, বিবাহ আবার হল কবে, কিছুইত মনে পড়ে না, তবু—তবু যেন এর প্রতি কেমন একটা ভাব আসে। কোথায় যেন—কবে যেন ওর সঙ্গে একটা পরিচয় ছিল না কি? তাঁহার অন্তরাত্মা যেন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ছিল, ছিল, খুব পরিচয় ছিল, ওযে তোর বিবাহিতা।" দুষ্যন্ত আর ভাবিতে পারিলেন না, সমস্ত ভাবনাই যেন কেমন এলোমেলো হইয়া আসিল, তিনি সভাসদ্‌দিগকে বলিলেন, "আজ আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া আছে, আমি শয়ন-মন্দিরে চলিলাম।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন, যাইতে যাইতে সেই একই ভাবনা তাঁহার মন অধিকার করিয়া রহিল। তিনি ভাবিলেন, বিবাহ যদি করি নাই, তবে তাহাকে দেখিয়া—তাহার জন্য মন আমার এত খারাপ হয় কেন? বিবাহ কি তবে সত্যই করিয়াছিলাম, আজ সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি? তিনি একেবারে শয্যায় শুইয়া পড়িলেন, ভাবনার পর ভাবনা কত যে আসিল তার সংখ্যা নাই। কিন্তু তিনি শেষ পর্য্যন্ত কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। বিবাহ করিয়াছেন, কি করেন নাই, যে সমস্যা, সে সমস্যাই রহিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার কিছুকাল পরে একটা জেলে 'শচীতীর্থে' জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছিল।* সে দিন একটা প্রকাণ্ড রুই মাছ ধরিয়া জেলের আনন্দ আর ধরে না, অমন চমৎকার মাছটাকে বাজারে বেচিবার তাহার আর ইচ্ছা হইল না। নিজেরাই খাইবে বলিয়া সেটাকে বাড়ীতেই লইয়া আসিল। মাছটাকে কাটিতেছে, এমন সময় মাছের পেটের ভিতর তাহার নজর পড়িল, সেখানে কি যেন একটা চক্‌চক্ করিতেছে, আরও খানিকটা কাটিয়া দেখে একটা আংটী, সোনার আংটী তাহার উপর একটা বড় হীরা জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। এমন একটা জিনিষ নিশ্চয়ই এর দাম অনেক, ভাবিয়া জেলেটা আংটী লইয়া বাজারে গেল বিক্রয় করিতে। সামান্য একটা দরিদ্র জেলে, তাহার হাতে এমন মূল্যবান্ আংটী—দোকানদারের ত প্রথমেই কেমন একটা সন্দেহ হইয়াছিল, তারপর সেটী ভাল করিয়া দেখিবার জন্য হাতে লইয়া দেখে তাহার মধ্যে রাজা দুষ্যন্তের নাম লেখা। আর যায় কোথা সে অমনি পুলিস ডাকিয়া আংটী সমেত জেলেকে ধরাইয়া দিল। পুলিস সে সব জায়গাতেই পুলিস—এখন যেমন তখনও তেমন, তাহারা দুইজনে মিলিয়া জেলেটাকে বিষম প্রহার করিতে করিতে তাহাদের যিনি প্রধান—নগর-রক্ষকের সম্বন্ধী তাহার নিকট লইয়া গেল। তাঁহাকে দেখিয়া জেলে যোড়হাত করিয়া বলিল, "দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমার কথাটা আগে শুনুন, তারপর মারিতে হয় মারিবেন কাটিতে হয় কাটিবেন।"

"কি বল্‌বি বল্" বলিয়া রাজপুরুষ তাহাকে আর মারিতে নিষেধ করিলেন।

জেলেটা তখন আংটী যে কি করিয়া পাইয়াছিল আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা একে একে বলিয়া গেল। সম্বন্ধী মহাশয় আংটীটী একবার নাকের কাছে ধরিয়া বলিলেন, "হাঁ, এতে আমিষের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে বটে, মাছের পেটে থাকলেও থাকতে পারে। আচ্ছা চল, রাজপ্রাসাদেই
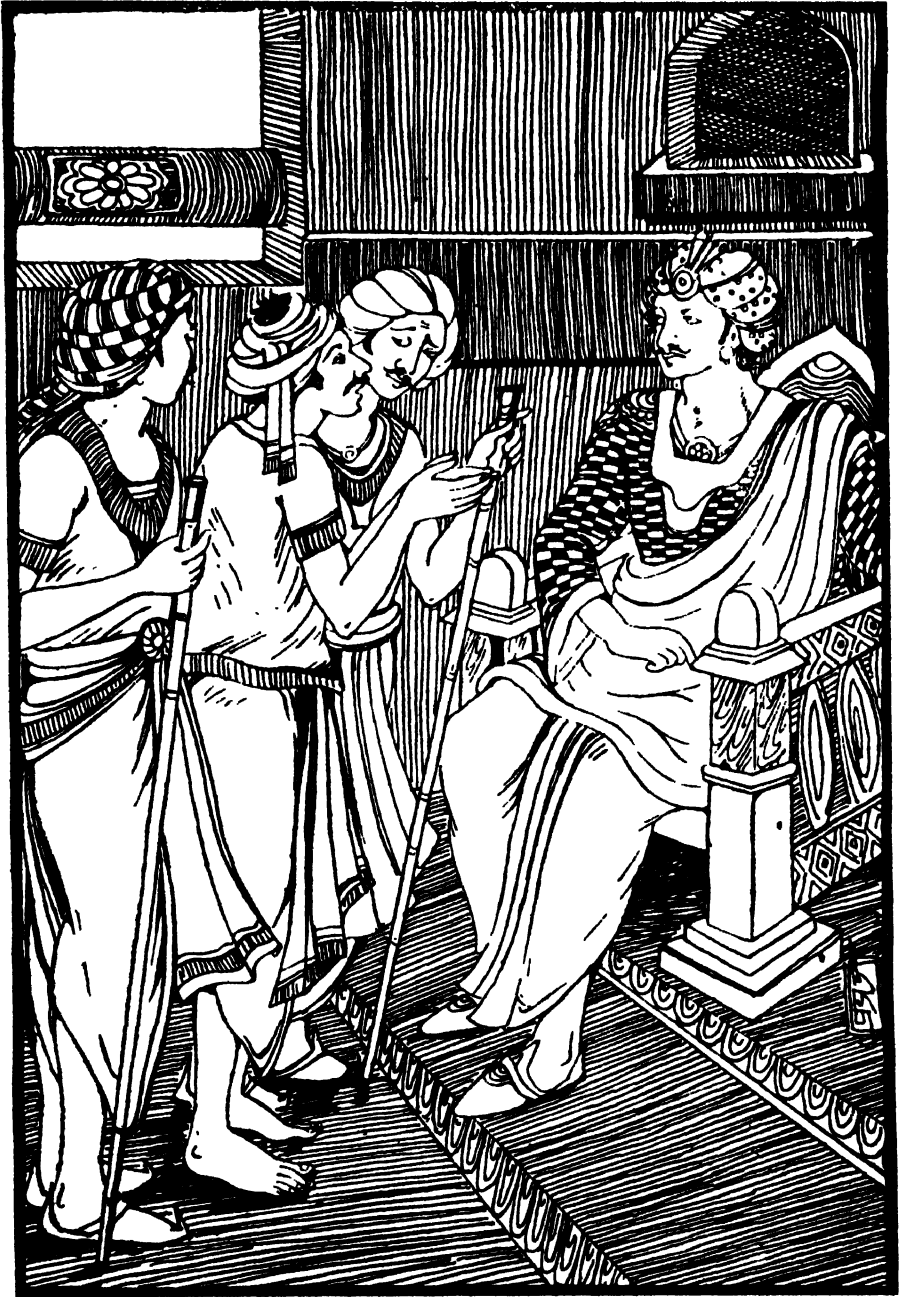
প্রহরীরা জেলেকে ধরিয়া নগররক্ষীর সম্মুখে দাঁড় করাইয়াছে

যাওয়া যাক্ মহারাজকে একবার জিজ্ঞাসা করে আসি।" এই বলিয়া তাঁহারা জেলেটাকে ধরিয়া লইয়া রাজপ্রাসাদের দ্বারে গেলেন। সেখানে আসিয়া নগরপাল রক্ষীদিগকে সিংহদ্বারের নিকট তাঁহার অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভিতরে মহারাজের সহিত দেখা করিতে গেলেন।

ফিরিয়া আসিতে তাঁহার কিছু বিলম্বই হইল দ্বারের নিকট আসিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি রক্ষীদিগকে বলিলেন, "ওকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ও সমস্ত সত্য কথাই বলেছে।"

প্রভুর আদেশ, রক্ষীরা জেলের বন্ধন খুলিয়া দিতে দিতে বলিল, "যা বেটা যমের বাড়ী থেকে ফিরে এলি।"

ছাড়া পাইয়া জেলে নগরপালের পা'দুটী জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। এত সহজে যে ছাড়া পাইবে, এমন ভরসা তাহার ছিল না।

"করিস্ কি! ওঠ্, ওঠ্, আমার পা ছাড়্, দেখ্ মহারাজ তোকে কত পুরস্কার দিয়াছেন।"

এই বলিয়া নগরপাল জেলেকে উঠাইয়া তাহার হস্তে কয়েকটী স্বর্ণ-মুদ্রা দিলেন। জেলে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর আপনার আনন্দের উচ্ছ্বাস সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "মহারাজের অসীম দয়া।"

তাহার কথা শুনিয়া একজন রক্ষী হাসিয়া বলিল, "দয়া! সে আবার বল্‌তে। মহারাজ তোকে শূল থেকে নামিয়ে একেবারে হাতীর পিঠে বসিয়ে দিয়েছেন।" তারপর নগরপালকে বলিল, "পুরস্কার দেখে মনে হ'চ্ছে যেন আংটীটী খুব মূল্যবান্।"

নগরপাল বলিল, "আংটী যে খুব মূল্যবান্ তা'নয়—তবে মনে হ'ল যেন আংটীটী দেখে মহারাজের কোনও প্রিয়জনকে মনে পড়ে গেল।"

"তাই নাকি?" বলিয়া রক্ষীরা নগরপালের মুখের দিকে চাহিল।

"তাই ত মনে হ'ল আংটীটী পেয়ে এমন গম্ভীর স্বভাব রাজা যেন ধৈর্য্য হারিয়ে ফেল্লেন, তখনকার তাঁর অবস্থা যদি দেখ্‌তে ত' বুঝ্‌তে নিশ্চয়ই কারও স্মৃতি যেন তিনি ফিরে পেলেন।"

পুলিসের হাতের পুরস্কার কাজেই ধীবর বলিল, “এই পুরস্কারের অর্দ্ধেক আপনারা নেন, মদটদ খাবেন।”

রক্ষীরা বলিল, “বেশ ভাই, চল, তুমি এখন আমাদের বন্ধু হ'লে শুঁড়িখানায় গিয়ে ভাল ক'রে বন্ধুত্ব পাতাই।”

এদিকে, যে আংটীটী দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে দিয়াছিলেন, আবার যখন সেটী এক অভাবনীয় উপায়ে তাঁহার হাতে ফিরিয়া আসিল, শকুন্তলার সমস্ত স্মৃতি একে একে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল।

তখন অনুশোচনার তাঁহার আর সীমা রহিল না। শকুন্তলার মত সরলা বালিকাকে গোপনে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে শেষে সকলের সম্মুখে স্বেচ্ছাচারিণী প্রতিপন্ন করিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, এ দুঃখ রাখিবার তাঁহার স্থান ছিল না। শকুন্তলার সেই কাতরতা, সজল নয়নের সেই আকুলতা-পূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার হৃদয়ে যেন শেল বিঁধিতে লাগিল। তিনি আহার নিদ্রা ভুলিলেন, শরীর দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। কোনও রূপ উৎসব, কি আমোদ প্রমোদ আর কিছুই তাঁহার ভাল লাগিত না। প্রতি বৎসর সারা রাজ্যে বসন্তের দিনে যে বসন্তোৎসব মহা আনন্দে সম্পন্ন হইত, রাজা, রাণী, প্রজা সকলেই যে আনন্দ সমান ভাবে ভোগ করিতেন, এবার দুষ্যন্তের আদেশে সে বসন্তোৎসবও বন্ধ হইয়া গেল। অহর্নিশ কেবল শকুন্তলার চিন্তাই তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া রহিল।

সেদিন সারা রাত্রি তাঁহার ঘুম হয় নাই, সকাল হইতে কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, তাই মন্ত্রীকে বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার শরীর ভাল নাই আজ আর বিচার কার্য্য করিতে পারিবেন না, মন্ত্রীই যেন রাজকার্য্য সারিয়া প্রত্যেক কার্য্যের বিবরণী পত্র লিখিয়া তাঁহাকে জানায়।

তারপর তিনি বিদূষককে লইয়া উদ্যানে গিয়া গল্প করিতে করিতে দুই একটী কথার পর দুষ্যন্ত বিদূষককে বলিলেন, “আচ্ছা ভাই, প্রিয়াকে যেদিন সভার মাঝে উপেক্ষা ক'রেছিলাম, সেদিন যেন তুমি সেখানে ছিলে না, কিন্তু তুমি ত তারপরও কখন শকুন্তলার গল্প কর নি। আমিই না হয় বুদ্ধির দোষে সব ভুলে গেছলাম, কিন্তু তুমি? তুমি ত সবই জান্‌তে।”

বিদূষক বলিলেন, "জানতাম ত সবই, কিন্তু ঐ যে আমি যে দিন তপোবন থেকে বিদায় নি সেদিন তুমি ব'লে দিলে শকুন্তলার সব কথাই মিছে, সে জঙ্গলী মেয়ে নিয়ে তুমি কি করবে, আমিও তাই বুঝে নিলাম, আমার বুদ্ধির দৌড় ত তুমি জানই।"

সেই সময় তাঁহার এক লিপিকরী দুষ্যন্তের হাতে একখানি চিত্র আনিয়া দিল। শকুন্তলার এই চিত্রখানি দুষ্যন্ত অতি যত্নের সহিত আঁকিয়াছিলেন তবে ছবিখানি তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, আঁকিবার অনেক জিনিষ বাকী ছিল।

সেই মালিনী নদী, মুনির আশ্রম, হরিণ হরিণী দুষ্যন্ত যেমনটী দেখিয়াছিলেন, ঠিক সেইরকমই সব আঁকিবেন এই কথাই তিনি বিদূষককে যেন ভাবের ঘোরে বলিয়া যাইতেছিলেন। বিদূষক দেখিতে দেখিতে হাসিয়া বলিলেন, "সখা, দেখেছ একটা মধুকর যে শকুন্তলার মুখের উপর বস্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে।"

দুষ্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাড়িয়ে দাও, বন্ধু, তাড়িয়ে দাও।"

বিদূষক বলিলেন "তাড়িয়ে দেব আমি? তুমিই দাও সখা, শাসন-টাসন করা—ওসব তোমারই অভ্যাস আছে।"

দুষ্যন্ত অমনি বলিয়া উঠিলেন, "দাঁড়া হতভাগা, দাঁড়া, যে কোমল অধর আমি কত সন্তর্পণে চুম্বন করেছি, তুই কি-না সেই অধর দংশন কর্‌তে চাস্? আমি তোকে এখুনি পদ্মের ভিতর বন্ধ ক'রে রাখ্‌ব।"

বিদূষক মনে মনে ভাবিলেন, "উন্মাদ হ'য়ে গেল দেখ্‌ছি শেষটায়।" তারপর দুষ্যন্তকে বলিলেন, "সখা, এ যে চিত্র।"

বিদূষকের কথায় দুষ্যন্তের সে ভাবাবস্থা কাটিয়া গেল, তিনি বলিলেন, "তাই ত, এ চিত্রপটই ত।" তারপর দুঃখপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "কর্‌লে কি বন্ধু, আমি যে সত্যই প্রিয়ার সঙ্গে কথা বলছিলাম। তুমি কেন সে ভুল আমার ভাঙলে ভাই? প্রিয়াকে আমার চিত্রই ক'রে দিলে তুমি!" বলিতে বলিতে দুষ্যন্তের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন।

একজন প্রতিহারী আসিয়া প্রধান মন্ত্রীর একখানি পত্র তাঁহার হাতে দিল। মন্ত্রী রাজার আদেশমত সেদিনকার সভার সমস্ত কার্য্যের বিবরণী পত্রে লিখিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছে। দুষ্যন্ত তখন বিদূষককে 'মেঘচ্ছন্দ' প্রাসাদে অপেক্ষা করিতে বলিয়া পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। তাহার একস্থানে লেখা ছিল—

"ধনবৃদ্ধি নামক এক বণিক্ জলপথে ব্যবসা করিবার নিমিত্ত যাইতেছিলেন, সহসা নৌকাডুবি হইয়া জলমগ্ন হইয়াছেন। তাঁহার বহু কোটি টাকার সম্পত্তি আছে। অথচ সন্তানাদি কিছুই নাই, সুতরাং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইবার কথা। এখন মহারাজের যা আদেশ।"

দুষ্যন্ত ভাবিলেন, "ওঃ, পুত্র না থাকা কি কষ্ট!" তারপর বেত্রবতীকে বলিলেন, "দেখ অমাত্যকে গিয়া বল, বণিকের যখন এত ঐশ্বর্য্য নিশ্চয়ই তার অনেকগুলি পত্নী আছেন, তাঁদের মধ্যে যদি কেউ গর্ভবতী থাকেন, তবে সেই গর্ভস্থ শিশুই পিতৃধনের অধিকারী হইবে।"

পত্রবাহক চলিয়া গেল। নিজের অপুত্রকতার ভাবনায় দুষ্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল মৃত্যুর পর পুরুবংশের রাজলক্ষ্মীও পরহস্তগত হইবে। বিনাকারণে তিনি নিজের সন্তানসম্ভাবিতা ধর্ম্মপত্নীকে নিষ্ঠুরের মত যখন ত্যাগ করিয়াছেন, বিধাতা তাঁহার প্রতি বাম হইবেনই ত। একে ত শকুন্তলার চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার উপর আবার নূতন করিয়া নিজের অপুত্রকতা, গৌরবময় পুরুবংশের শেষ পরিণাম তাঁহার মনে একটা বিরাট নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিল। তিনি ভাবিলেন নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহার হাত হইতে শ্রাদ্ধাঞ্জলি লইবার সময় এই শেষ জল ভাবিয়া নিঃশ্বাস ফেলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল যেন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বিষণ্ণ মুখে দীন নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তিনি চমকিয়া উঠিলেন, সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন তাঁহার অবশ হইয়া পড়িল, চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ঢাকিয়া আসিল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমির উপর পড়িয়া গেলেন।

দুষ্যন্ত শকুন্তলার ছবি হাতে লইয়া বসিয়া আছেন

নিকটে একজন পরিচারিকা ছিল, সে তাড়াতাড়ি চীৎকার করিয়া উঠিল, "মহারাজ, মহারাজ! অমন কর্‌ছেন কেন?"

সে অমনি জল আনিতে ছুটিল। দুষ্যন্তের তখন সামান্য জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে, এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন, যেন বিদূষক আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছেন।

প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল, যে, "মাধব্য মহাশয় মেঘচ্ছন্দ প্রাসাদে ছিলেন, সেখানে এক প্রেতাত্মা অদৃশ্য থাকিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিতেছে।"

দুষ্যন্ত উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "বটে? আমার প্রাসাদে এসে আমারই সম্মুখে আমার পরিজনের উপর অত্যাচার! প্রতিহারী, আন ত ধনুর্ব্বাণ।" তিনি মেঘচ্ছন্দ প্রাসাদের দিকে চলিলেন। আবার তিনি শুনিলেন কে যেন বলিতেছে, "দাঁড়া হতভাগা, তোকে পশুর মত হত্যা করি, দেখি তোর দুষ্যন্ত কেমন বাঁচায় তোকে!"

ক্রোধে দুষ্যন্তের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। তিনি যেখান হইতে শব্দ আসিতেছিল সেই দিক লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িবার উপক্রম করিলেন ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দেবরাজ ইন্দ্রের সারথী মাতলি বিদূষককে সঙ্গে করিয়া দুষ্যন্তের সম্মুখে আসিয়া সহাস্যে বলিলেন, "মহারাজ, দেবরাজ চান যে আপনি অসুরদের বধ করেন। আমরা বন্ধু লোক আমাদের দিকে শর সন্ধান ক'রে কি লাভ?"

দুষ্যন্ত ব্যস্ত হইয়া মাটির উপর তীর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই যে মাতলি, ভাল আছেন ত?"

বিদূষক বলিলেন, "বাঃ বেশ ত! আমায় যে পশুর মত হত্যা করছিল, তাকে আবার খাতির দেখান।"

মাতলি আবার হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "দেবরাজ ব'লে দিয়েছেন স্বর্গে অসুর-বিদ্রোহের খুবই সম্ভাবনা, আপনাকে সে বিদ্রোহ দমন করবার ভার দিয়েছেন তিনি, এখনই তাঁহার রথে উঠিয়া বিজয় যাত্রা করুন।"

দুষ্যন্তও হাসিয়া বলিলেন, "দেবরাজের এ সম্মান দানে অনুগৃহীত হইলাম। আচ্ছা, আসবার সময় মাধব্যকে এমন উৎপীড়ন করলেন কেন?"

মাতলি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন, তিনি বলিলেন, "দেখিলাম আপনি দুঃখে যেন অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন, তাই আপনার ক্রোধ জন্মাইবার জন্যই মাধব্যকে নিয়ে একটু রহস্য করছিলাম। ক্রুদ্ধ না হইলে তেজস্বীর তেজ প্রকাশ পায় না ত। চলুন, দেবরাজের কাছে যাওয়া যাক্।"

দুষ্যন্ত প্রাসাদে সংবাদ পাঠাইয়া দেবরাজের রথে উঠিলেন। রথ স্বর্গের দিকে চলিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দুষ্যন্ত অনায়াসে অসুর বিদ্রোহ দমন করিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য এক মহতী সভা করিয়া সমস্ত দেবতাদের সমক্ষে দুষ্যন্তকে রীতিমত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে আপনার পার্শ্বে বসাইলেন। তারপর নিজের কণ্ঠ হইতে মালা খুলিয়া সেই মালা আপন হাতে দুষ্যন্তকে পরাইয়া দিলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল।

এতটা সমাদর লাভ করিবেন দুষ্যন্ত তাহা ভাবেন নাই, তিনি সন্তুষ্ট মনে বিদায় লইয়া আপনার দেশে চলিলেন। স্বর্গ হইতে এ দেশে আসিতে হইলে হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হয়। দুষ্যন্ত ইন্দ্রের রথে বসিয়া হিমালয়ের উপর মেঘের ভিতর দিয়া আসিতেছিলেন, ক্রমে সমতল ভূমির উপর রথ আসিতেই অনেক মুনি ঋষিদের আশ্রম তাঁহাদের চোখে পড়িল। দুষ্যন্ত সারথিকে বলিলেন, "কি চমৎকার স্থান, যেন অমৃতের হ্রদে অবগাহন করিয়া আছি, স্বর্গের চেয়েও এ স্থানটি ভাল বোধ হ'চ্ছে। এখানে যখন আসিয়াইছি একবার মহর্ষি কশ্যপকে প্রদক্ষিণ করিয়াই যাওয়া যাক্।"

মাতলি এখানকার সকল জায়গাই জানিতেন, তিনি দুষ্যন্তকে সেখানে খানিক অপেক্ষা করিতে বলিয়া মহর্ষিকে সংবাদ দিতে গেলেন। দুষ্যন্ত একা একটু এদিক্ ওদিক্ করিতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, কে যেন বলিতেছে, "সকল সময়েই দুষ্টামি!"

মুনির আশ্রমে 'দুষ্টামি' শুনিয়া কে দুষ্টামি করিতেছে দেখিবার জন্য দুষ্যন্ত যেখান হইতে শব্দ আসিয়াছিল, সেখানে যাইয়া দেখিলেন একটি অতি সুশ্রী বালক একটা সিংহ শিশুর কেশর ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। সিংহশিশু তাহার মাতার স্তন্যপান করিবার যতই চেষ্টা করিতেছে, বালক ততই জোর করিয়া তাহাকে আপনার কাছে আনিবার চেষ্টা করিতেছিল।

সেখানে দুইজন তাপসবেশধারিণী নারী বালককে ভৎর্সনা করিতেছিলেন, তাঁহাদেরই কণ্ঠস্বর দুষ্যন্ত শুনিতে পাইলেন।

বালকটিকে দেখিয়া দুষ্যন্তের হৃদয় এক অপূর্ব্ব স্নেহের আবেশে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন তাঁহার নিজের সন্তান নাই, সেই জন্যই হয় ত, পরের এমন সুন্দর একটী পুত্র দেখিয়া তাঁহার মনে এ স্নেহের উদয় হইতেছে। তিনি মুগ্ধ নয়নে বালকের দুষ্টামি দেখিতে লাগিলেন।

যে দুইজন তাপসী বালককে ভৎর্সনা করিতেছিলেন, তাঁহারা যখন বালকের সহিত কিছুতেই পারিয়া উঠিলেন না, তখন একজন তাহার জন্য একটী খেলনা আনিতে গেলেন। খেলনা দিবার লোভ দেখাইয়াও বালকের হাত হইতে সিংহশিশুকে ছাড়ান গেল না, তাপসী তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "ঋষিকুমারেরা কে এখানে আছ, ধর ত ছেলেটাকে।"

কিন্তু সেখানে তখন আর কেহই ছিল না, তাপসী তাই দুষ্যন্তকেই বলিলেন, "মহাশয়, এই বালকের হাত হইতে সিংহশিশুটীকে মুক্ত করিয়া দেবেন?"

দুষ্যন্ত ত তাহাই চাহিয়াছিলেন, তিনি বালকের হাত দুইখানি ধরিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ছিঃ ছিঃ, ঋষিদের ছেলে হ'য়ে দুষ্টামি কর্‌তে আছে? ছেড়ে দাও একে।"

দুষ্যন্তের কথায় অমন দুরন্ত বালক সেও যেন কেমন শান্ত হইয়া পড়িয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, আর দুষ্যন্ত—তিনি তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া তাহার স্পর্শসুখ অনুভব করিতেছিলেন আর ভাবিতেছিলেন, "এ আমার নিজের সন্তান নয় পরের, তবু একে স্পর্শ ক'রে এত সুখ! হায়, যে ভাগ্যবান এর পিতা তার কি সুখই না হয় একে বক্ষে জড়িয়ে ধরলে।"

বালক এত শীঘ্র শান্ত হইয়া পড়িল দেখিয়া তাপসী বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য আপনার কেবল কথাতেই বালক শান্ত হইয়া পড়িল। অথচ মহাশয় আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। আরও আশ্চর্য্য আপনাদের সৌসাদৃশ্য।"

দুষ্যন্ত বলিলেন, "ভদ্রে, এ কোন্ ঋষির সন্তান ?" তাপসী বলিলেন, "এ ঋষির সন্তান নয়, ক্ষত্রিয় কুমার, পৌরবকুলে এর জন্ম। মানুষেরা এখানে আসিতে পারেনা বটে, তবে এর জননী অপ্সরা-সম্পর্কে এখানে আসিয়া প্রসব হইয়াছেন।"

'ক্ষত্রিয় কুমার,' 'পৌরবকুলে জন্ম,' 'জননীর অপ্সরা-সম্পর্ক' কথাগুলি দুষ্যন্তের যেন কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিতেছিল, একটা দুরাশা—একটা আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। তিনি আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোন্ রাজর্ষির ধর্ম্মপত্নী ?"

তাপসী উত্তর দিলেন, "কি বলেন মহাশয় ? যে আপনার ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করে তার নাম আমি মুখে আনব ?"

দুষ্যন্তের আর সন্দেহ রহিল না। এ তিরস্কার যে তাঁহারই উদ্দেশ্যে বলা হইল, সে কথা তিনি খুবই বুঝিতে পারিলেন। তবু একবার তাঁহার মনে হইল এর জননীর নাম যদি জানা যায়। সেই সময় আর একজন তাপসী একটী মাটির ময়ুর লইয়া আসিয়া বালককে বলিলেন, "এই দেখ, এই শকুন্তের লাবণ্য কেমন, ভাল নয় ?"

বালক চারিদিকে একবার চাহিয়া বলিল, "কৈ ? কোথায় আমার মা ?"

তাপসী বলিলেন, "না না, আমি তা' বলিনি, এই শকুন্ত, অর্থাৎ পাখীটা দেখতে ভাল, নয় ?"

দুষ্যন্তের মন তখনও সন্দেহ-দোলায় দুলিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, "এর মার নাম ত দেখছি শকুন্তলা, সে-ই কি ? কিন্তু দুজনের এক নাম হওয়া ত আশ্চর্য্য নয়।"

এমন সময় দেখা গেল বালকের বাহুতে তাহার রক্ষাকবচ নাই, কোথায় পড়িয়া গিয়া থাকিবে। একজন তাপসী বলিলেন, "কৈ সর্ব্বদমনের বাহুতে রক্ষাকবচটী নেই কেন ?"

সিংহশিশুকে ধরিবার সময় কবচটী ভূমির উপর পড়িয়া গিয়াছিল। দুষ্যন্ত তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাই বলিলেন, "এই ত পড়ে আছে, দাঁড়ান আমি দিচ্ছি।" তিনি যেমন কবচটী তুলিতে যাইবেন, তাপসীরা

'হাঁ হাঁ' করিয়া উঠিলেন, "ছুঁইবেন না, ছুঁইবেন না—"দুষ্যন্তের তখন তোলা হইয়া গিয়াছিল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কেন বলুন ত আপনারা আমায় নিষেধ করলেন ?"

একজন তাপসী বলিলেন, "এই কবচটীতে এর পিতা মাতা ছাড়া আর কাহারও হাত দেবার কথা নয়। যদি অপর কেউ স্পর্শ করে, কবচটী সাপ হ'য়ে তাকে কামড়ায়।"

"বলেন কি ? আপনারা কেউ দেখেছেন এমন ঘটনা ?" বলিয়া দুষ্যন্ত বালককে কোলে তুলিয়া বলিলেন, "চল পুত্র, তোমার মা'র কাছে যাই।"

বালক বলিল,"আমায় ছেড়ে দাও, তুমি কে ? আমার পিতা ত দুষ্যন্ত।"

দুষ্যন্তের অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল যে, একবার বলেন যে, "আমিই—আমিই তোর পিতা—দুষ্যন্ত।" তবু সে ভাব চাপিয়া রাখিয়া তাপসীদের পশ্চাতে চলিলেন। শকুন্তলাও সর্ব্বদমনের খোঁজে সেইখানেই আসিতে ছিলেন। দূর হইতে দুষ্যন্ত দেখিলেন তাঁহার প্রাণ-অপেক্ষাও প্রিয়তমা শকুন্তলা তাঁহার সম্মুখে। পরিধানে মলিন বসন, শুষ্ক মুখ, রুক্ষ কেশ দেখিয়া দুষ্যন্তের আর অনুশোচনার সীমা রহিল না। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, কেবল তাঁহারই অতি নিষ্ঠুর আচরণের জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বেকার তপোবনের সেই হাস্যময়ী সরলা বালিকাকে আজ এই পরিপূর্ণ যৌবনে দুঃখিনী তাপসীর বেশ ধারণ করিতে হইয়াছে।

দুষ্যন্তেরও আর পূর্ব্বেকার সে চেহারা ছিল না। নিদর্শনটী পাইবার পর হইতে দারুণ অনুশোচনায় তিনি মনের সকল সুখশান্তি হারাইয়াছিলেন। শকুন্তলার তাই কেমন সন্দেহ হইতেছিল, তিনি দুষ্যন্তকে চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছিলেন না। সর্ব্বদমন ধীরে ধীরে দুষ্যন্তের হাত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া শকুন্তলার অঞ্চল ধরিয়া বলিল, "এ কে মা ? আমায় পুত্র ব'লে ডেকে আদর করছে ?"

শকুন্তলা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই দুষ্যন্ত বলিলেন, "প্রিয়ে, তোমার সঙ্গে যা ব্যবহার ক'রেছি, সে সব আর মনে রেখো না, আবার আমায় তোমার ক'রে নাও।"

শকুন্তলা কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, তাঁহার মনে হইতে লাগিল, "এতদিনে বুঝি বিধাতা আবার প্রসন্ন হইলেন।"

দুষ্যন্ত শকুন্তলার আরও নিকটে আসিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে, বড় সৌভাগ্য যে, সে মোহ আমার আজ কেটে গেছে, আবার তোমায় দেখতে পেয়েছি।"

আনন্দে শকুন্তলার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল, মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না, তবু তিনি আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিবার চেষ্টা করিলেন, "আর্য্যপুত্রের জয় হউক।" কিন্তু সমস্তটা বলিতে পারিলেন না, আনন্দে তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল, তিনি রোদন করিতে লাগিলেন।

দুষ্যন্ত বলিলেন, "শকুন্তলা, আমি মহা অপরাধী, আমায় ক্ষমা কর তুমি। আমার যে সেদিন কি মতিচ্ছন্ন হ'য়েছিল জানি না, অন্ধের মতন ফুলের মালাকেও আমি সর্প মনে করে দূরে ফেলে দিয়েছিলাম। আমায় ক্ষমা কর।"

দুষ্যন্ত একেবারে শকুন্তলার পায়ে ধরিতে গেলেন।

"ছিঃ ছিঃ, করেন কি, করেন কি।" বলিয়া শকুন্তলা সরিয়া গিয়া আবার বলিলেন, "এ দোষ আমারই, নিজেরই গতজন্মের কর্ম্মফলে আমি এত কষ্ট পেয়েছি, নইলে আপনার ন্যায় দয়ার শরীর যার, সে এমন নিষ্ঠুর হবে কেন?"

দুষ্যন্তকে উঠাইয়া শকুন্তলা আবার বলিলেন, "এ অভাগিনীকে মনে পড়ল কি করে?"

"আগে তোমার চোখের জল মুছিয়ে দি। আমি নিষ্ঠুর না হ'লে তোমার চোখ দিয়েও জল বার হয় শকুন্তলা।" বলিয়া দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে কাছে টানিয়া আনিয়া সস্নেহে তাঁহার চোখ মুছাইতে লাগিলেন। দুষ্যন্তের হাতে আপনার সে আংটিটী দেখিয়া শকুন্তলা বলিলেন, "এই যে সেই আংটি। কি করে পেলেন এটী?"

"আংটি পেয়েই ত তোমার সব কথা মনে পড়ল আমার। পেলামও খুব আশ্চর্য্য রকমে।" বলিয়া দুষ্যন্ত সেটী শকুন্তলাকে দিতে গেলেন;

এমন সময় মাতলি আসিয়া বলিলেন, "চলুন মহারাজ, ভগবান মারীচ আপনাকে দেখতে চেয়েছেন। আপনি আজ স্ত্রী-পুত্র এক সঙ্গে পেয়েছেন, আপনার মত ভাগ্যবান্ আর কে আছে ?"

দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা মহর্ষি মারীচের আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার পত্নীকে প্রণাম করিলেন, তাঁহারাও আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিতে বলিলেন। দুষ্যন্ত বলিলেন, "ভগবন, আপনার অনুগ্রহের মাহাত্ম্য অতি অপূর্ব্ব! আপনার দর্শন পাবার পূর্ব্বেই আমি স্ত্রী-পুত্র লাভ করলাম। আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়েছে।"

মহর্ষি মৃদু হাসিলেন। দুষ্যন্ত আবার বলিলেন, "প্রভো, আজ আমার একটা সংশয় নিরাকরণ করে দিতে হবে। এই অধিনীকে আমি তপোবনে গন্ধর্ব্ব-বিধানে বিবাহ করেছিলাম। তারপর ইনি আত্মীয়-বন্ধুদের সহিত যখন আমার নিকটে আসেন, তখন আমার কি যে হয়েছিল বলতে পারি না, এঁর কোনও কথা আমার মনে ছিল না, আমি কিছুতেই এঁকে চিনতে পারি নি। তাই প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। এখন এই আংটি দেখে আবার সমস্ত কথাই আমার মনে পড়েছে। বলুন দেব, কেন এমন হ'ল। হঠাৎ এমন মতিচ্ছন্ন কেন হ'ল আমার ?"

মহর্ষি বলিলেন, "বৎস, নিজেকে দোষী ভেবে কষ্ট পেও না। আমি তোমাদের সকল কথাই শুনেছিলাম, তারপর ধ্যানযোগে জানতে পারি যে, মহর্ষি দুর্ব্বাসার অভিশাপেই তুমি পূর্ব্বকথা ভুলে গিয়েছিলে। এতে তোমার নিজের কোনও অপরাধ নেই। তারপর নিদর্শন দেখে সে শাপের অবসান হয়, তোমারও পূর্ব্বের সকল স্মৃতি ফিরে এসেছে। সবই গ্রহের ফের।"

এক সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া দুষ্যন্ত মনে মনে বলিলেন, "ওঃ বাঁচিলাম, মুনির শাপে—আমার নিজের কোনও দোষ নাই। লোকনিন্দার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম।"

শকুন্তলারও তখন মনে পড়িল, সেই বিদায়ের দিনে সখীরা তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "যদি রাজর্ষি তোকে চিনতে না পারেন,

এই আংটিটা দেখাস্।" নিশ্চয়ই ওরা সে শাপের কথা জান্ত, আমিই হয় ত শুন্‌তে পাইনি।

তখন আর কাহারও মনে কোন ক্ষোভ রহিল না, প্রত্যাখ্যানের প্রকৃত কারণ সকলেই বুঝিতে পারিলেন। মহর্ষি মারীচ দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা দুইজনকেই আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎসে, সকল বৃত্তান্ত এখন শুনলে, স্বামীর ওপর আর অভিমান ক'রো না।" তিনি আরও বলিলেন, "এই যে বালক, এ কালে রাজচক্রবর্ত্তী হবে, আমরা এর নাম রেখেছিলাম সর্ব্বদমন, ভবিষ্যতে সমস্ত পৃথিবীর ভরণ কর্‌বে বলে এর নাম হবে 'ভরত'।"

আবার একবার সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিয়া মহর্ষি মারীচ দুষ্যন্ত ও শকুন্তলাকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদমনকে লইয়া ইন্দ্রের রথে উঠিয়া রাজধানীর দিকে যাত্রা করিলেন।

সম্পূর্ণ